পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা



সম্পাদনা ।। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ।। সরল দে







পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা

সম্পাদনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী □ সরল দে

অতিথি সম্পাদক এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ [বাংলাদেশ]

নির্বাহী সম্পাদক অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

মডেল পাবলিশিং হাউস ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Panchso' Bachharer Kishor Kabita
Edited by Nirendranath Chakraborty and Saral De

Guest Editor: Ekhlasuddin Ahmad **[Bangladesh]**

Managing Editor : Ardhendu Chakraborty

প্রথম প্রকাশ শুভ মহালয়া ১৩৯৫
[First Published 10th October 1988]

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

অলঙ্করণ নিতাই ঘোষ

শিল্প নির্দেশনা রবীন দাস

প্রুফ দেখেছেন সত্যদাস মংগল

মূল্য ৪০·০০
[Rupees forty only]

জয়দেব ঘোষ কর্তৃক ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং দে'জ অফসেট, ৩/২ মঠেশ্বরতলা রোড (ট্যাংরা রোড, সাউথ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬ থেকে মুদ্রিত।

ফটোটাইপসেটিং
ইস্ট ইণ্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার ৬৯ শিশির ভাদুড়ী সরণী কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

কিশোর মনের পরিধি বড় ব্যাপ্ত এবং বিচিত্র। এই ব্যাপ্ত ও বিচিত্র মনের চাহিদা মেটাতে বাঙালী সাহিত্যিকরা রচনা করেছেন অজস্র গল্প-কবিতা-উপন্যাস। অবশ্যই কবিতা এর মধ্যে প্রাচীনতম। এই সব কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা গ্রন্থে এবং পত্র-পত্রিকায়।

ঐতিহাসিক বিচারে এর পরিসীমা প্রায় পাঁচশত বছরের মধ্যে প্রসারিত। বিগত পাঁচশত বছরে বাংলা ভাষায় যতো কবিতা রচিত হয়েছে তার থেকে বিশিষ্ট কিছু কবিতা এবং কবিতার অংশ নির্বাচন করে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হলো। উদ্দেশ্য, এই পাঁচ শত বছরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কিশোর কবিতার ধারাবাহিকতার সঙ্গে বর্তমানের কিশোরদের একটা পরিচয় স্থাপন।

এই সংকলনের আর একটা উল্লেখ্য দিক, দুই বাংলার কিশোর কবিতাকে একত্রিত করে এক-ই গ্রন্থে সংকলিত করা। স্বাধীনতা লাভের পর দুই বাংলার কিশোর কবিতা উভয় বাংলার কিশোরদের কাছে ক্রমশঃ অপরিচয়ের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিলো। সেই দিক থেকেও এই সংকলন একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলো।

কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদকদ্বয় যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন, তার তুলনা বিরল। তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ছাড়া এই সংকলন প্রকাশের কথা ভাবা অসম্ভব। ছবি এঁকেছেন নিতাই ঘোষ। ব্যস্ততার মধ্যেও অতি অল্প সময়ে তিনি যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম তাঁর কাছে। প্রেস, বাইন্ডার এবং এই সংকলনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে এই সুযোগে জানাই কৃতজ্ঞতা। সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদের কাছে, যাঁরা এই সংকলনে কবিতা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বিনীত—

জয়দেব ঘোষ

কথারম্ভ

বঙ্গভূমির অনেক গৌরবই আজ অস্তমিত। ইদানীং আর আমাদের ঘরে এমন ঐশ্বর্য খুব বেশি নেই, মাথা তুলে পাঁচজনের কাছে যা নিয়ে জাঁক করা যায়। আমাদের বাড়ি যেমন বারবার ভেঙেছে, তেমনি হাঁড়িও দু'বেলা চড়ে না। দেশবিভাগের দায় মেটাতে আমাদের বিস্তর সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেছে, তার সঙ্গে বিস্তর জমিজমাও আমরা হারিয়েছি। থাকার মধ্যে আছে সাহিত্যের সেই জমিটুকু, এত দুঃখ, এত দৈন্যের দিনেও যা সমানে সোনা ফলায়। তা নিয়ে, বলা বাহুল্য, যৎপরোনাস্তি গৌরববোধ আমরা আজও করতে পারি ; কারও তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

আমাদের এই গৌরববোধের অনেকানেক কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে, বাংলা সাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের চিত্তে কোনও বর্ণভেদ-প্রথা কখনও প্রশ্রয় পায়নি। এই কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

নানা ভাষার সাহিত্যে আছেন দুই শ্রেণীর লেখক। এক শ্রেণী শুধুই বয়স্কদের জন্য কলম ধরেন, আর অন্য শ্রেণী যা লেখেন তা শুধুই শিশুসমাজের বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের পাঠ্য। ব্যাপার দেখে ধাঁধা লেগে যায় ; মনে হয় যেন সে-সব ভাষার সাহিত্যক্ষেত্রের মাঝ-বরাবর একটা বেড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে কিনা বেড়ার দুই দিকে যে দুই শ্রেণীর কর্মী সেখানে দুই বয়সের পাঠকের চিত্তবৃত্তির খোরাক জোগাবার কর্মে নিরত রয়েছেন, কিছুতেই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে জায়গা বদল করতে না পারেন।

জায়গা বদলাতে তাঁরা নিজেরাই যে বিশেষ ইচ্ছুক, এমন কথাও ভাবা শক্ত। বিশেষ করে যাঁরা বড়দের লেখক, তাঁদের কারও কারও কথা শুনলে তো মনে হয় যে, ছোটদের জন্য কলম ধরলেই তাঁদের জাত যাবে। শস্যক্ষেত্রের তুলনা না-দিয়ে যদি রাষ্ট্রের তুলনা টানি, তা হলে দেখতে পাব, বড়দের লেখকরা সেখানে—অন্যেরা মানুক আর না-ই মানুক—মোড়ল সেজে বসে আছেন। ভাবখানা এই যে, সাহিত্য নামক সেই রাষ্ট্রের তাঁরা এ-ক্লাস সিটিজেন, আর যাঁরা ছোটদের লেখক, তাঁরা নেহাতই বি-কেলাস।

এই হল সেই বর্ণভেদ প্রথা, বাংলা সাহিত্যে যার লেশমাত্র প্রভাব কারও চোখে পড়ে

না। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা প্রধান পুরুষ, যেমন বড়দের হাতে, তেমনি ছোটদের হাতেও তাঁরা তুলে দিয়েছেন আশ্চর্য সব উপহার। এ-কাজে তাঁদের প্রায় কেউই কোনও কুণ্ঠা বোধ করেননি। বিদ্যাসাগরের মতো দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যেমন করেননি, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বজয়ী কবিও তেমনি করেননি। আবার, রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের যাঁরা বড়-মাপের লেখক, ছোটদের জন্য কলম ধরবার ব্যাপারে দেখতে পাচ্ছি তাঁদেরও প্রায় কারওই কিছুমাত্র দ্বিধা কিংবা আলস্য ছিল না। কালিকলম আর কল্লোলের লেখকদের কথাই ধরা যাক। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর বুদ্ধদেব বসু তো বড়দেরই লেখক; অথচ ছোটদের জন্যও অজস্র গল্প-উপন্যাস-কবিতা এঁরা লিখেছেন।

সে-সব রচনার একটিও যে বাঁ-হাতের লেখা নয়, তাও তো আমরা জানি। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস 'ডাকাতের হাতে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প 'কলিকাতার গলিতে' কি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা 'নদী-স্বপ্ন' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই বুঝবেন আমাদের এই কথার যাথার্থ্য। হয়তো স্বীকারও করবেন যে, হরেক দেশের হরেক ভাষার শিশুসাহিত্যের যে-সব সাম্প্রতিক নমুনা—সরাসরি কিংবা তর্জমার মাধ্যমে—আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়, তার তুলনায় বঙ্গভাষায় রচিত এ-সব রচনার সাহিত্যগুণ কিছুমাত্র কম তো নয়ই, বস্তুত অনেক বেশি। এ-সব লেখা একদিকে যেমন তৈরি করে তোলে তার উদ্দিষ্ট অল্পবয়সী পাঠকদের ভাষারুচি, অন্যদিকে তেমনি বিকশিত হতে সাহায্য করে তাদের চিত্তবৃত্তিকে। আবার একইসঙ্গে তাদের কল্পনাকেও এ-সব লেখা দীপ্ত করে, মনশ্চক্ষেই আশ্চর্য অসংখ্য ছবি দেখতে শেখায়। কিংবা অন্নদাশঙ্করের ছড়ার কথাই ধরা যাক। বড়দের লেখক হয়েও তো তিনি একইসঙ্গে আবার ছোটদের মুঠোতেও ধরিয়ে দিয়েছেন মণিমাণিক্যের মতন অসংখ্য ছড়া। এমন ছড়া, যা অল্পবয়সী সেই পাঠক-পাঠিকাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে অবশ্যই, আবার বড়দের জগতের নানা বিচ্যুতি আর অসঙ্গতিকেও স্পষ্ট করে তুলতে ছাড়েনি।

বলা বাহুল্য, এ-সব কথা যখন বলছি, তখন এক মুহূর্তের জন্যও তাঁদের কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি না, প্রধানত ছোটদের জন্যই যাঁরা লিখেছেন, এবং পারতপক্ষে বড়দের জন্য কলম ধরেননি। আমরা ভুলে যাচ্ছি না বাংলা ভাষার সেইসব লেখক-লেখিকাকে, একান্তভাবে শিশুসাহিত্য রচনার কাজেই নিজেদের প্রতিভাকে যাঁরা নিয়োজিত রেখেছিলেন, এবং সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুসমাজের মানসিক পুষ্টি জোগাবার কাজকেই যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ব্রত হিসেবে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুনির্মল বসু প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টাদের কাছে তো আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমাদের প্রত্যেকেরই শৈশব আর বাল্যবয়সকে তাঁরা নির্মল আনন্দে ভরাট করে রেখেছিলেন। তাঁদের সকলকেই আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। যদি বলি যে, তাঁদের লেখক-জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাঁরা এই বঙ্গভূমির শিশুসমাজের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তা হলে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। যে ধারাটির তাঁরা প্রবর্তক, তা যে লুপ্ত হয়নি, তার প্রমাণ

এই যে, তাঁদের পরবর্তী কালেও আমরা এমন কিছু কবি ও কথাসাহিত্যিককে পেয়েছি, শুধু শিশুদের জন্যই যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ।

কিন্তু লীলা মজুমদার কি সত্যজিৎ রায়কে নিশ্চয় সেই ধারারই লেখক হিসাবে আমরা গণ্য করতে পারি না। যেমন পারি না তাঁদের পূর্বসূরী, অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী আর-একজন লেখককে। তিনি সুকুমার রায়। নিছক ভ্রান্তিবশত একদা আমরা ভেবেছিলুম যে, তিনি ছোটদের লেখক। বস্তুত তিনি যে সর্ব বয়সের সর্বজনের লেখক, এই সহজ কথাটাই আমরা বুঝতে পারিনি।

সর্বকালীন বাংলা কবিতা ও ছড়ার এই যে সংকলন-গ্রন্থ অনেক যত্নে, অনেক মমতায় তৈরি করে তোলা হল, একে আমরা বলছি বটে কিশোরপাঠ্য, কিন্তু এরও মধ্যে রয়েছে এমন অনেক রচনা, সব বয়সের সব মানুষই যার ভিতর থেকে প্রভূত আনন্দ নিষ্কাশন করে নিতে পারবেন। আসল কথাটা এই যে, যাকে আমরা বয়স্কপাঠ্য সাহিত্য বলি, তার অনেকটাই নিশ্চয় অল্পবয়সীদের অনুপযোগী, কিন্তু মূলত যে সাহিত্য ছোটদের জন্য রচিত, বয়স্কদেরও একটা বৃহৎ অংশ তার ভিতরে তাঁদের চিত্তের খোরাক পেয়ে যান। কেন যে পান, সেটাও আমরা বুঝতে পারি। তাঁদের চিত্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এক চিরঞ্জীব শিশু, যার বয়স কিছুতেই বাড়ে না। আর তা ছাড়া, কিছু রচনার মধ্যেও থাকে সেই আশ্চর্য আবেদন, অথবা সকলের কাছেই গ্রাহ্য ও আদৃত হবার সেই শক্তি, বয়সের তাবৎ গণ্ডিকে যা অক্লেশে অতিক্রম করে যায়।

আমরা জানি যে, সেই ধরনের রচনাও এ-গ্রন্থে অনেক রইল। আর তাই, বয়স যাঁর যা-ই হোক না কেন, বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা এবং ভিন্ন-ভাষার মানুষ হয়েও এই ভাষার যাঁরা অনুরাগী, তাঁদের সকলের হাতেই এই সংকলন আমরা তুলে দিচ্ছি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৭.১০.৮৮

প্রাক্ কথন

অতিদীর্ঘ এক গতিপথ। সময় প্রবাহের, সেইসঙ্গে বাংলা কাব্যকবিতারও। আমরা এই স্রোতোধারার ঠিক উৎসে নয়, উৎস ছাড়িয়ে আরও দু'একটা বাঁক ঘুরে কৃত্তিবাসের কাল থেকেই শুরু করেছি। অবশ্য এ-হিসেব পাঁচশোরও বেশি; তবু এক অখণ্ড সংখ্যাই ব্যবহার করা হলো এই সংকলনের নামকরণে।

সংকলনটি কিশোর পাঠকদের জন্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সূচীপত্রের সূচনামুখে উল্লিখিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐ যে কবিদের নাম, তাঁদের কবিতাবলী, এ-সব কি আদৌ কিশোর মানসের উপযোগী? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সত্যিই তো, কিশোরপাঠ্য কবিতা রচনার বিন্দুমাত্র রেওয়াজ তো ছিলই না সেকালে, এমন কি তৎপরবর্তী কালেও। তবে?

সম্পাদনার দায়িত্ব যখন কাঁধে, জবাবদিহির দায়ও তখন বর্তায়। আর তা অবশ্য যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া চাই। আমাদের পক্ষে, আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব, সম্পাদকীয় বক্তব্যকে একটা বিশ্বাসযোগ্য ভূমিতে দাঁড় করাতে।

আমরা চেয়েছি, কিশোরবয়সের পাঠকদের বাংলা কবিতার উৎসের কাছাকাছি নিয়ে যেতে। প্রাক্-চৈতন্যযুগ থেকে যাত্রা শুরু করে, চৈতন্যযুগ ও চৈতন্য-উত্তর যুগ ছুঁয়ে, তারপর আরও কয়েকটি বাঁক ঘুরে তারা পৌঁছে যাক আধুনিক পর্বে। এই দীর্ঘ পদযাত্রায় বাংলা কবিতার যুগপ্রবর্তক কবিদের অবদানের কিছুটা অন্তত তারা তুলে আনুক। তাঁদের সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠুক, কৌতূহলী হোক। এ-ভাবে বাংলা কবিতার বহতা যে ধারা, তারই একটা ধারণা নিয়ে তারা বড় হোক। আমাদের বিশ্বাস, সমগ্রের ধারণা কিশোর কবিতা পাঠকদের সমকালীন বাংলা কবিতার কাছে পৌঁছতে সাহায্য করবে, তারা কবিতামনস্ক হবে।

ভুল যে বলছি না, তার প্রমাণ তো চোখের সামনে—মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে প্রচলিত পাঠ্যবইগুলির পৃষ্ঠায়। সেখানে তো সঙ্গতকারণেই কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ইত্যাদি, এমন কি বৈষ্ণব ও শাক্ত পদকর্তারাও সসম্মানে উপস্থিত।

আর একটি কথা। কৈশোরে বাড়ন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা কি কেবলমাত্র 'কিশোর' ছাপ মারা কবিতাই পড়বে? শৈশবের মায়াময় মাটি ছেড়ে যে মুহূর্তে কৈশোরের আলোকিত প্রান্তরে তারা পা বাড়ায়, সেই মুহূর্তটি থেকেই চায় সবকিছু ছুঁয়ে দেখতে, মুঠোয় ধরতে। তখন শিশুখাদ্য তাদের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনই শিশুপাঠ্য ছড়া-পদ্যেও আর তাদের তেমন রুচি থাকে না। এ ব্যাপার আমাদের ভাবায়। ভাবতে ভাবতে নজর পড়ে সাম্প্রতিক কালের শিশু বা কিশোর সাহিত্যের হাটে। সেখানে

তথাকথিত ছড়ার ছড়াছড়ি। পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টালে ছড়া, আর কবিতার বই চাইলে হাতে উঠে আসে ছড়ার বই। ভাঙা-ছন্দ ও চটুল শব্দের নকশায় বোনা এইসব ছড়া ছোটদের কান ও মনে হয়তো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কিন্তু কখনোই তাদের সেই কাঙ্খিত ভাবের রাজ্যে পৌঁছে দেয় না। ফলে শৈশবে যে পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে, কৈশোরে পা রেখে তারা নিজেরাই সেটা ত্যাগ করে। অতঃপর বয়ঃসন্ধির সাঁকোটা পেরিয়ে হয়ে ওঠে কবিতা-বিমুখ। আধুনিক কাব্য-কবিতার সঙ্গে আর যোগই থাকে না তখন। কবিতার সীমিত পাঠকসংখ্যা নিয়ে যে সমস্যা, তার একটা বড় কারণ বোধহয় এটাই। আমাদের মতে, নির্বাচিত কিছু বয়স্কপাঠ্য কবিতার স্বাদ নেওয়ার উপযুক্ত সময় এই কৈশোর কাল। সে-কথা ভেবেই আমরা এই সংকলনগ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হই। পাঠ্যবইয়ের বাইরে আরও কিছু কবিতা পাঠের সুযোগ করে দিতে চেয়েছি আমরা পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা প্রকাশ করে।

এবার আসা যাক কিশোর কবিতা অর্থাৎ কিশোরদের জন্য রচিত কবিতা প্রসঙ্গে। বস্তুত কিশোর কবিতা বলতে যা বোঝায়, তার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বিদ্যাসাগর-ঈশ্বর গুপ্তের কালে, প্রয়োজনের তাগিদে কেউ কেউ পাঠ্যপদ্য রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, সেগুলি তেমন কবিতা হয়ে ওঠেনি।

সাহিত্যের সব শাখারই পুরোধা পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। কিশোর কবিতার ক্ষেত্রেও। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বহু সার্থক কবিতা সৃষ্টি হলো তাঁর হাতে। তাঁরই সমকালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার, বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রবাদপুরুষ, বিস্তর চিন্তাভাবনা ও কাজ করলেন শুধুমাত্র ছোটদের জন্যেই। লিখলেনও প্রচুর। ঐ সময়ের কিছু আগে পরে ছোটদের জন্যে কয়েকটি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। বালক-বন্ধু, সখা, সাথী, মুকুল ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। সেগুলিকে কেন্দ্র করে এক-একটি গোষ্ঠী তৈরী হলো। অন্যান্য রচনার সঙ্গে ছড়া-কবিতাও লিখলেন সেই সব গোষ্ঠীভূক্ত লেখকেরা, তার বাইরেও কেউ কেউ লিখতে প্রণোদিত হলেন। একটা ধারা ধরা পড়ল। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত কবিরা, যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম মোস্তাফা, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ, তাঁরা বেশ কিছু স্মরণীয় কিশোর কবিতা রচনা করলেন। তবে সচেতন বা সুপরিকল্পিত প্রয়াস তেমন ছিল না বলা চলে। সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কবিরা কখনো-সখনো লিখেছেন, সম্ভবত পত্র-পত্রিকা বা বার্ষিকী গ্রন্থের তাগিদে।

প্রায় সমসময়ে বাংলা শিশুসাহিত্যে যাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাব, তিনি সুকুমার রায়। ছোটদের ছড়া ও কবিতা রচনায় তিনি এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি করলেন। ছোটদের কবিতার জগতে তিনি অবিস্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যের কল্লোলযুগের শক্তিশালী কবিরাও প্রায় সবাই ছোটদের জন্যে অল্পবিস্তর লিখেছেন। নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও আর কেউ কেউ ছোটদের হাতে ভালো ভালো কবিতা তুলে দিয়েছেন। সে সব কবিতা বহুপঠিত, আজও সমান জনপ্রিয়। অতএব এটাই স্বীকার্য যে, জাতকবিরাই

পারেন যথার্থ কিশোর কবিতা রচনা করতে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। হঠাৎই হয় তো এক-আধটা ভালো কবিতা ছোটদের জন্যে লিখে ফেলেছেন কেউ, কবিতা যিনি তেমন করে লেখেনই না। আবার বড়দের কবিতার জগতে বিচরণ করেন নি, অথচ কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ছোটদের রাজ্যে—দু'চারজন এমন কবির নাম করা যায়। সুনির্মল বসু, কৃষ্ণদয়াল বসু, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত,—এঁরা ছিলেন শিশু-কিশোর সাহিত্যে নিবেদিত কবি।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকেও কিশোর পাঠকদের জন্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা লেখা হয়েছে। লিখেছেন কবিরাই। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অশোকবিজয় রাহা, সুনীলচন্দ্র সরকার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম করা যায়। এঁরা অল্পই লিখেছেন, কিন্তু যা লিখেছেন তাই স্থায়ী হয়ে গেছে সার্থকতায়, তাঁদের স্বকীয়তায়।

কিন্তু ষাট-সত্তর দশক থেকে এই আশী পর্যন্ত যেন ছড়া রচনার যুগ। শিশুসাহিত্যসেবীদের অধিকাংশই প্রধানত ছড়াকার। কবিতার খোঁজ করতে গিয়ে আমাদের হাতে উঠে এসেছে রাশি রাশি ছড়া। কবিতা যৎসামান্য। তবে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের জন্যে যাঁরা জীবনপাত করছেন, ভালো লিখছেন, তাঁদের বাদ দিলে এ সংকলন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তাঁরা তো আছেনই। আর গত এক দশকে যাঁদের আবির্ভাব, শুরু থেকেই যাঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন, এমন কয়েকজন তরুণ ও তরুণতম কবির কবিতাও সংকলনভুক্ত হলো। এঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত। কিশোর কবিতার ধারাপথে একটা গতি পরিবর্তনের সংকেত ধরা পড়ছে তাঁদের রচনায়—এটা লক্ষ্য করেই আমরা ঐ ক'জন অল্পখ্যাত কবিকে স্থান দিয়েছি।

পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতার সিংহভাগ জুড়ে আছে যুক্তবাংলায় রচিত কবিতা। সাহিত্যের বিভাজন দেশভাগের পর থেকে। ওপার বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে বাংলা সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। সে ইতিহাস মাত্র চার দশকের। দুই রাষ্ট্র। কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে এক। দু'বাংলার সাহিত্যের শিকড় একই মাটিতে—সে মাটি অখণ্ড বাংলার। এই বিশ্বাসেই বাংলাদেশের একগুচ্ছ কিশোর কবিতা যুক্ত হলো এ-বাংলায় প্রকাশিত সংকলনে।

পাঁচশো বছরের বিশাল সময়-পরিধি নিয়ে ছোটদের জন্যে এমন কবিতা সংকলন ছিল বলে আমাদের জানা নেই। খুবই বড়মাপের কাজ এটা। এই দুরূহ কাজে হাত দিয়ে প্রতিমুহূর্তে আমাদের সতর্ক থাকতে হয়েছে। সতর্কতা নির্বাচনে, কিশোর মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায়, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা যদ্দূর সম্ভব নির্ভুল রাখতে। তবু আমাদের প্রয়াস সর্বাংশে সার্থক হবে এমন প্রত্যাশা নিশ্চয়ই নেই। হয়তো উপযুক্ত কবি কেউ-না-কেউ বাদ গেলেন আমাদেরই অনবধানতায়। এমনও হতে পারে, নির্বাচিত কবির কিশোরোপযোগী আরও ভালো কবিতা ছিল, সে-ক্ষেত্রে আমাদের সন্ধানী দৃষ্টি হয়তো সর্বত্রগামী হতে পারে নি।

আর একটি কথা। কালানুক্রম সর্বাংশে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ এটি কিশোর পাঠ্য। দু' এক জায়গায় ছোট-বড় ফাঁক রাখতে বাধ্য হতে হয়েছে। যেমন, ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত—বিরাট ব্যবধান। বাংলা কাব্যের ঐ অন্ধকারময় যুগ ছিল প্রধানত কবিয়ালদের। এই শূন্যস্থানে আমরা লালনের একটি গান রাখতে পেরেছি।

মানছি, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু থেকেই যাচ্ছে। আর তার জন্যে মামুলী দুঃখপ্রকাশ নয়, পরবর্তী সংস্করণ ত্রুটিমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি রাখতে চাই।

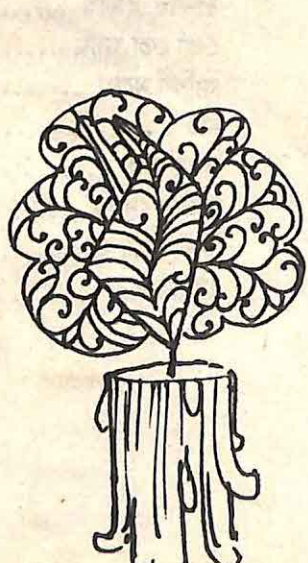
সংকলনের কাজ সুসম্পূর্ণ করতে প্রবল আগ্রহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন কয়েকজন কবি, সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবী। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদীপ হাজরা দেবব্রত মল্লিক, শ্যামলকান্তি দাশ, তরুণ চক্রবর্তী, মীনা সেনগুপ্ত, প্রকাশ সেনগুপ্ত ও বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যসেবী এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ—এঁদের নাম করতেই হয়। আর নিছক বাণিজ্যিক স্বার্থে নয়, সৎসাহিত্য প্রকাশের গঠনমূলক কাজে উৎসাহী প্রকাশক জয়দেব ঘোষ এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের গুরুদায়িত্ব সানন্দে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বর্তমান ও আগামীকালেরও কিশোর পাঠকদের জন্যে অভিনন্দনযোগ্য কাজই তাঁরা করলেন।

প্রকাশিত পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা যদি কিশোর বন্ধুদের কবিতামুখী হতে কিছুটাও সাহায্য করে, তবেই আমাদের এই শ্রমসাধ্য প্রয়াস সার্থক হতে পারে।

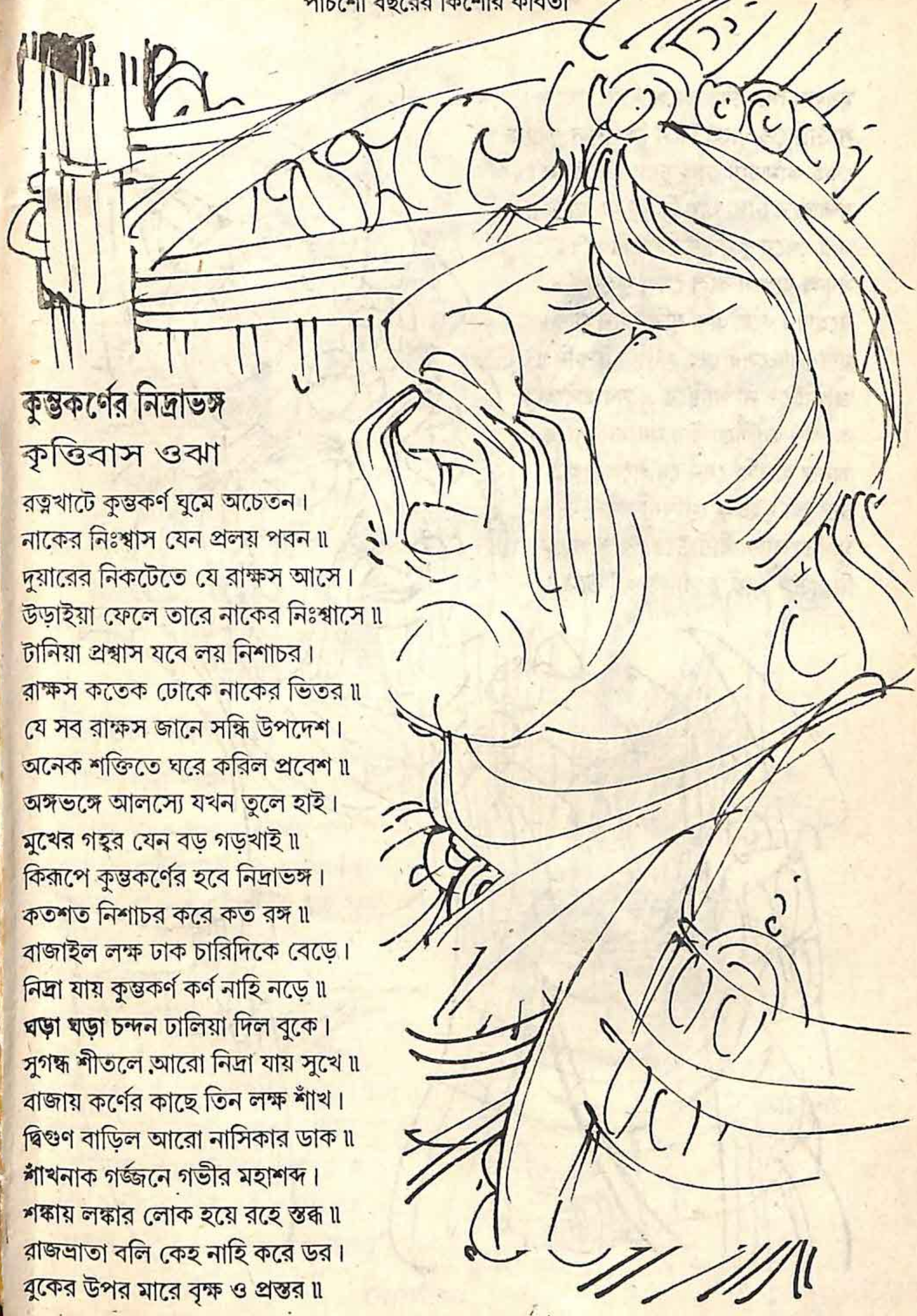
৮. ১০. ৮৮.

সূচীপত্র

সূচীপত্র ঃ বাংলাদেশ



পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা

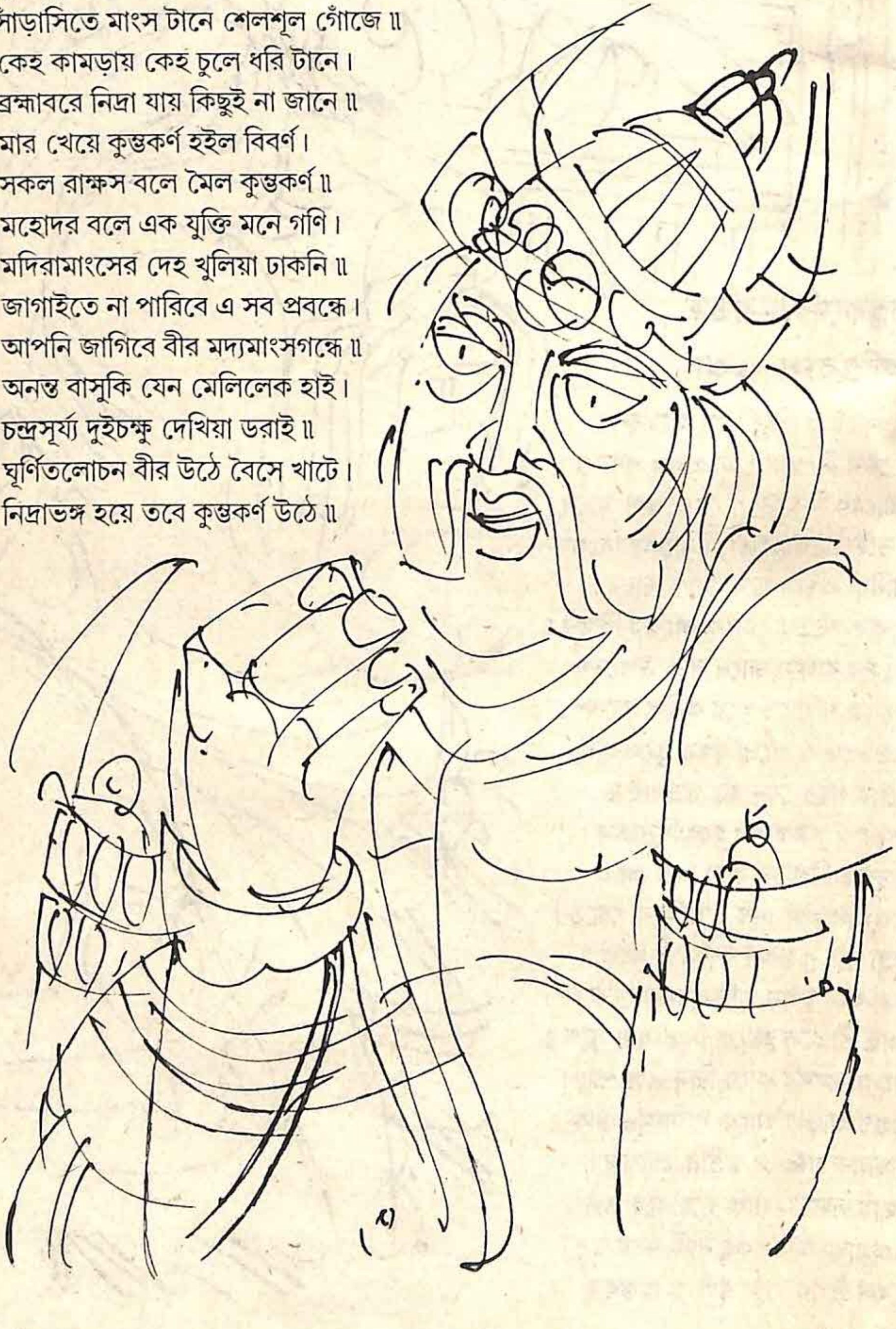


কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

কৃত্তিবাস ওঝা

রত্নখাটে কুম্ভকর্ণ ঘুমে অচেতন।
নাকের নিঃশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিঃশ্বাসে ॥
টানিয়া প্রশ্বাস যবে লয় নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর ॥
যে সব রাক্ষস জানে সন্ধি উপদেশ।
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ ॥
অঙ্গভঙ্গে আলস্যে যখন তুলে হাই।
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই ॥
কিরূপে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।
কতশত নিশাচর করে কত রঙ্গ ॥
বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে ॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধ শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে ॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক ॥
শাঁখনাক গর্জ্জনে গভীর মহাশব্দ।
শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে রহে স্তব্ধ ॥
রাজভ্রাতা বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপর মারে বৃক্ষ ও প্রস্তর ॥

মুষলমুদ্গর কেহ অঙ্গে মারে তেজে।
সাঁড়াসিতে মাংস টানে শেলশূল গোঁজে ॥
কেহ কামড়ায় কেহ চুলে ধরি টানে।
ব্রহ্মাবরে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে ॥
মার খেয়ে কুম্ভকর্ণ হইল বিবর্ণ।
সকল রাক্ষস বলে মৈল কুম্ভকর্ণ ॥
মহোদর বলে এক যুক্তি মনে গণি।
মদিরামাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি ॥
জাগাইতে না পারিবে এ সব প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্যমাংসগন্ধে ॥
অনন্ত বাসুকি যেন মেলিলেক হাই।
চন্দ্রসূর্য্য দুইচক্ষু দেখিয়া ডরাই ॥
ঘূর্ণিতলোচন বীর উঠে বৈসে খাটে।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে ॥





শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি

মালাধর বসু

বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে ॥
যমুনার কূলে যবে বাঁশীতে দেই সান।
ফিরিয়া যমুনা নদী বহয়ে উজান ॥
দরবে পাষাণ সব বংশীনাদ শুনি।
যাহাত শুনিয়া তপ ছাড়ে সব মুনি ॥
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল।
তা শুনি ময়ূরপক্ষ নাচিতে লাগিল ॥
শুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীনাদে ফুলফল ধরে তরুগণে ॥
যত পক্ষীগণ থাকে এই বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বংশীর নাদ শুনে এক মনে ॥

(সংক্ষেপিত)



ফুল্লশ্রী

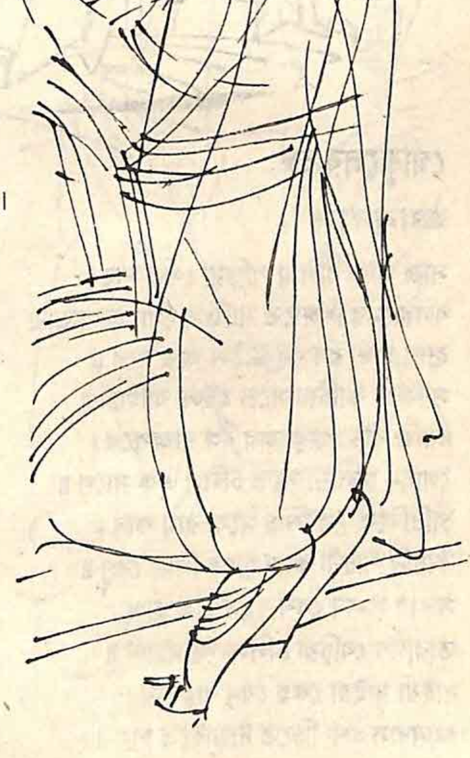
বিজয় গুপ্ত

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুশেন সাহ নৃপতি তিলক ॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তকসিম্ ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকলে ॥
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল ॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের শূর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রীগ্রামে বসতি বিজয় ॥



গোঠ

বৃন্দাবন দাস



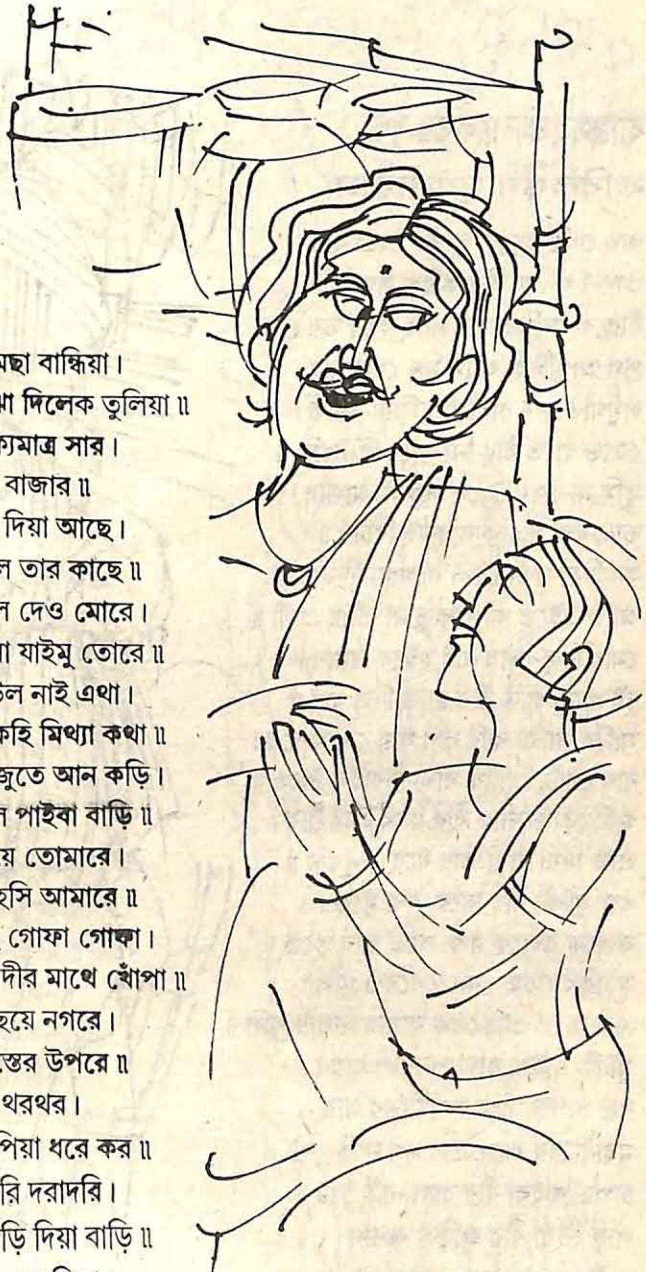
গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়ায়ে রাজপথে ॥
পীত ধড়া দেগো মা গলায় দে গো মালা।
মনে পড়ি গেলা মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতি।
সাজায় বিবিধবেশ মনের আকুতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী সুপীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভূবন জিনি।
পুষ্প-গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ায় টাননি ॥
চরণে নূপুর দিল তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর-পরাণী ॥



গোকুলের রঙ্গ

জ্ঞানদাস

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া ॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে ॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালায়া সভে চলিল এক সাথে ॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনি পাঁচনী কারু হাতে শিঙ্গা বেণু ॥
সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইতে চায় ॥



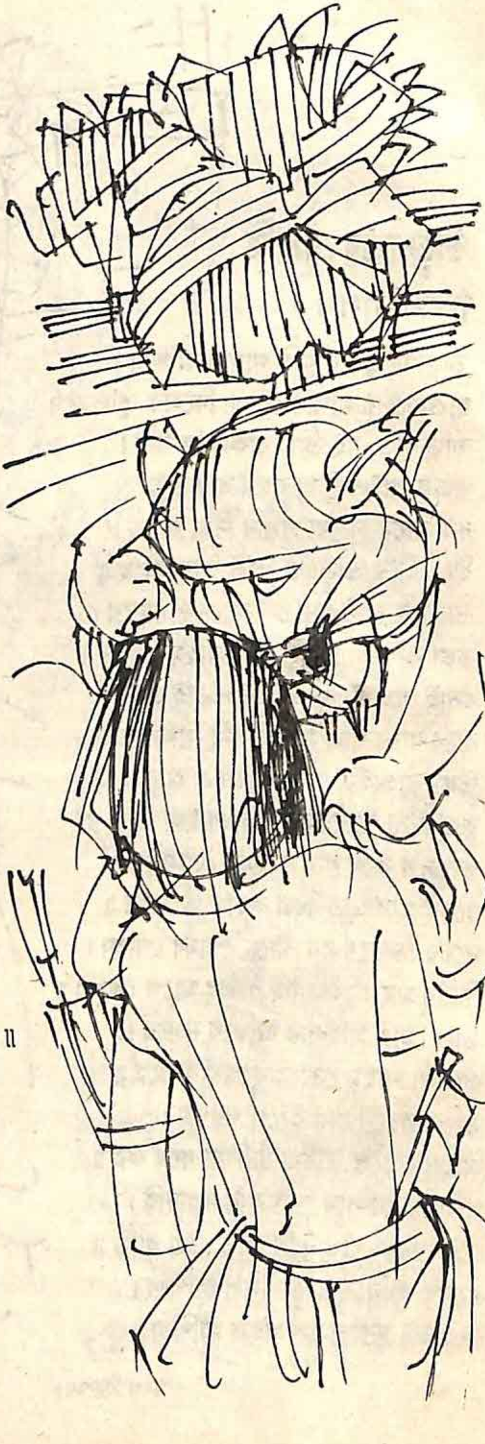
ভাঁড়ুদত্তের বেসাতি
দ্বিজমাধব

ভাঙা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া ॥
কড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ু বাক্যমাত্র সার।
ত্বরায় পাইল গিয়া নগর বাজার ॥
ধনা নামে চালুয়া পসার দিয়া আছে।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ুদত্ত গেল তার কাছে ॥
ভাঁড়ুদত্ত বলে ধনা চাউল দেও মোরে।
তঙ্কা ভাঙাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ॥
ধনাই বলে ভাঁড়ুদত্ত চাউল নাই এথা।
বারে বারে খাও চাউল কহি মিথ্যা কথা ॥
তঙ্কা ভাঙাইয়া আগে মজুতে আন কড়ি।
রুজু দিয়া পাঠাইমু চাউল পাইবা বাড়ি ॥
ভাঁড়ুদত্ত বলে ধনা কহিয়ে তোমারে।
ধনের গর্বে এত কথা কহসি আমারে ॥
ঘরের ভিতরে ধন আছে গোফা গোফা।
গিন্নীর মাথে চুল নাহি বাঁদীর মাথে খোঁপা ॥
ভাল মোর অধিকার আছয়ে নগরে।
কালুকা পাইমু তোরে হস্তের উপরে ॥
ভাঁড়ুর বচনে ধনা কাঁপে থরথর।
আস্তে ব্যেস্তে উঠিয়া চাপিয়া ধরে কর ॥
পরিহাস কৈলাম ভাই করি দরাদরি।
চাউল নিয়া খাও তুমি কড়ি দিয়া বাড়ি ॥
এথেক শুনিয়া ভাঁড়ু বসিল চাপিয়া।
সের অষ্ট দশ চাউল লইল মাপিয়া ॥

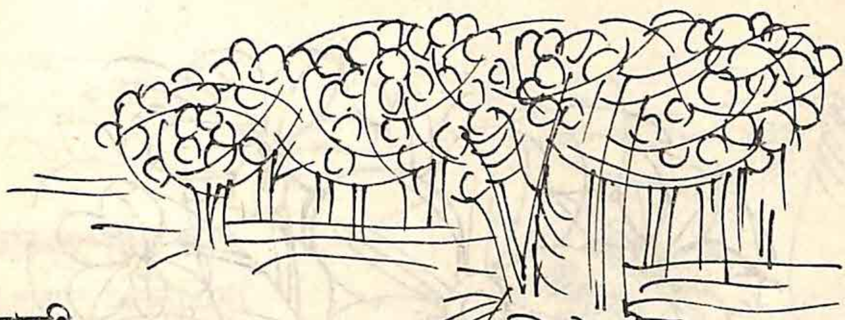
(অংশ বিশেষ)

ব্যাঘ্রসহ কালকেতুর যুদ্ধ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম



বাঘ দেখি আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান ॥
বীরকে দেখিয়া বীর নাহি করে ভয়।
পথ আগুলিয়া আসি মুখ মেলি রয়।
লঘুগতি ধায় বাঘা আঁচড়িয়া ক্ষিতি।
জোড় হাতে বীর নিবেদয়ে দিনপতি ॥
তুমি না উদয় হৈলে সকলি আন্ধার।
ভাল মন্দ সভাকার করহ বিচার ॥
ধন দিয়া সত্য কৈল নগেন্দ্রনন্দিনী।
আজি হইতে কালকেতু না বধিহ প্রাণী ॥
মোর কিছু দোষ নাই হইবে প্রমাণ।
দুই জানু পাতি বীর ছাড়ি দিল বাণ ॥
সাঞি সাঞি করি বাণ যায় ব্যোমপথে।
বাণ গোটা লোফি বাঘা চিবাইল দাঁতে ॥
জুড়িতে উদ্যোগ বীর করে আর বাণ।
লাফ দিয়া বাঘা তার ধরে ধনুখান ॥
বজ্র মুটকী বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণ্ডে ॥
মুটকির তেজ যেন তবকের গুলি।
এক ঘায়ে ভাঙিলেক বাঘার মাথার খুলি ॥
মুটকি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়।
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায় ॥
মহাবীরের অঙ্গে তার নখ নাহি ফুটে।
চাপড় খাইয়া বীর বলে নাহি টুটে ॥
পাছু হইয়া বীর জুড়িল কৃপাণ।
সেই ঘায়ে বাঘারে করিল দুইখান ॥
হরি হরি বলি সর্বজন কাটে বন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

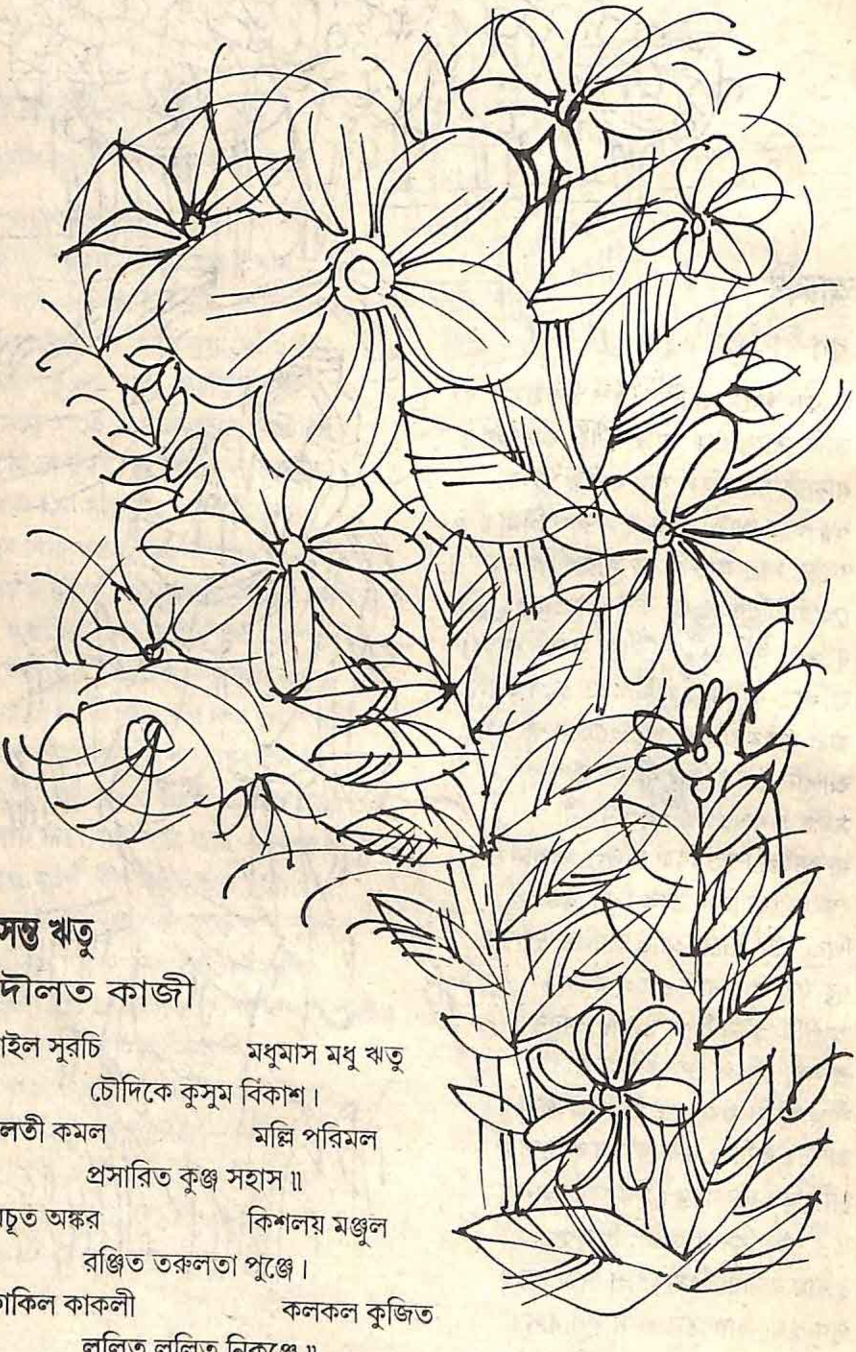


আরুণি

কাশীরাম দাস

আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল কতক্ষণ ॥
ধান্যক্ষেত্রের জল যায় বাহির হইয়া।
যত্ন করে আলি বান্ধি জল রাখ গিয়া ॥
আজ্ঞা মাত্র আরুণি যে করিল গমন।
ক্ষেত্র বাঁধিবারে বহু করিল যতন ॥
দন্তেতে খুঁড়িয়া মাটি বাঁধে লয়ে ফেলে।
রাখিতে না পারে মাটি অতি বেগ জলে ॥
জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধের উপরে ॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিশু দ্বিজ চলিল আপনি ॥
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে শুয়ে আছি আলির উপর ॥
বহু যত্ন করি নাহি রহিল বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ ॥
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরুপদে প্রণমিল গিয়া ॥
আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারিবেদ ষটশাস্ত্রে হৌক তব জ্ঞান ॥
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম দাস কহে ভব পরিত্রাণ ॥

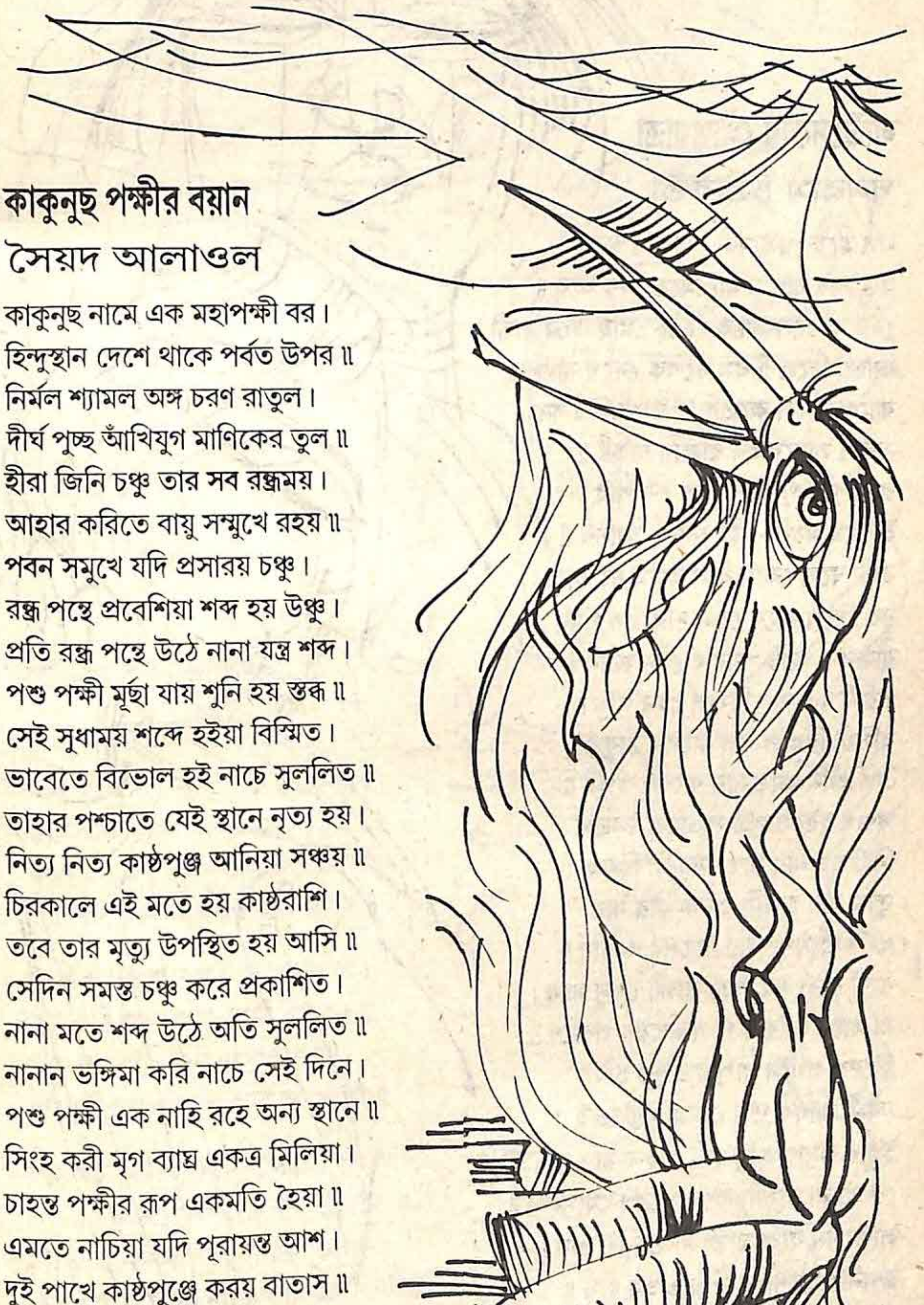




বসন্ত ঋতু

দৌলত কাজী

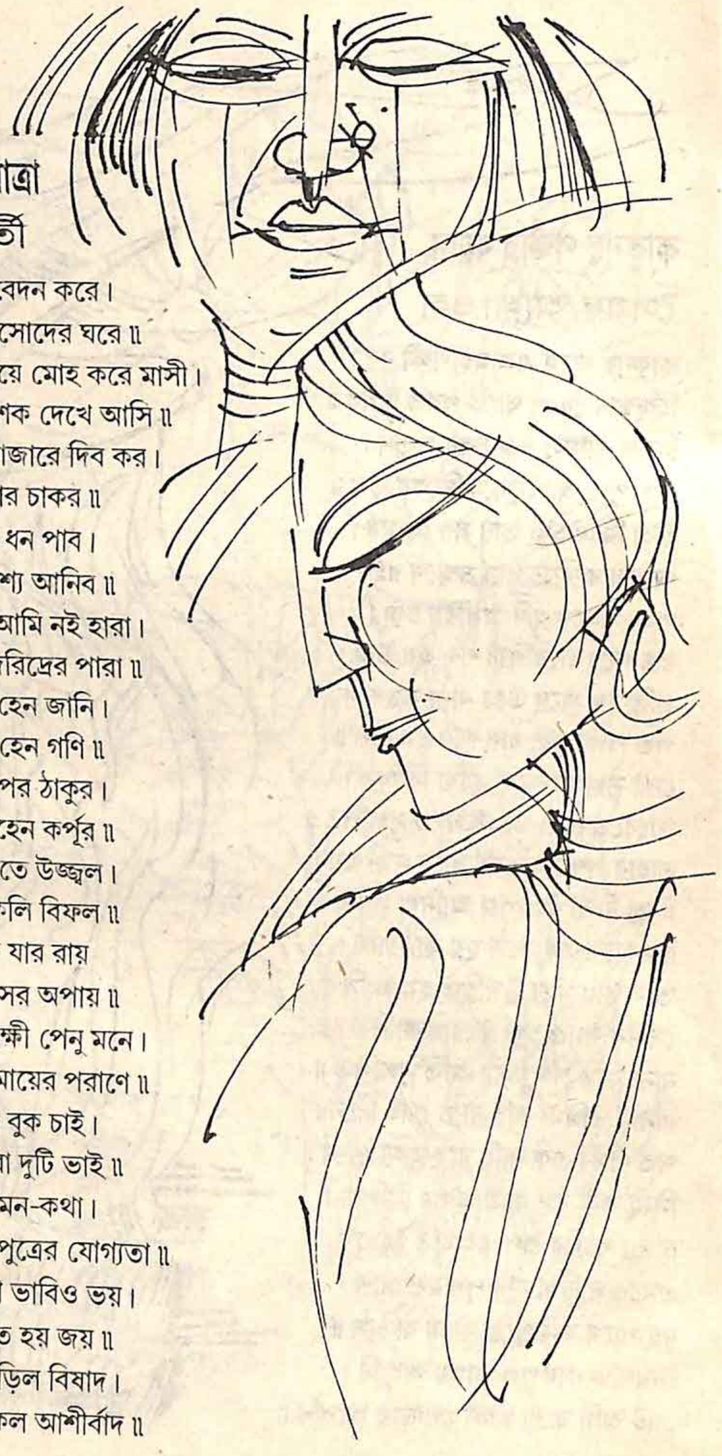
আইল সুরচি মধুমাস মধু ঋতু
চৌদিকে কুসুম বিকাশ।
মালতী কমল মল্লি পরিমল
প্রসারিত কুঞ্জ সহাস ॥
নবচূত অঙ্কর কিশলয় মঞ্জুল
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কলকল কুজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে ॥



কাকুনুছ পক্ষীর বয়ান

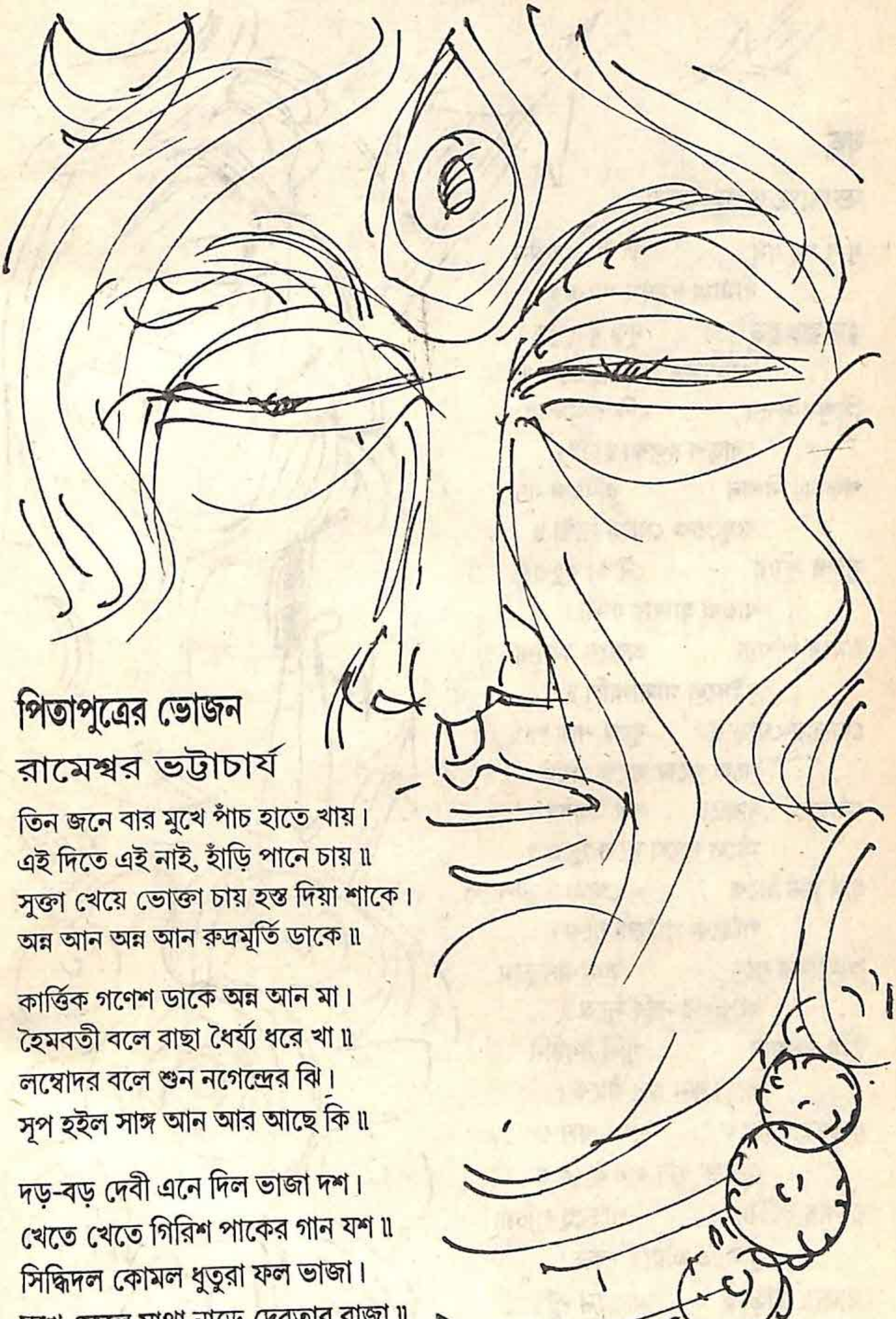
সৈয়দ আলাওল

কাকুনুছ নামে এক মহাপক্ষী বর।
হিন্দুস্থান দেশে থাকে পর্বত উপর ॥
নির্মল শ্যামল অঙ্গ চরণ রাতুল।
দীর্ঘ পুচ্ছ আঁখিযুগ মাণিকের তুল ॥
হীরা জিনি চঞ্চু তার সব রন্ধ্রময়।
আহার করিতে বায়ু সম্মুখে রহয় ॥
পবন সমুখে যদি প্রসারয় চঞ্চু।
রন্ধ্র পন্থে প্রবেশিয়া শব্দ হয় উঞ্চু।
প্রতি রন্ধ্র পন্থে উঠে নানা যন্ত্র শব্দ।
পশু পক্ষী মূর্ছা যায় শুনি হয় স্তব্ধ ॥
সেই সুধাময় শব্দে হইয়া বিস্মিত।
ভাবেতে বিভোল হই নাচে সুললিত ॥
তাহার পশ্চাতে যেই স্থানে নৃত্য হয়।
নিত্য নিত্য কাষ্ঠপুঞ্জ আনিয়া সঞ্চয় ॥
চিরকালে এই মতে হয় কাষ্ঠরাশি।
তবে তার মৃত্যু উপস্থিত হয় আসি ॥
সেদিন সমস্ত চঞ্চু করে প্রকাশিত।
নানা মতে শব্দ উঠে অতি সুললিত ॥
নানান ভঙ্গিমা করি নাচে সেই দিনে।
পশু পক্ষী এক নাহি রহে অন্য স্থানে ॥
সিংহ করী মৃগ ব্যাঘ্র একত্র মিলিয়া।
চাহন্ত পক্ষীর রূপ একমতি হৈয়া ॥
এমতে নাচিয়া যদি পূরায়ন্ত আশ।
দুই পাখে কাষ্ঠপুঞ্জে করয় বাতাস ॥
দৈবগতি কাষ্ঠপুঞ্জ লাগয় আগুনি।
সেই অগ্নি মধ্যে পক্ষী পোড়ায় আপনি ॥



লাউসেনের গৌড়যাত্রা
ঘনরাম চক্রবর্তী

নত হয়ে লাউসেন নিবেদন করে।
বড় সাধ যাব মামা-মেসোদের ঘরে ॥
লোকে বলে মাকে চেয়ে মোহ করে মাসী।
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখে আসি ॥
কালে কালে কতেক রাজারে দিব কর।
সদাস সাদরে হব রাজার চাকর ॥
রাজপুরে পুরস্কার কত ধন পাব।
ইলামে ময়না-মহী অবশ্য আনিব ॥
রাণী বলে কোন ধনে আমি নই হারা।
দূর দেশে যাবে কেন দরিদ্রের পারা ॥
রাজকর খরচ খয়রাৎ হেন জানি।
পরাধীন পরাণ বিফল হেন গণি ॥
বসিয়া বিরাজ কর বাপের ঠাকুর।
এত শুনি আগুসান কহেন কর্পূর ॥
সগুণ হইলে পুত্র সভাতে উজ্জ্বল।
নির্গুণ জনার মাতা সকলি বিফল ॥
তুমি যার জননী জনক যার রায়
ধর্ম যার সখা তার কিসের অপায় ॥
রাণী বলে সব সত্য সাক্ষী পেনু মনে।
না মানে প্রবোধ পাপ মায়ের পরাণে ॥
বিদেশ গমনে বাপু বড় বুক চাই।
নবনী অধিক তনু তোরা দুটি ভাই ॥
ইহার কারণ বাপু কহি মন-কথা।
কে বা না বাসনা করে পুত্রের যোগ্যতা ॥
লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।
জননীর আশীষে জগতে হয় জয় ॥
প্রবোধ পাইয়া রাণী ঝাড়িল বিষাদ।
শিরে হাত দিয়া কত কৈল আশীর্বাদ ॥



পিতাপুত্রের ভোজন

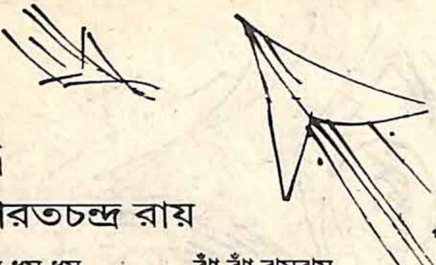
রামেশ্বর ভট্টাচার্য

তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই, হাঁড়ি পানে চায় ॥
সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে ॥

কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে খা ॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি ॥

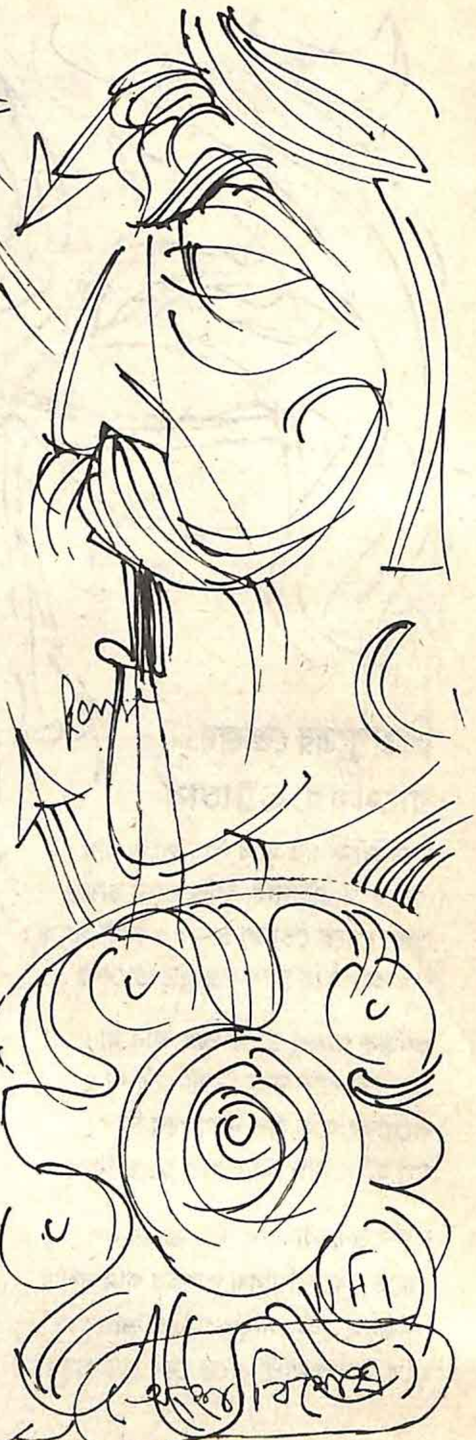
দড়-বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ পাকের গান যশ ॥
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥

(অংশ বিশেষ)



যুদ্ধ
ভারতচন্দ্র রায়

ধূ ধূ ধম্ ধম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্‌ঝম্
দামামা দম্‌দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে ॥
সিন্দুর সুন্দর মন্দিত মুদগর
ষোড়শ হলকা হাতী।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্র বান
অযুতেক ঘোড়া সাথী ॥
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুইদলে গালাগালি ॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥
হান হান হাঁকে খেলে উড়াপাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধুমে তমঃ রণভূমে
আত্মপর নাহি সুঝে ॥
তীর শনশনি গুলি ঠনঠনি
খাঁড়া ঝন্ ঝন্ ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে
ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুটিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥

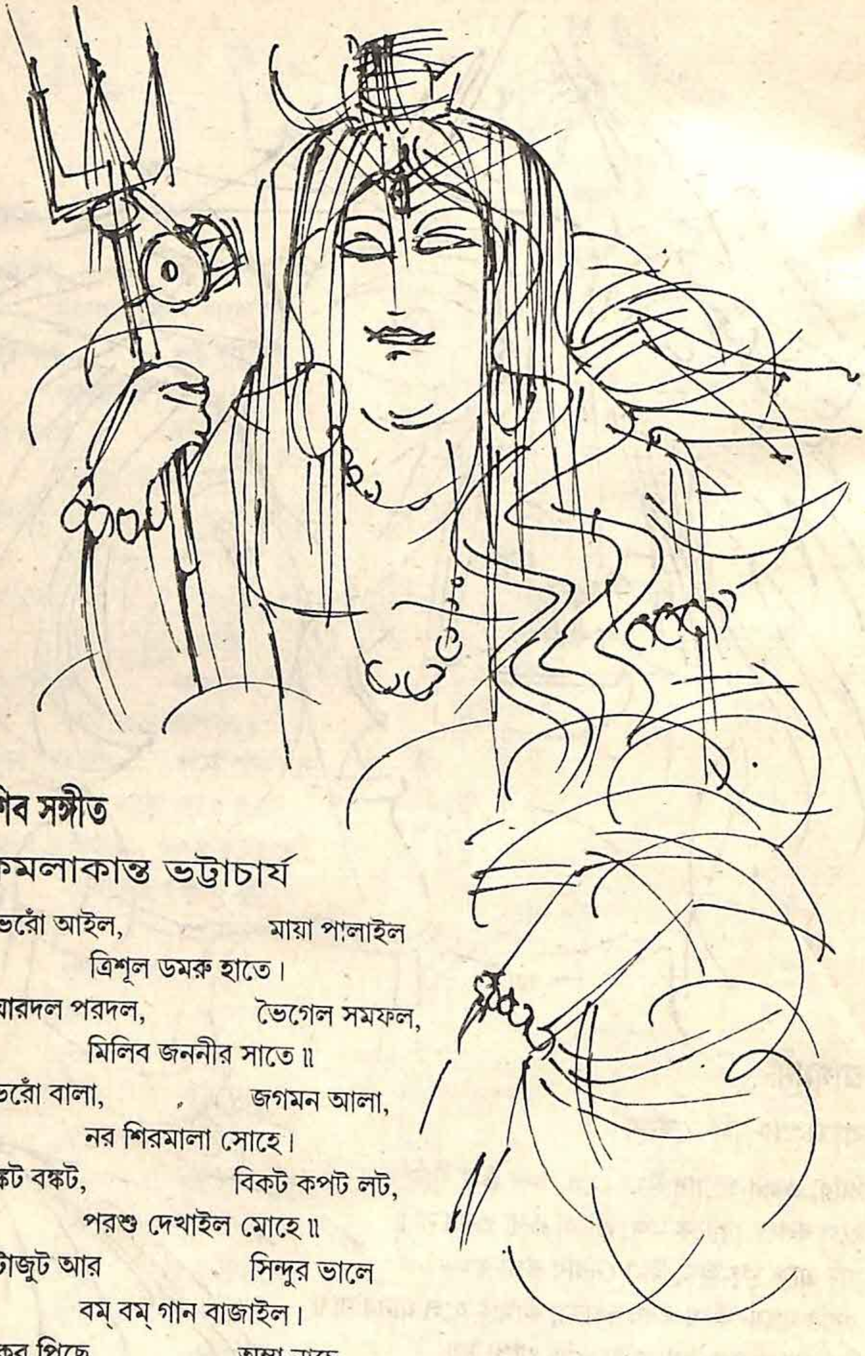




আগমনী

রামপ্রসাদ সেন

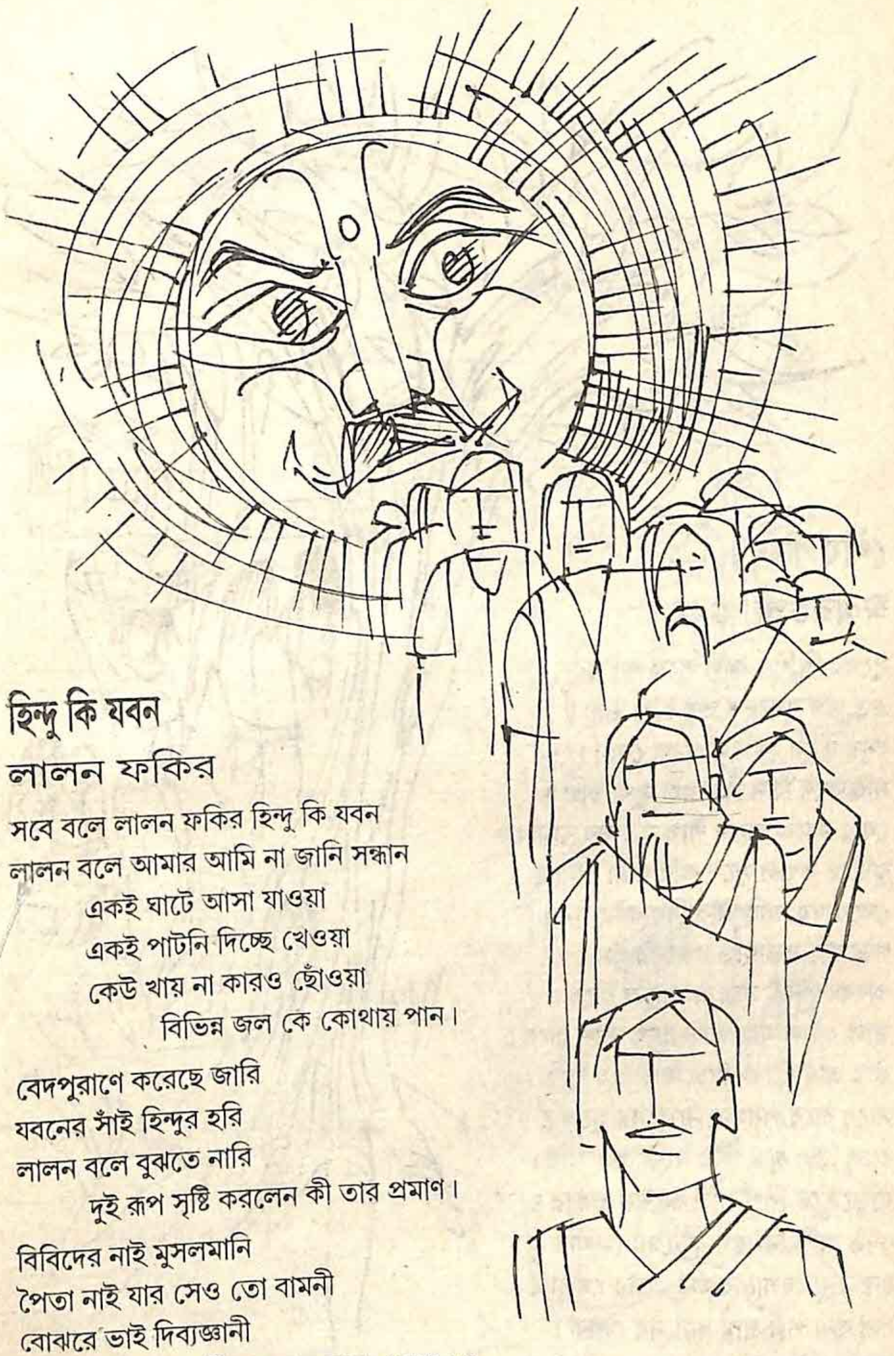
গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥



শিব সঙ্গীত

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

ভৈরোঁ আইল, মায়া পালাইল
ত্রিশূল ডমরু হাতে।
ঘোরদল পরদল, ভৈগেল সমফল,
মিলিব জননীর সাতে ॥
ভৈরোঁ বালা, জগমন আলা,
নর শিরমালা সোহে।
সঙ্কট বঙ্কট, বিকট কপট লট,
পরশু দেখাইল মোহে ॥
জটাজুট আর সিন্দুর ভালে
বম্ বম্ গান বাজাইল।
তাকর পিছে অম্বা নাচে,
কমল অমলপদ পাইল ॥



হিন্দু কি যবন

লালন ফকির

সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান
একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনি দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায় না কারও ছোঁওয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।

বেদপুরাণে করেছে জারি
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
লালন বলে বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কী তার প্রমাণ।

বিবিদের নাই মুসলমানি
পৈতা নাই যার সেও তো বামনী
বোঝরে ভাই দিব্যজ্ঞানী
লালন তেমনি খাতনার জাত একখান॥



পৌষ পার্বণ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সুখের শিশির-কাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা ॥
ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ ॥
ঘোর জাঁকে বাজে শাঁখ যত সব বামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা ॥
মেয়েদের নাহি আর দিবারাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধুম ॥
অবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে ॥
কত তার থাকে কাঁচা কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে ॥
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার ॥
বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা ॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসেবেতে আহারের ঝোঁক ॥



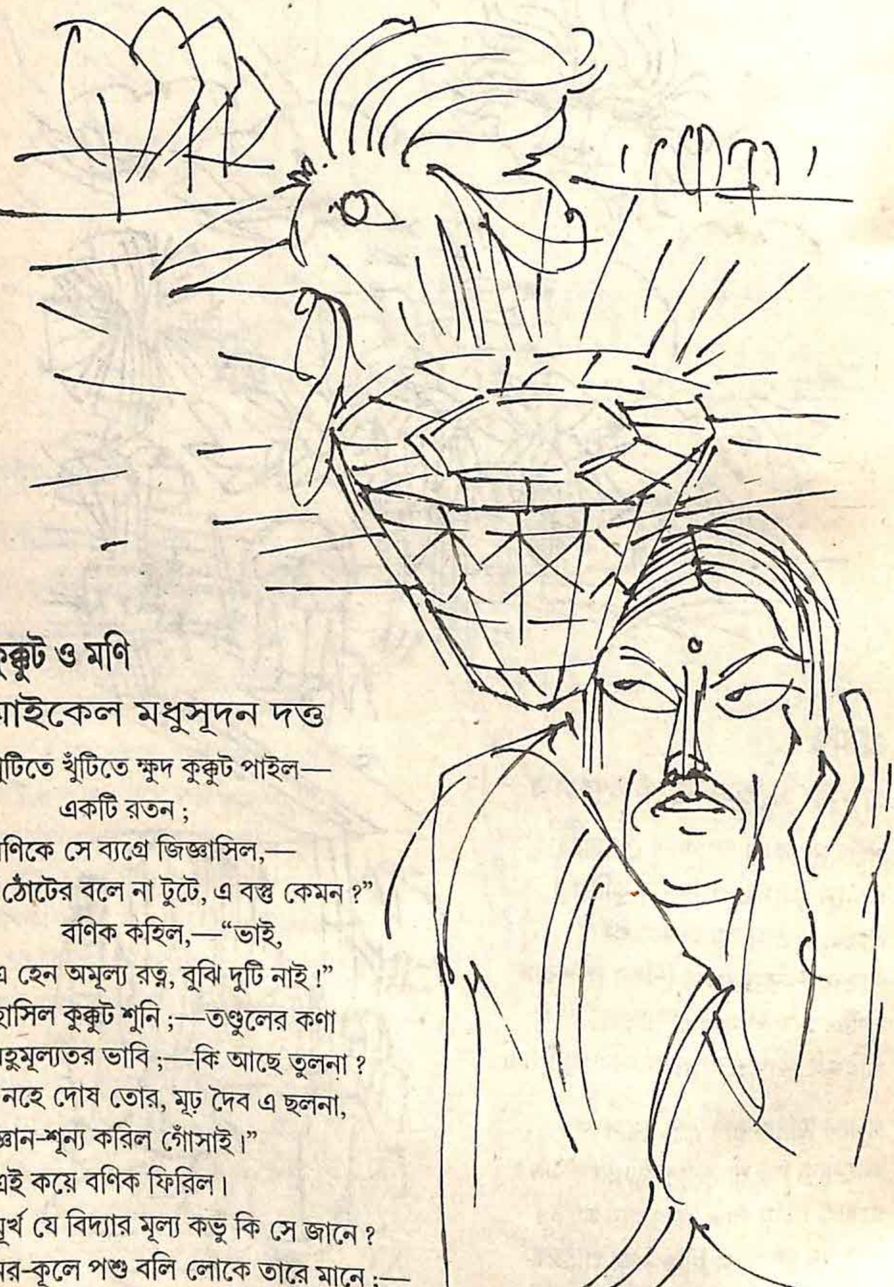
প্রভাত

মদনমোহন তর্কালঙ্কার



পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমগুলি সকলি ফুটিল ৷৷
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায়-পাতায় পড়ে নিশির শিশির ৷৷
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল ৷৷

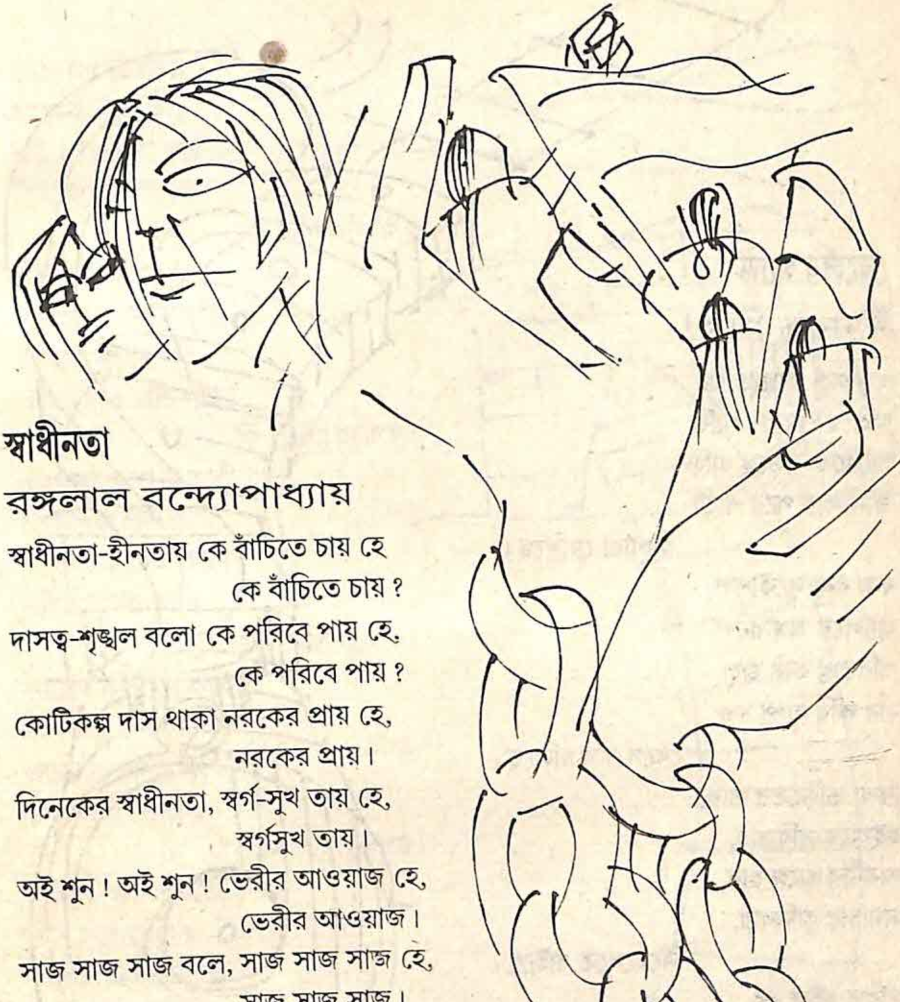
গগনে উঠিল রবি সোনার বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন ৷৷
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ৷৷
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ ৷৷



কুক্কুট ও মণি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল—
একটি রতন ;
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল,—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"
বণিক কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি দুটি নাই !"
হাসিল কুক্কুট শুনি ;—তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা ?
"নহে দোষ তোর, মূঢ় দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই।"
এই কয়ে বণিক ফিরিল।
মূর্খ যে বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে ?
নর-কূলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাবে ॥



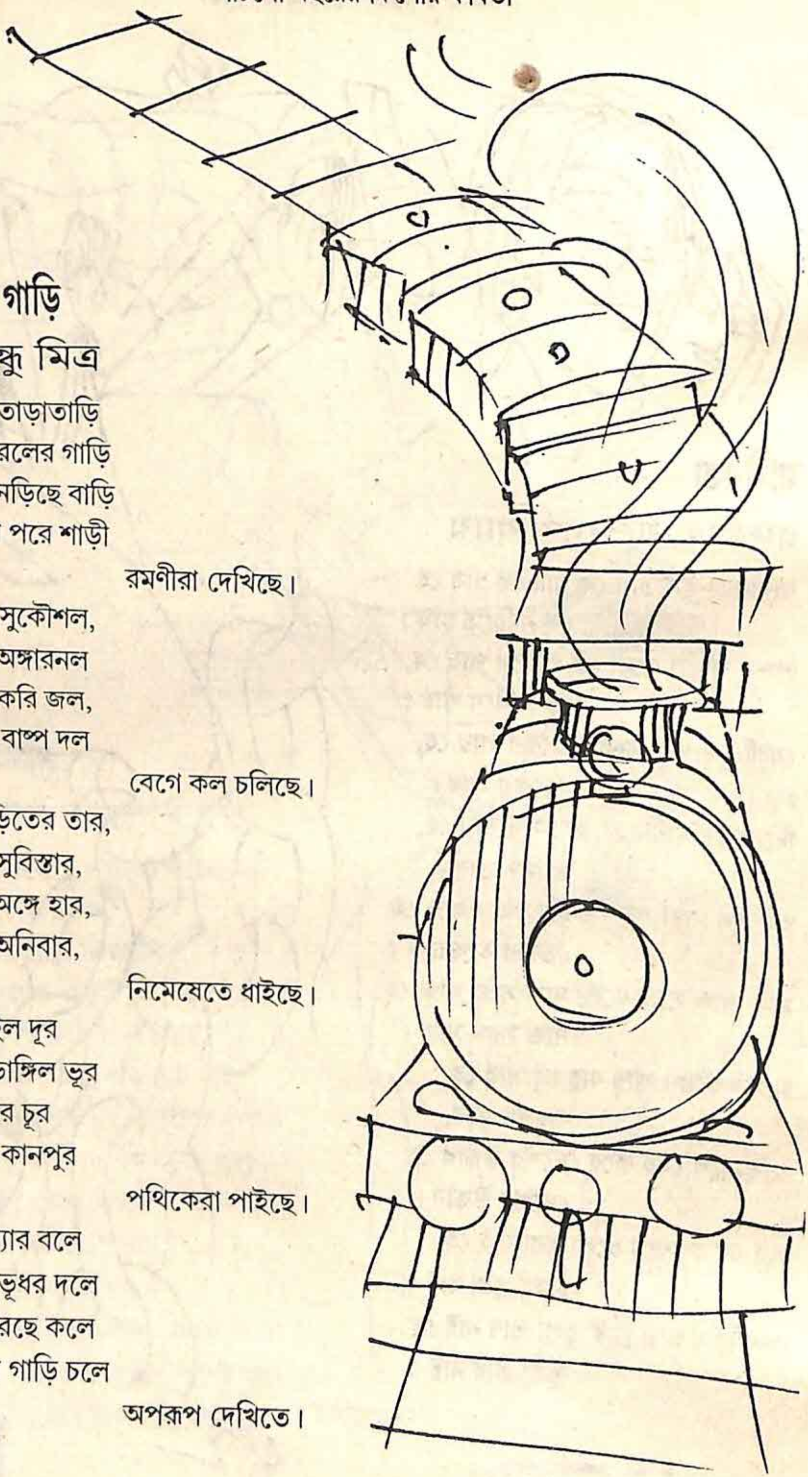
স্বাধীনতা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।
অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।
অতএব রণভূমে চলো ত্বরা যাই হে,
চলো ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই॥

(সংক্ষেপিত)

62



রেলের গাড়ি

দীনবন্ধু মিত্র

গড় গড় তাড়াতাড়ি
চলিছে রেলের গাড়ি
ধারেতে নড়িছে বাড়ি
জানালায় পরে শাড়ী
রমণীরা দেখিছে।

ধন্য ধন্য সুকৌশল,
জ্বালিয়ে অঙ্গারনল
পরিতপ্ত করি জল,
বার করি বাষ্প দল
বেগে কল চলিছে।

কিবা তড়িতের তার,
হইয়াছে সুবিস্তার,
অবনীর অঙ্গে হার,
সমাচার অনিবার,
নিমেষেতে ধাইছে।

দূরিত হইল দূর
কালের ভাঙ্গিল ভূর
বন্ধুর ভূধর চূর
একদিনে কানপুর
পথিকেরা পাইছে।

পদার্থবিদ্যার বলে
খোদিয়ে ভূধর দলে
সুড়ঙ্গ করেছে কলে
তার মধ্যে গাড়ি চলে
অপরূপ দেখিতে।

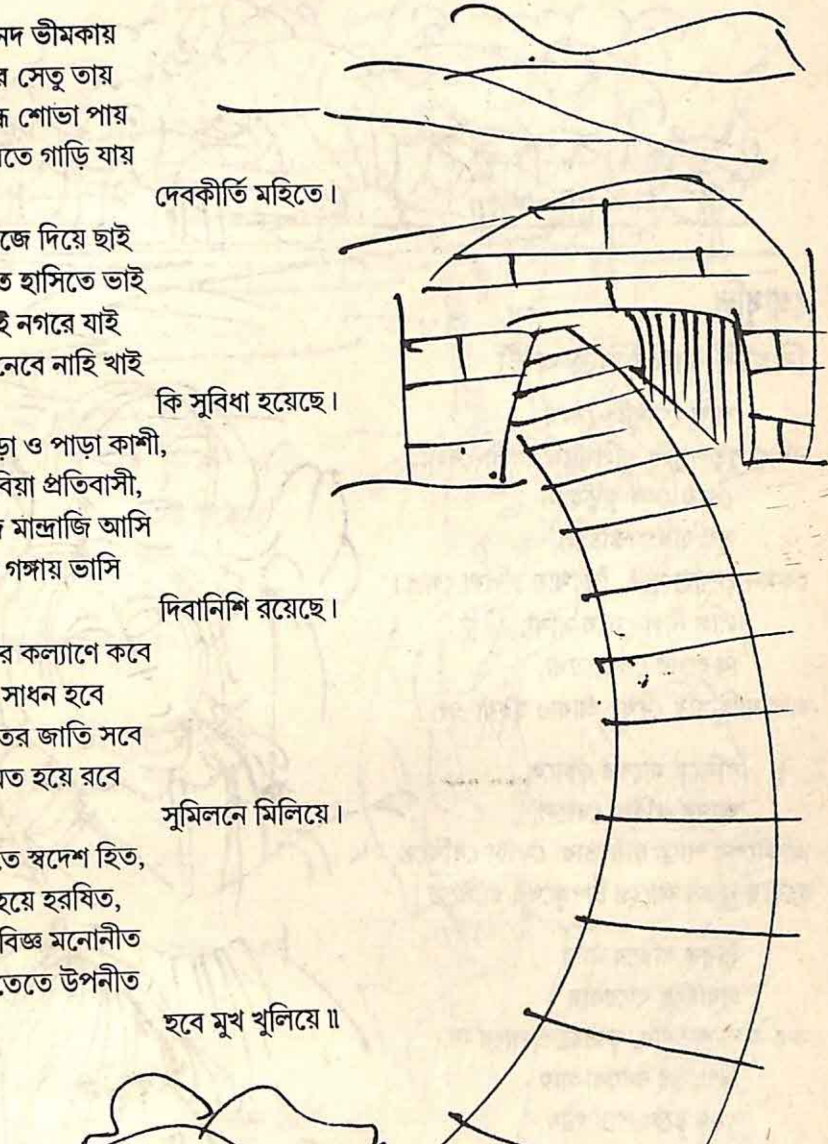
শোন নদ ভীমকায়
ইষ্টকের সেতু তায়
কটিবন্ধ শোভা পায়
নির্ভয়েতে গাড়ি যায়
দেবকীর্তি মহিতে।

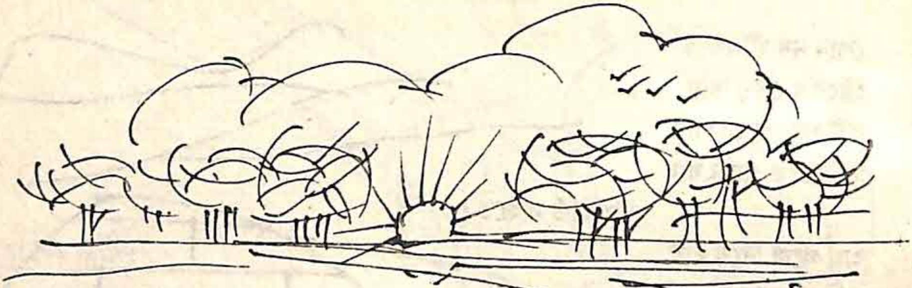
অশ্ব গজে দিয়ে ছাই
হাসিতে হাসিতে ভাই
বোম্বাই নগরে যাই
পথে নেবে নাহি খাই
কি সুবিধা হয়েছে।

এ পাড়া ও পাড়া কাশী,
পাঞ্জাবিয়া প্রতিবাসী,
সহজে মান্দ্রাজি আসি
পবিত্র গঙ্গায় ভাসি
দিবানিশি রয়েছে।

রেলের কল্যাণে কবে
মঙ্গল সাধন হবে
ভারতের জাতি সবে
এক মত হয়ে রবে
সুমিলনে মিলিয়ে।

সাধিতে স্বদেশ হিত,
মনে হয়ে হরষিত,
কবে বিজ্ঞ মনোনীত
বিলাতেতে উপনীত
হবে মুখ খুলিয়ে ॥





গোধূলি

বিহারীলাল চক্রবর্তী

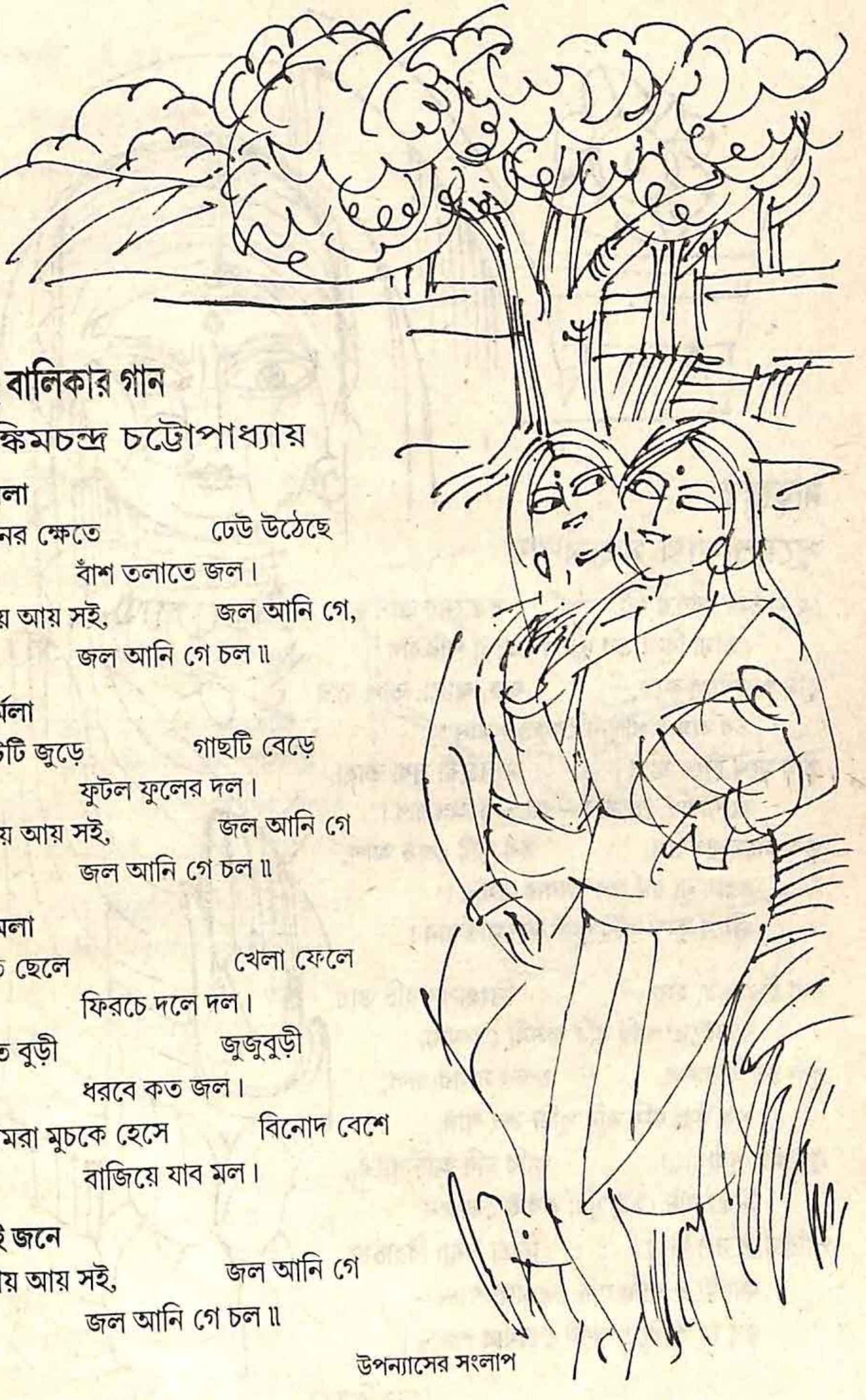


শান্ত গোধূলি-বেলা!
ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলা-দেলা।
চেয়ে দেখ কুতূহলে
সূর্য যায় অস্তাচলে,—
কেমন প্রশান্ত মূর্তি, কোথায় চলিয়া গেল।
লাল নীল মেঘে মাখা,
কিরণের শেষ রেখা,
আর নাহি যায় দেখা, আঁধার হইয়া এল।

বসিয়ে মায়ের কোলে
আদর করিয়া দোলে,
আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে,
হয়েছে নূতন আলো চাঁদমুখের হাসিতে।

চিবুক ধরিয়ে মা'র
সুধাইছে বারেবার
কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে না।
দিগন্তের কালো গায়
মেঘ চলে পায় পায়,
চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না।

গঙ্গা বহে কুলু কুলু,
যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু,
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়
থাকিয়া নিমগ্ন মনে ঝুমুর পূরবী গায়।



দুই বালিকার গান

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অমলা

ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
বাঁশ তলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল ॥

নির্মলা

ঘাটটি জুড়ে গাছটি বেড়ে
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনি গে
জল আনি গে চল ॥

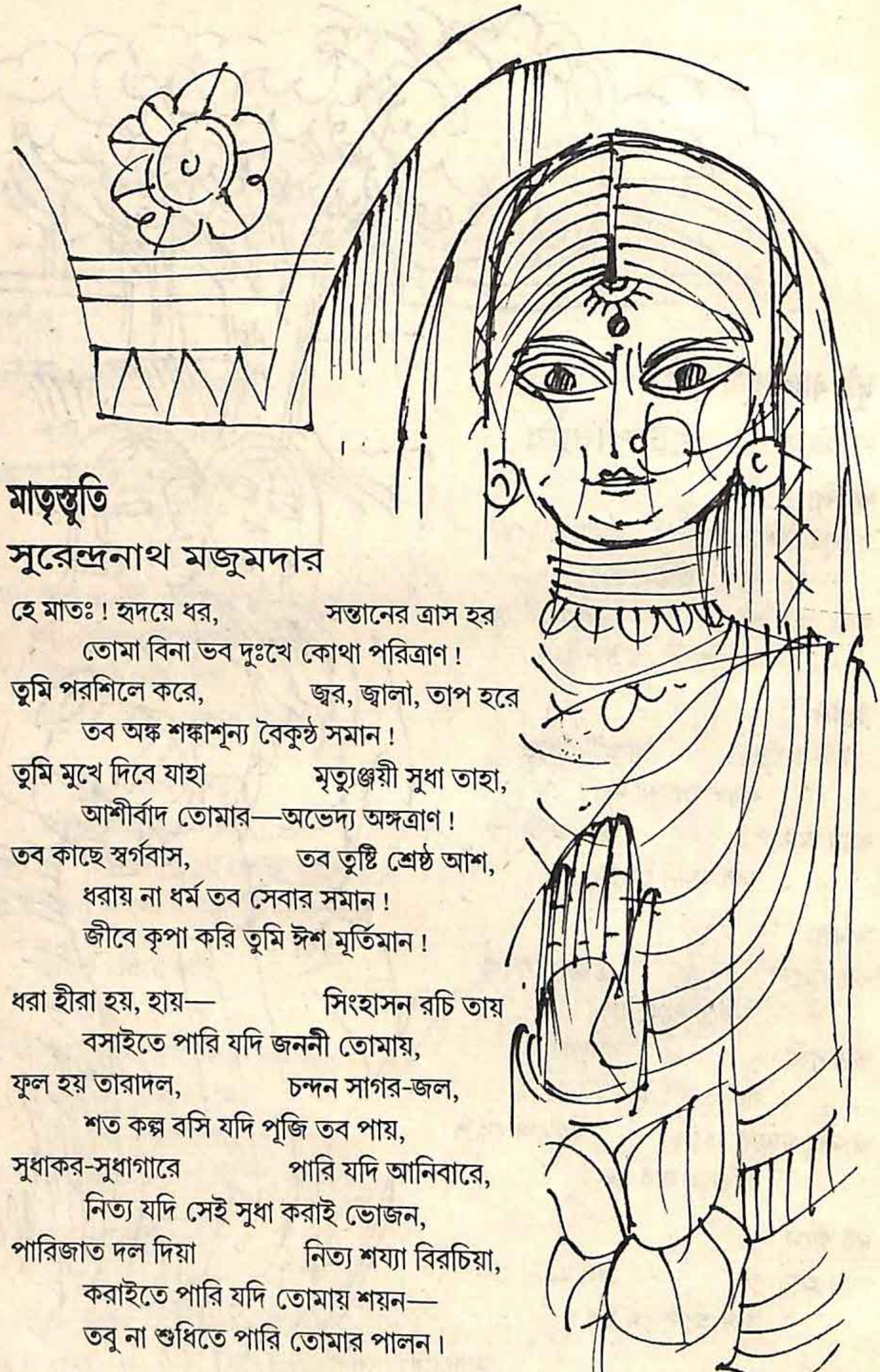
অমলা

যত ছেলে খেলা ফেলে
ফিরচে দলে দল।
কত বুড়ী জুজুবুড়ী
ধরবে কত জল।
আমরা মুচকে হেসে বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল।

দুই জনে

আয় আয় সই, জল আনি গে
জল আনি গে চল ॥

উপন্যাসের সংলাপ



মাতৃস্তুতি

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

হে মাতঃ! হৃদয়ে ধর, সন্তানের ত্রাস হর
তোমা বিনা ভব দুঃখে কোথা পরিত্রাণ!
তুমি পরশিলে করে, জ্বর, জ্বালা, তাপ হরে
তব অঙ্ক শঙ্কাশূন্য বৈকুণ্ঠ সমান!
তুমি মুখে দিবে যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা তাহা,
আশীর্বাদ তোমার—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ!
তব কাছে স্বর্গবাস, তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম তব সেবার সমান!
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মূর্তিমান!

ধরা হীরা হয়, হায়— সিংহাসন রচি তায়
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায়,
ফুল হয় তারাদল, চন্দন সাগর-জল,
শত কল্প বসি যদি পূজি তব পায়,
সুধাকর-সুধাগারে পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন,
পারিজাত দল দিয়া নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন—
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন।

(অংশ বিশেষ)

দেশলাইয়ের স্তব

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নমামি বিলাতি অগ্নি দেশলাইরূপী,
দেহখানি চাঁচা ছোলা, শিরে বাঁধা টুপি !
যেমন ডেপুটিবাবু একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বেড়—রাগে দেহ ভরা !

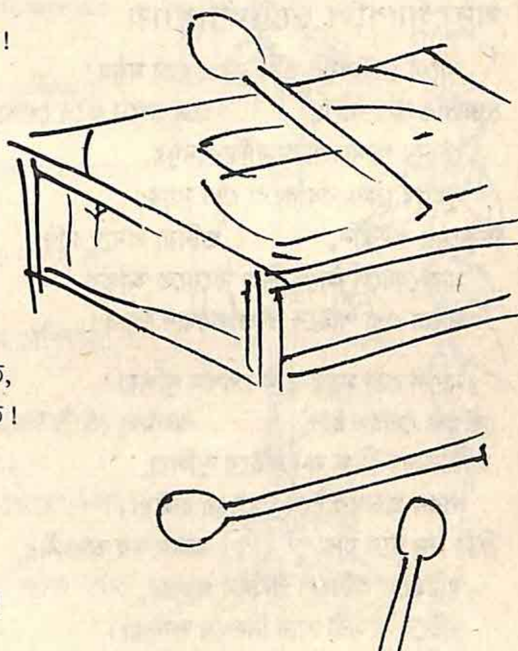
নমামী গন্ধকগন্ধ মুণ্ডটী গোলালো,
সর্বজাতি প্রিয় দেব গৃহ কর আলো !
শান্ত সভ্য অতি ধীর—চাপে যতক্ষণ,
ধাপে উঠে চটে লাল—গৌরাঙ্গ যেমন !

নমামি সর্বত্রগামী দারু অবতার,
চৌর্যবিঘ্ন-বিনাশন কুটুম্ব টীকার !
নিদ্রিতের গুপ্তচর, পাচিকার প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলীর শিরে যার স্থান !

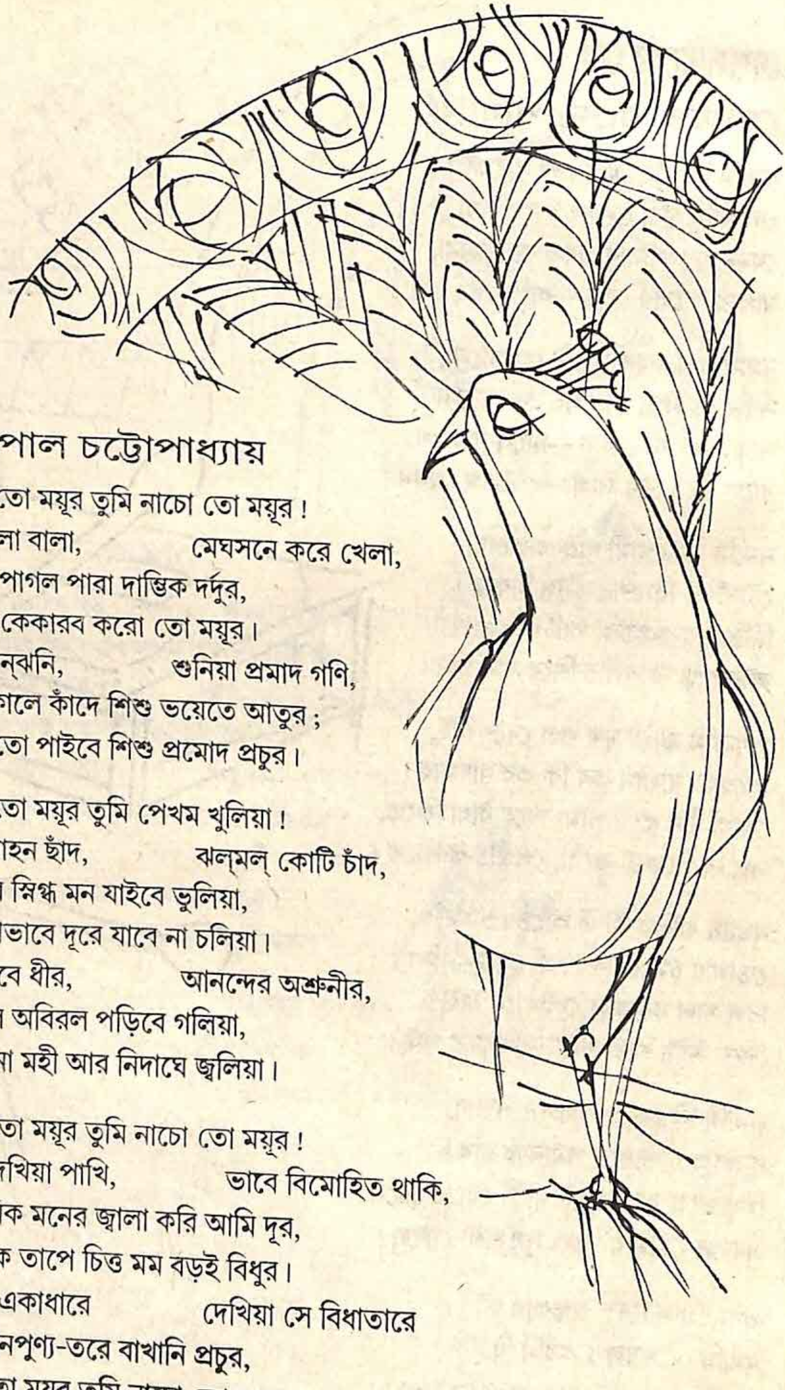
প্রণমামি জ্বালা মুখ শুভ্র দেশেলাই,
সাহেব গোলাম তব কি কব বাদসাই !
সোণা টীন রূপা তামা গায়ে বাঁধা ফিতে,
লাটের পকেটে ওঠো, লেডীর ঝাঁপিতে !

নমামি কলির কীর্তি কাষ্ঠের চক্‌মকি,
তোমার চমকে বিশ্বকর্মা গেছে ঠকি !
বিল খাল বন জল যেইখানে যাই,
শিরে ভাঁটা শাদা শলা দেখিবারে পাই !

নমামি কিরণদণ্ড কোপন-স্বভাব,
রাজগৃহ চালাঘরে সমান প্রভাব !
সিন্ধুজলে পথে ঘাটে গাড়ী ঘোড়া রেলে,
সকলে তোমায় পূজে সূর্য শশী ফেলে !



প্রণমামি খর্বদেহ অন্ধকার হারি !
নমামি অশেষরূপ অবনি বিহারী !
নমামি মোমের ভাঁটা ফস্ফরেতে মলা !
উনবিংশ শতাব্দীর অনলের শলা !



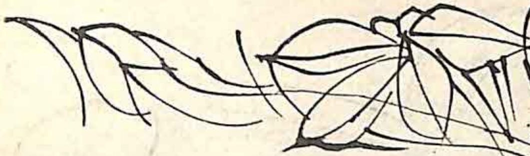
ময়ূর

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

নাচো তো ময়ূর তুমি নাচো তো ময়ূর !
চঞ্চলা চপলা বালা, মেঘসনে করে খেলা,
চেঁচায় পাগল পারা দাম্ভিক দর্দুর,
সুমধুর কেকারব করো তো ময়ূর।
চিকুরের ঝন্‌ঝনি, শুনিয়া প্রমাদ গণি,
মার কোলে কাঁদে শিশু ভয়েতে আতুর ;
নাচো তো পাইবে শিশু প্রমোদ প্রচুর।

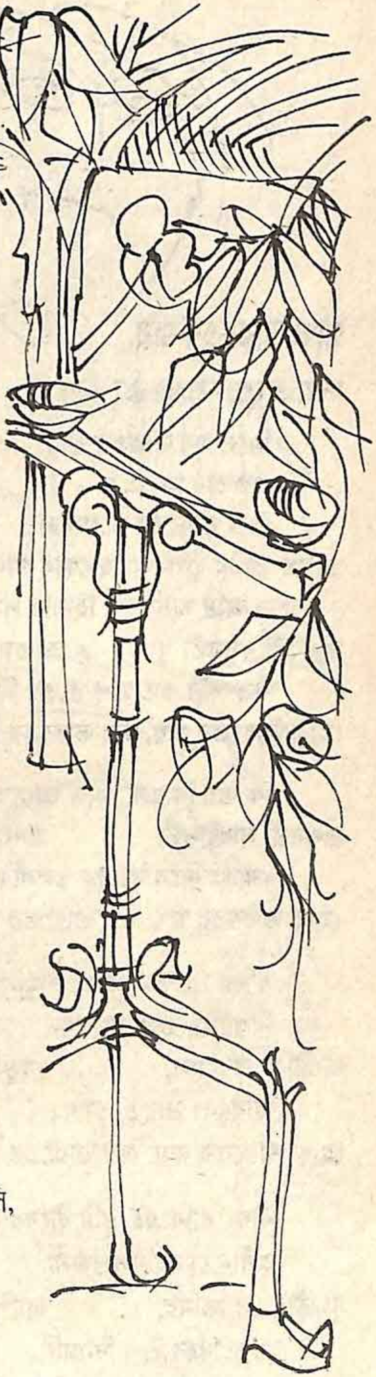
নাচো তো ময়ূর তুমি পেখম খুলিয়া !
দেখিয়া মোহন ছাঁদ, ঝল্‌মল্ কোটি চাঁদ,
নীরদের স্নিগ্ধ মন যাইবে ভুলিয়া,
পবন প্রভাবে দূরে যাবে না চলিয়া।
গিরি সম রবে ধীর, আনন্দের অশ্রুনীর,
বৃষ্টিছলে অবিরল পড়িবে গলিয়া,
দহিবে না মহী আর নিদাঘে জ্বলিয়া।

নাচো তো ময়ূর তুমি নাচো তো ময়ূর !
তোমারে দেখিয়া পাখি, ভাবে বিমোহিত থাকি,
খানিক মনের জ্বালা করি আমি দূর,
শোক তাপে চিত্ত মম বড়ই বিধুর।
শোভারাশি একাধারে দেখিয়া সে বিধাতারে
নির্মাণ-নৈপুণ্য-তরে বাখানি প্রচুর,
নাচো তো ময়ূর তুমি নাচো তো ময়ূর !

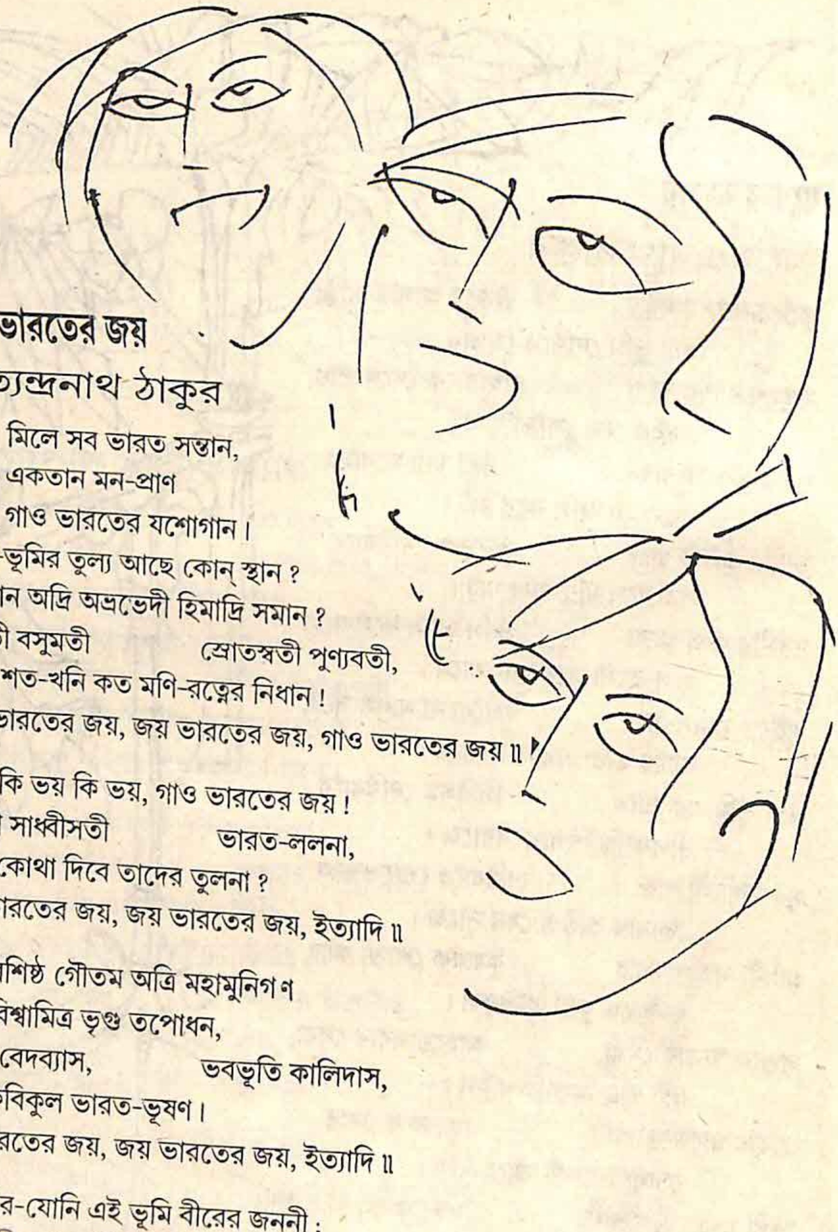


যক্ষের আলয়

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর



কুবের-আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির-দ্বার বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর
পদ্ম-সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটি ধারে অপরূপ দেখিবারে
পরকাশে মণি-বাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে ভাসি ভাসি দলে দলে
হংস-হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানস-সরে কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উঁচা ভূমি এক ধারে গিরিসম দেখিবারে
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ কদলী দারু চারিধারে শোভে চারু,
তোমার তড়িত যেন সাজে।
মাধবী-মণ্ডপ 'পরে কুরুবক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটে অলিকুল।
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল। ···
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
এ সকল নিদর্শনে চিনিবে মুহূর্তক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ি-পানে।
এবে উহা শূন্যপ্রায়, কমল না শোভা পায়
কখনো দিবস-অবসানে।



গাও ভারতের জয়

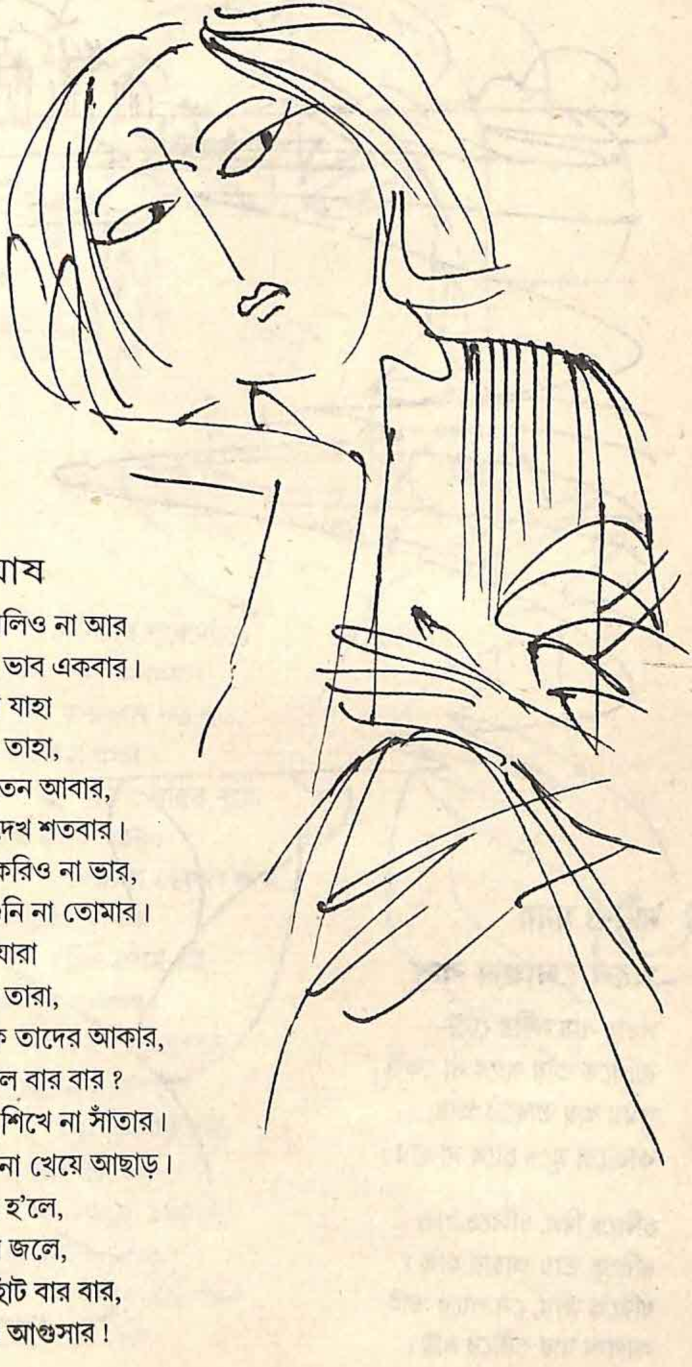
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মন-প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়!
রূপবতী সাধ্বীসতী ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, ইত্যাদি॥

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, ইত্যাদি॥

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, ইত্যাদি॥



পারিব না

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

'পারিব না' একথাটি বলিও না আর
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।
পাঁচজনে পারে যাহা
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার কর যতন আবার,
একবারে না পারিলে দেখ শতবার।
'পারিব না', বলে মুখ করিও না ভার,
ও কথাটি মুখে যেন শুনি না তোমার।
অলস অবোধ যারা
কিছুই পারে না তারা,
তোমায় তো দেখিনা'ক তাদের আকার,
তবে কেন পারিব না বল বার বার?
জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার।
হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।
সাঁতার শিখিতে হ'লে,
আগে তবে নাম জলে,
আছাড়ে করিয়া হেলা হাঁট বার বার,
পারিব বলিয়া সুখে হও আগুসার!

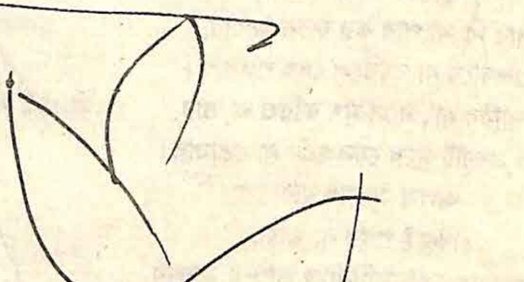


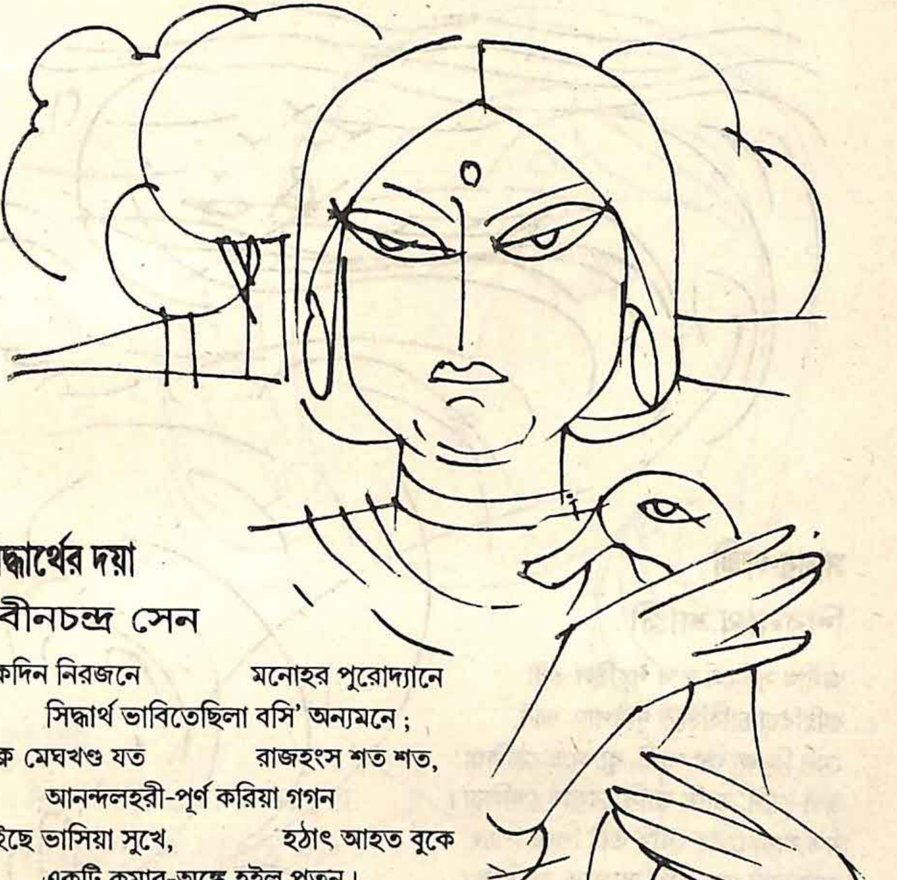
নদী ও সময়

মনোমোহন বসু

সদায় ধায় নদীর ঢেউ—
রাখিতে তায় পারে না কেউ ;
সময় যায় তাহারি প্রায়,
কাহারো মুখে চাহে না হায় !

চলিছে দিন, চলিছে রাত ;
ধরিতে তায় কাহার হাত ?
ধরিতে তায়, সে পারে ভাই,
আলস্য যার শরীরে নাই।





সিদ্ধার্থের দয়া

নবীনচন্দ্র সেন

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্যমনে ;
শুক্ল মেঘখণ্ড যত রাজহংস শত শত,
আনন্দলহরী-পূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে, হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শরে, লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিল প্রথম,
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে,
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল।
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত,
চাহি ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাল।
কি মহিমা করুণার কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান !
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ !



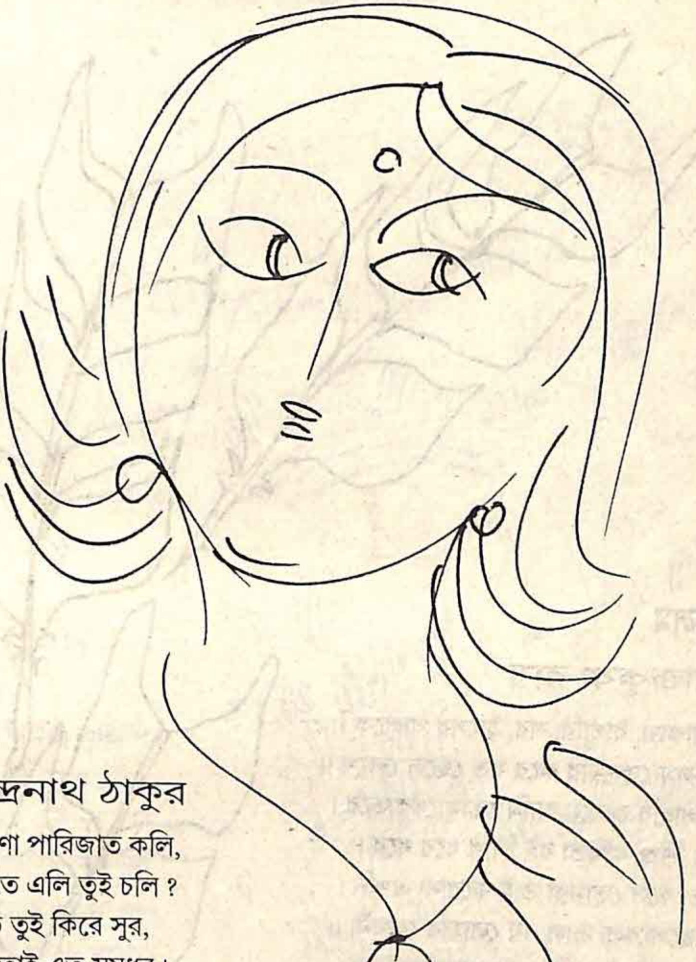
সাগর-পক্ষী

শিবনাথ শাস্ত্রী

অসীম সুনীলে যবে পঁহুছিল তরী
বাহিরিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি,
যেন কি জলের পাখী, বুকেতে ঠেকিয়া
জল-রাশি, ভাসি ভাসি বেড়ায় খেলিয়া।
যত যায়, চেয়ে দেখি তরী পিছে পিছে
জল-চারী গল্-পক্ষী সঙ্গেতে আসিছে।
ঘুরিতে তরীর ধারে এরা ভালবাসে,
কভু পাশে, কভু পিছে, কভু বা আকাশে,
কভু সে তরঙ্গোপরি বসিয়া ভাসিছে,
দোলায় তরঙ্গ তারে, দুলিয়া আসিছে।
ক্রমে দিন গত ; তরী প্রবেশে গভীরে।

ওই পড়ি রহে বঙ্গ ; মিলাইছে নীরে ;
আর গল নাহি আসে, ফিরে ডাঙ্গা পানে
এদিকে অপূর্ব শোভা মোহিছে পরাণে !
ডুবিছে রবির ছবি নীল-জল-পারে ;
অসীমে অসীম মিশি গ্রাসিছে আঁধারে।

(অংশ বিশেষ)



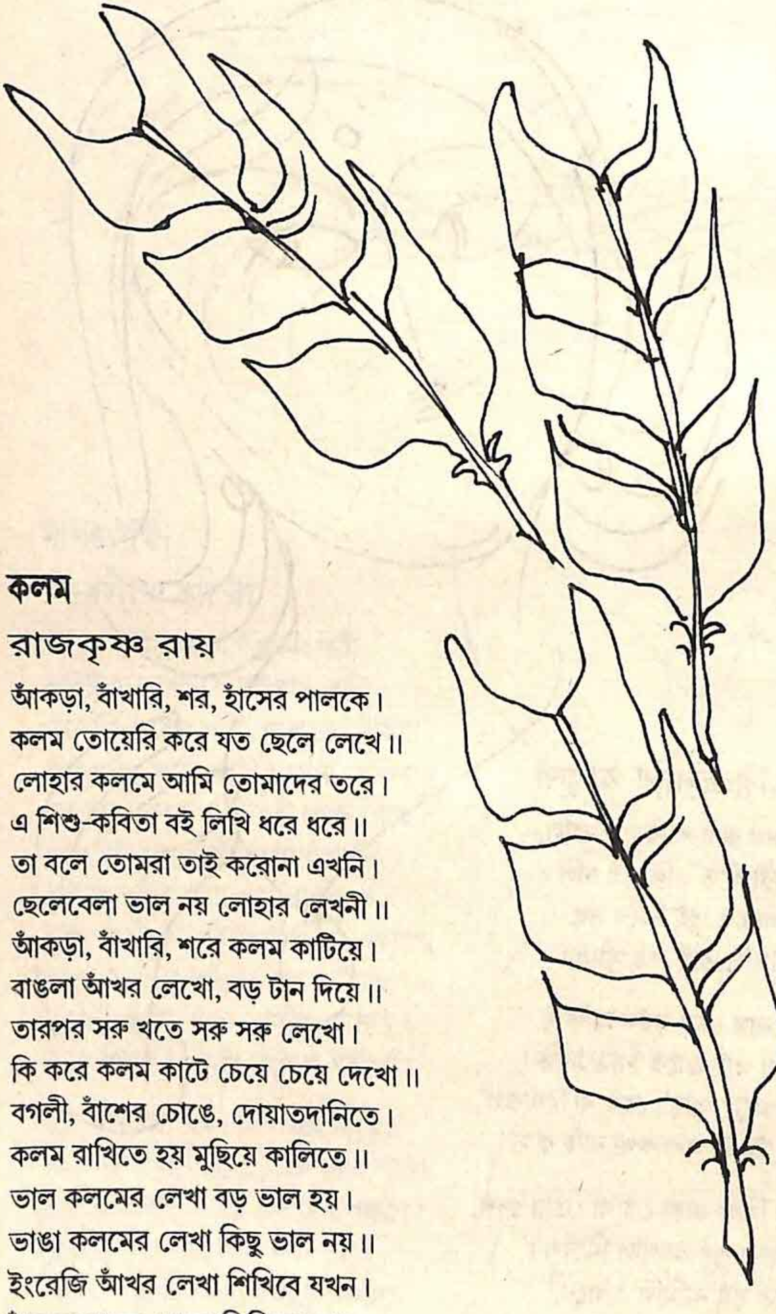
খুকুরাম

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুই কি চাঁদের কণা পারিজাত কলি,
কোন সুরপুরী হতে এলি তুই চলি ?
নারদের বীণাচ্যুত তুই কিরে সুর,
ভাসিয়া আসিলি তাই এত সুমধুর।

নাহি জানে নাম কেহ নূতন অতিথি
নব নব নামে তাই ডাকে নিতি নিতি।
কেহ বলে 'মন্টু', 'হাবু', কেহ বা 'খোক্কস',
তোর মুখে 'উ-উ' সদা কথা নাহি ক'স।

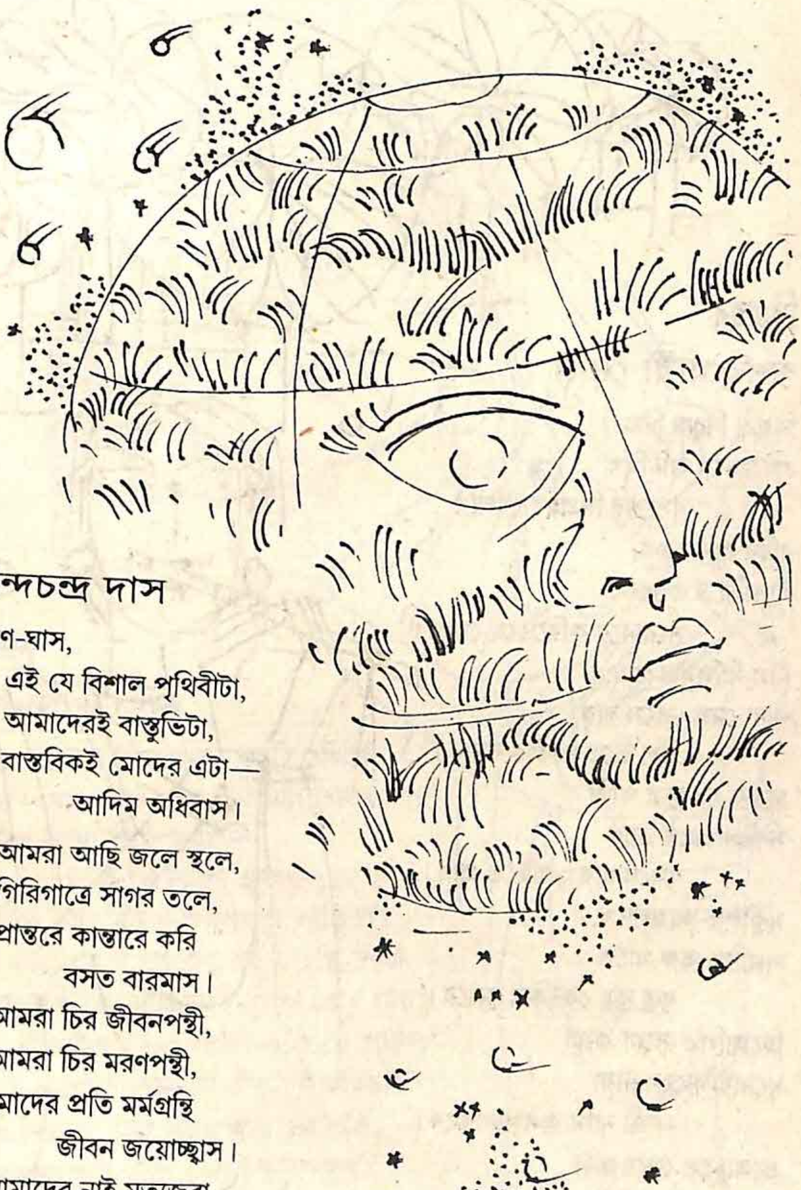
কিবা জাতি কিবা ভাষা কোথা তোর দেশ,
ইংগিতে করিস শুধু অংগুলি নির্দেশ।
সুরপুরী হতে তুই নামিলি এখানে,
আঙুল দেখাস বুঝি তাই ঊর্ধ্ব পানে।



কলম

রাজকৃষ্ণ রায়

আঁকড়া, বাঁখারি, শর, হাঁসের পালকে।
কলম তোয়েরি করে যত ছেলে লেখে ॥
লোহার কলমে আমি তোমাদের তরে।
এ শিশু-কবিতা বই লিখি ধরে ধরে ॥
তা বলে তোমরা তাই করোনা এখনি।
ছেলেবেলা ভাল নয় লোহার লেখনী ॥
আঁকড়া, বাঁখারি, শরে কলম কাটিয়ে।
বাঙলা আঁখর লেখো, বড় টান দিয়ে ॥
তারপর সরু খতে সরু সরু লেখো।
কি করে কলম কাটে চেয়ে চেয়ে দেখো ॥
বগলী, বাঁশের চোঙে, দোয়াতদানিতে।
কলম রাখিতে হয় মুছিয়ে কালিতে ॥
ভাল কলমের লেখা বড় ভাল হয়।
ভাঙা কলমের লেখা কিছু ভাল নয় ॥
ইংরেজি আঁখর লেখা শিখিবে যখন।
হাঁসের পালক পেলে লিখিবে তখন ॥

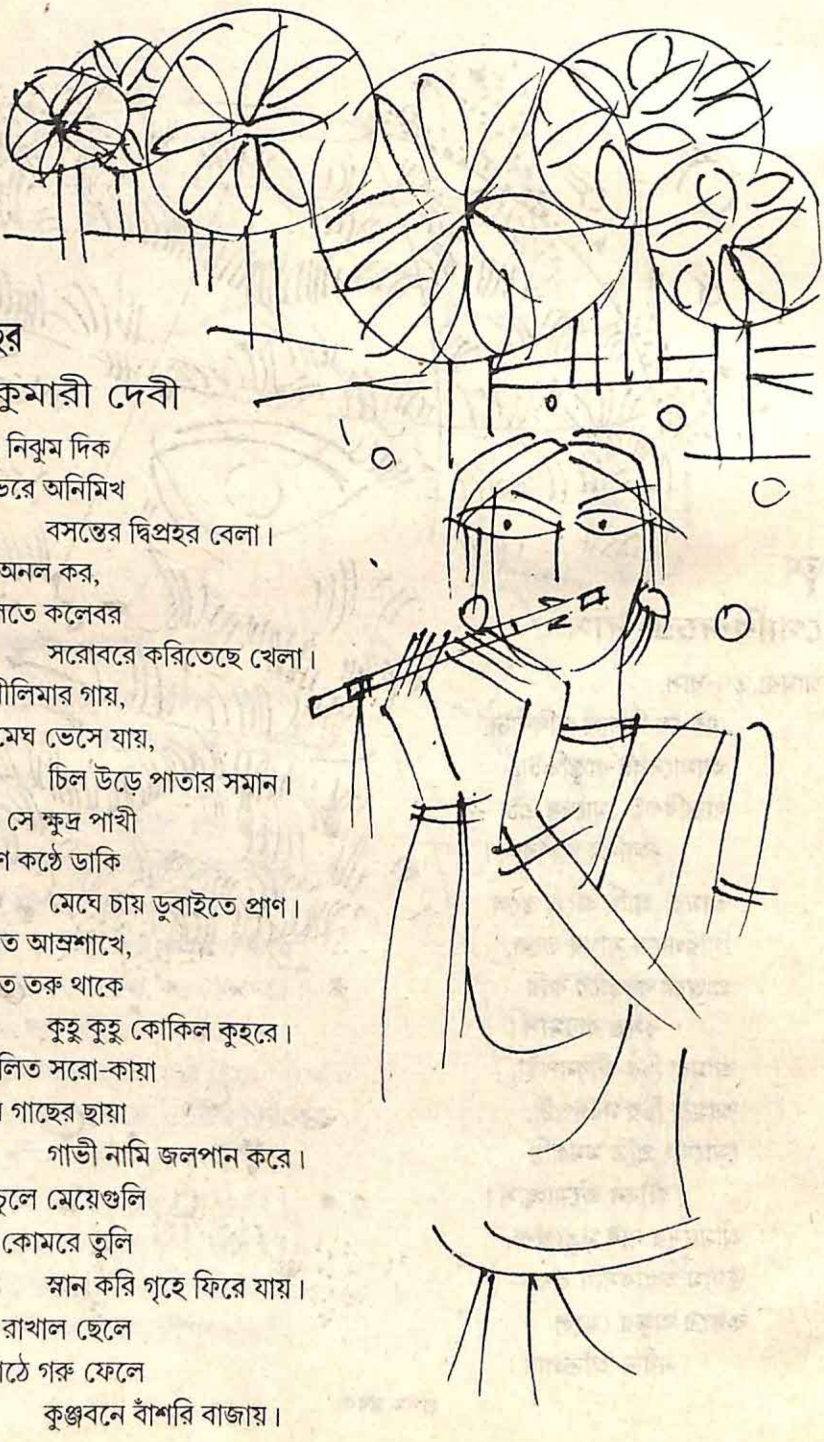


তৃণ

গোবিন্দচন্দ্র দাস

আমরা তৃণ-ঘাস,
এই যে বিশাল পৃথিবীটা,
আমাদেরই বাস্তুভিটা,
বাস্তবিকই মোদের এটা—
আদিম অধিবাস।

আমরা আছি জলে স্থলে,
গিরিগাত্রে সাগর তলে,
প্রান্তরে কান্তারে করি
বসত বারমাস।
আমরা চির জীবনপন্থী,
আমরা চির মরণপন্থী,
মোদের প্রতি মর্মগ্রন্থি
জীবন জয়োচ্ছ্বাস।
আমাদের নাই মৃত্যুজরা,
উদ্যম অধ্যবসায় ভরা
কঙ্করে অঙ্কুর মেলে
নবীন অভিলাষ!



দ্বিপ্রহর

স্বর্ণকুমারী দেবী

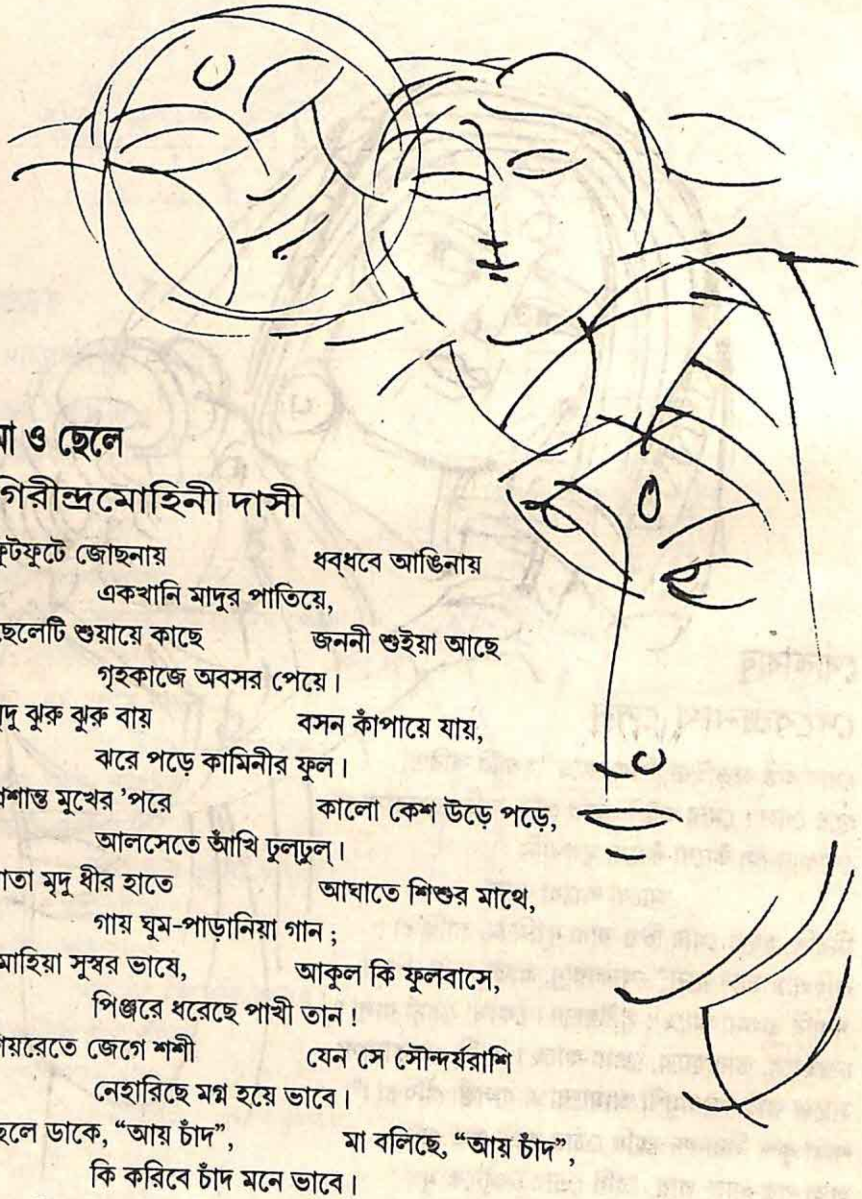
নিস্তব্ধ নিঝুম দিক
শ্রান্তিভরে অনিমিখ
        বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা।
রবির অনল কর,
শীতলিতে কলেবর
        সরোবরে করিতেছে খেলা।
নীল নীলিমার গায়,
শাদা মেঘ ভেসে যায়,
        চিল উড়ে পাতার সমান।
চাতক সে ক্ষুদ্র পাখী
সকরুণ কণ্ঠে ডাকি
        মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।
মুকুলিত আম্রশাখে,
পল্লবিত তরু থাকে
        কুহু কুহু কোকিল কুহরে।
হিল্লোলিত সরো-কায়া
ঘুমোয় গাছের ছায়া
        গাভী নামি জলপান করে।
এলোচুলে মেয়েগুলি
কলস কোমরে তুলি
        স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে
দূরে মাঠে গরু ফেলে
        কুঞ্জবনে বাঁশরি বাজায়।



খোকাবাবু

দেবেন্দ্রনাথ সেন

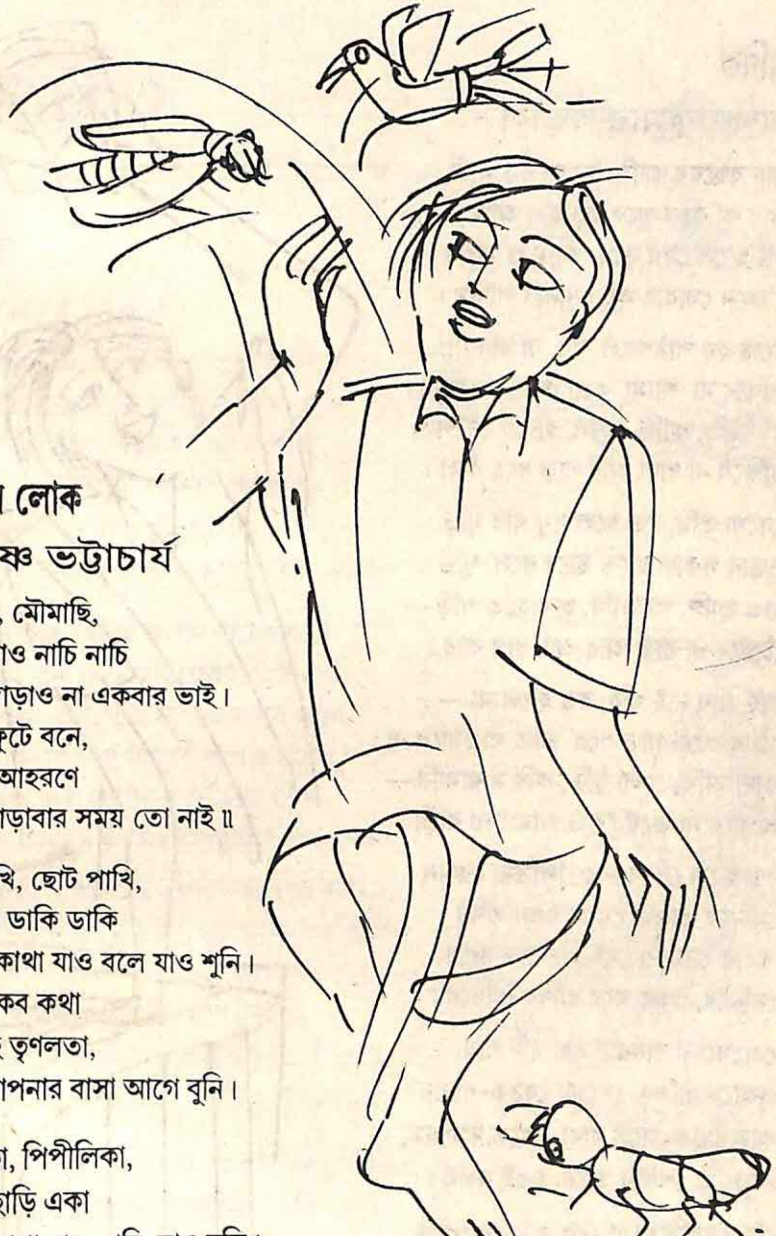
মোর কণ্ঠ জড়াইয়া, শিশু কহে "সবারি কবিতা
হয়ে গেল ! মোর কই ? মোর প্রতি নাহি ভালবাসা ?"
খোকার সে কাঁদো কাঁদো মুখখানি
আধো আধো ভাষা
নিরখি, হইল মোর চিত্ত-রাধা দুঃখিতা, লাঞ্ছিতা !
কহিলাম মনে মনে "খোকাবাবু, ভ্রাতা, ভগ্নি, পিতা
সবারি তুলনা আছে ! সৃষ্টিছাড়া ! কোথা তোর বাসা ?
চন্দ্রহারে, তারাহারে, তোর কাছে !-এ কি রে তামাসা !
লাজে তাই অধোমুখী আমারো এ বাসন্তী কবিতা।"
শাদা কুন্দ নিরানন্দ হেরি তোর অতি শুভ্র হাসি ;
লাল পদ্ম লাজ পায়, হেরি তোর টুকটুকে মুখ !
কেমনে কবিতা লিখি ? যাদু ! তুই আনন্দের রাশি !
তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহে ভরি গেল বুক !
অপূর্ব বাৎসল্য-ভাবে চিতে জাগে !—বুঝি এত কালে,
পথে আমি, নীলকান্ত-মণি-ধনে, ননীচোরা লালে।



মা ও ছেলে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ফুটফুটে জোছনায় ধব্‌ধবে আঙিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল।
প্রশান্ত মুখের 'পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
আলসেতে আঁখি ঢুলঢুল্।
মাতা মৃদু ধীর হাতে আঘাতে শিশুর মাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান ;
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী তান!
শিয়রেতে জেগে শশী যেন সে সৌন্দর্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে, "আয় চাঁদ", মা বলিছে, "আয় চাঁদ",
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে।
মা নাহি ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত-কিছু সব তার মিছে।
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামেশি—
স্বর্গে মর্ত্যে প্রভেদ কি আছে!



কাজের লোক

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মৌমাছি, মৌমাছি,
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ঐ ফুল ফুটে বনে,
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই॥

ছোট পাখি, ছোট পাখি,
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি।
এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা,
আপনার বাসা আগে বুনি।

পিপীলিকা, পিপীলিকা,
দল-বল ছাড়ি একা
কোথা যাও, শুনি, যাও বলি।
শীতের সঞ্চয় চাই,
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায় পিলপিল চলি॥

মাণিক

অক্ষয়কুমার বড়াল

পাঁচ বছরের আমি, হ্যাঁ গা বড় মামী,
আর ক' বছর পরে বড় হ'ব আমি ?
বড় হ'লে দেখ তুমি, আমি ও মহিম
দু'জনে ঘোরাব সুধু সোনার লাটিম।

ইচ্ছে হয় পাঠশালে যাব, বা যাব না,
করিবে না 'শ্যামা' আর পিছনে তাড়না।
বই ছিঁড়ি, কালি ফেলি, হারাই পেন্সিল,
মারিবে না দাদা আর ঘাড় ধরে কীল।

দেখো তুমি, বড় হলে সুধু খাব মুড়ি,
ওড়াব সকাল হ'তে ছাদে বসে' ঘুড়ি।
হাত ভাঙ্গি, পা ভাঙ্গি, ছাদ হতে পড়ি—
চেঁচাবে না বাবা আর অত রাগ করি।

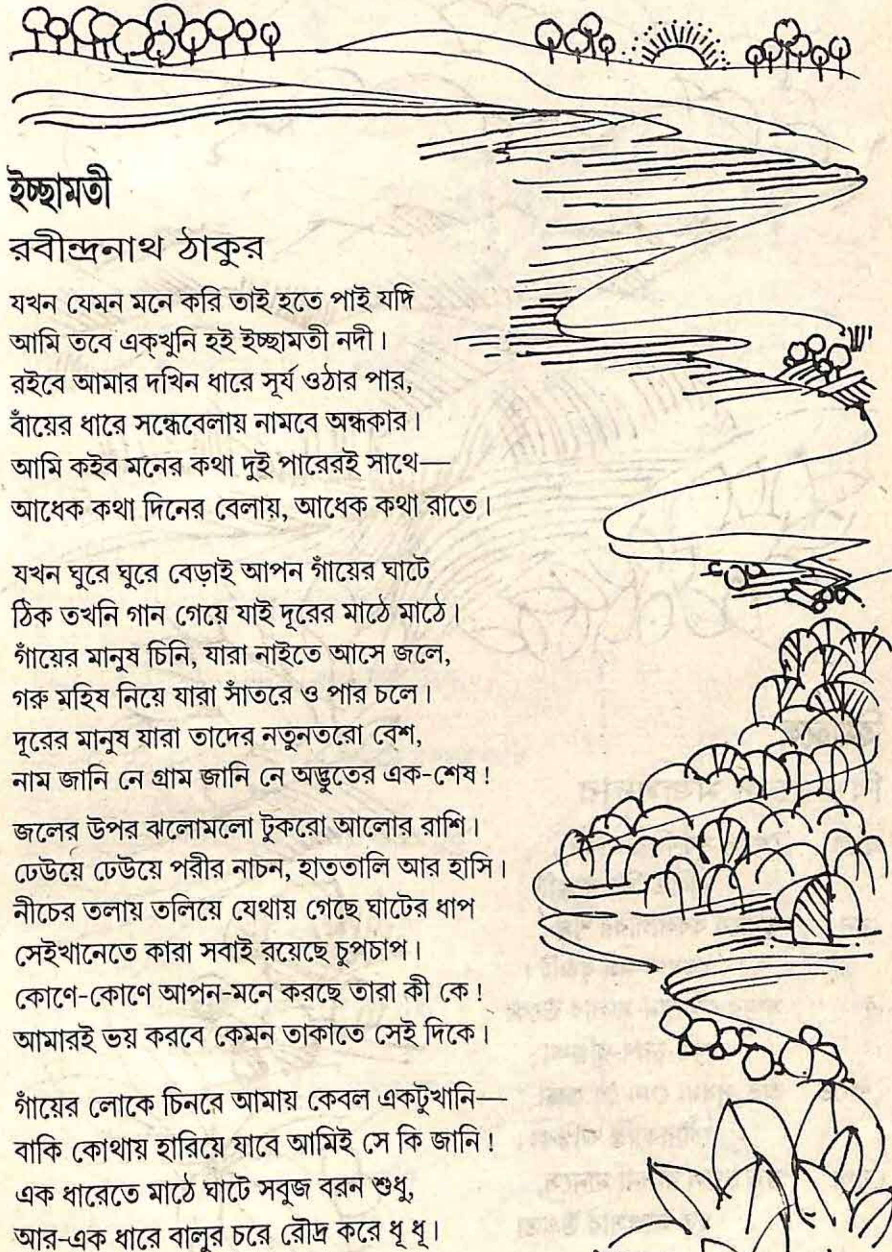
খাই আর নাই খাই, বড় হ'লে মা—
জোর করে' ঘাড় ধরে' ভাত খাওয়াবে না।
কাদা মাখি, ঢেলা ছুঁড়ি, করি মারামারি—
লাগাবে না ভয়ে কেউ আমাদের বাড়ী।

বড় হ'লে দেখে নিও, পিসিমা কেমন
মেনিরে তাড়ায় রেগে যখন তখন।
বাবার সোনার সেই বড় চেন দিয়ে,
মেনিরে ঠাকুর-ঘরে রাখিব বাঁধিয়ে।

বোসেদের বানরটা ধরা যদি যায়—
লুকায়ে রাখিব, দেখো, বৈঠক-খানায়।
কাছারীতে গেলে বাবা, বেতে দমাদ্দম,
লাফাতে শেখাব তারে কতই রকম।

রোজ আমি যাত্রা দেব, হনুমান বেড়ে
লাফাবে, খিচোবে, যাবে ছেলেদের তেড়ে।
রোজ তুমি যাবে, নেবে যা ইচ্ছে মামী !
তোমার ও কাকাতুটা, নিয়ে যাব আমি ?





ইচ্ছামতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্‌খুনি হই ইচ্ছামতী নদী।
রইবে আমার দখিন ধারে সূর্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধেবেলায় নামবে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা দুই পারেরই সাথে—
আধেক কথা দিনের বেলায়, আধেক কথা রাতে।

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই আপন গাঁয়ের ঘাটে
ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই দূরের মাঠে মাঠে।
গাঁয়ের মানুষ চিনি, যারা নাইতে আসে জলে,
গরু মহিষ নিয়ে যারা সাঁতরে ও পার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের নতুনতরো বেশ,
নাম জানি নে গ্রাম জানি নে অদ্ভুতের এক-শেষ!

জলের উপর ঝলোমলো টুকরো আলোর রাশি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন, হাততালি আর হাসি।
নীচের তলায় তলিয়ে যেথায় গেছে ঘাটের ধাপ
সেইখানেতে কারা সবাই রয়েছে চুপচাপ।
কোণে-কোণে আপন-মনে করছে তারা কী কে!
আমারই ভয় করবে কেমন তাকাতে সেই দিকে।

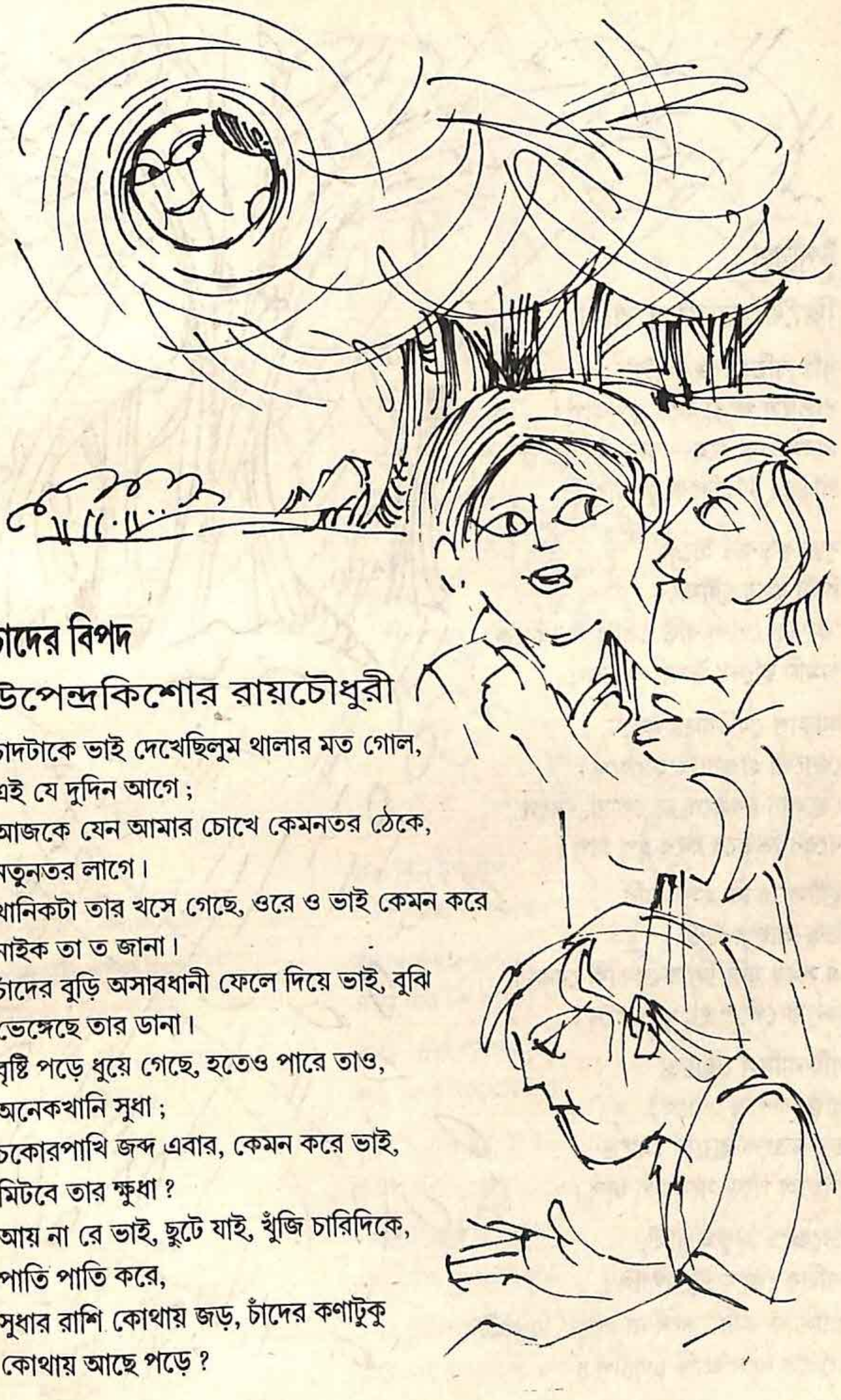
গাঁয়ের লোকে চিনবে আমায় কেবল একটুখানি—
বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে আমিই সে কি জানি!
এক ধারেতে মাঠে ঘাটে সবুজ বরন শুধু,
আর-এক ধারে বালুর চরে রৌদ্র করে ধূ ধূ।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা, রাত্তিরে থম্‌ থম্‌!
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে করবে গা ছম্‌ ছম্‌।



হিমাচলে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

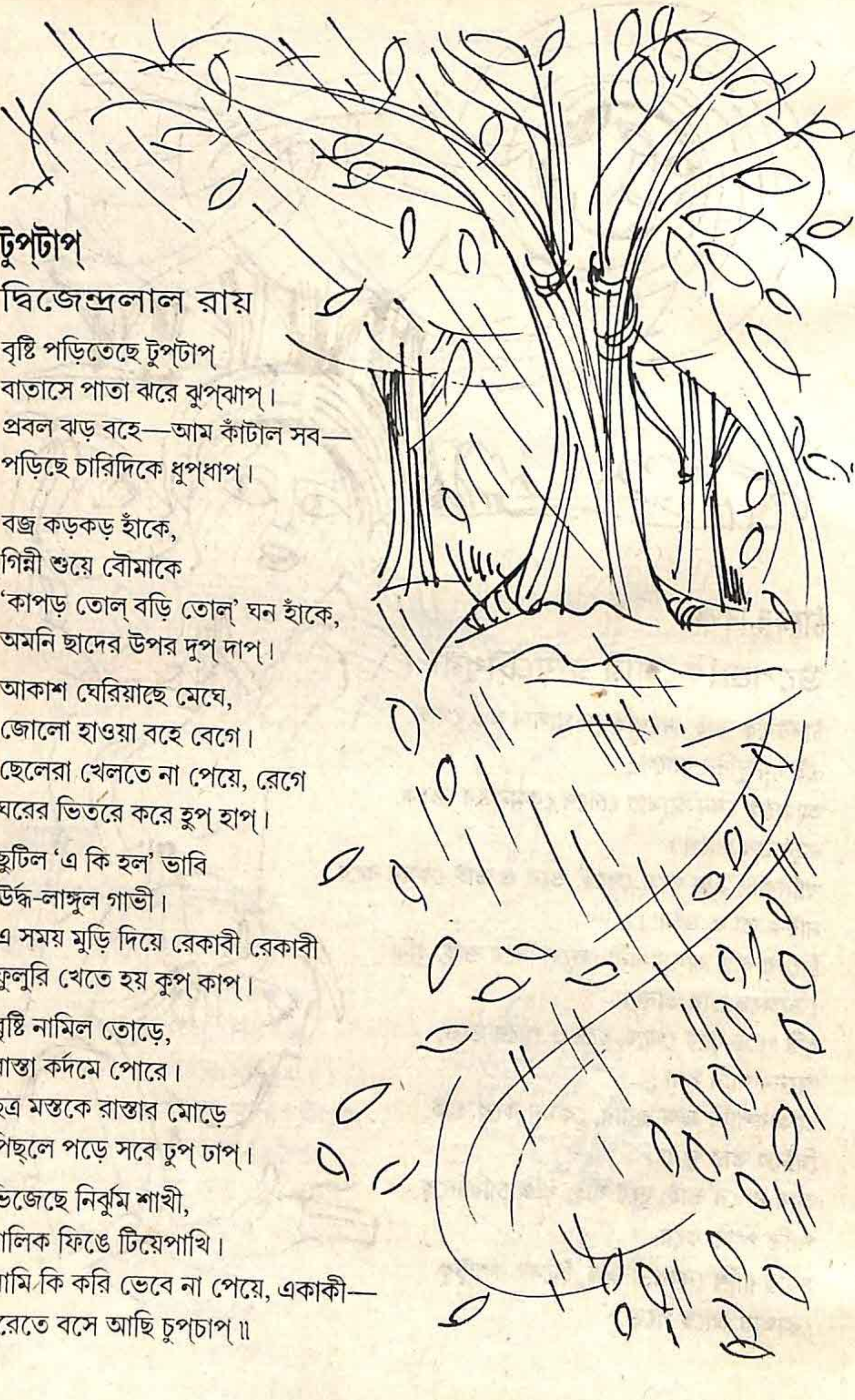
জ্বলে শৈলে সূর্য-কিরণ-বিম্ব
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি ;
যেন তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ
ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জটি।
ঐ সানুর সোপান-মালার ঊর্ধ্বে
শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা ;
শোভে অভ্র-সুষমা যেন রে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা।
সেথা স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে,
হত লালসার উগ্রতা
রাজে মৌন-মুক্ত শঙ্কর-পরে
তাপসীর চারু শুভ্রতা।



চাঁদের বিপদ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

চাঁদটাকে ভাই দেখেছিলুম থালার মত গোল,
এই যে দুদিন আগে ;
আজকে যেন আমার চোখে কেমনতর ঠেকে,
নতুনতর লাগে।
খানিকটা তার খসে গেছে, ওরে ও ভাই কেমন করে
নাইক তা ত জানা।
চাঁদের বুড়ি অসাবধানী ফেলে দিয়ে ভাই, বুঝি
ভেঙ্গেছে তার ডানা।
বৃষ্টি পড়ে ধুয়ে গেছে, হতেও পারে তাও,
অনেকখানি সুধা ;
চকোরপাখি জব্দ এবার, কেমন করে ভাই,
মিটবে তার ক্ষুধা ?
আয় না রে ভাই, ছুটে যাই, খুঁজি চারিদিকে,
পাতি পাতি করে,
সুধার রাশি কোথায় জড়, চাঁদের কণাটুকু
কোথায় আছে পড়ে ?



টুপ্‌টাপ্‌

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ্‌
বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপ্‌ঝাপ্‌।
প্রবল ঝড় বহে—আম কাঁটাল সব—
পড়িছে চারিদিকে ধুপ্‌ধাপ্‌।

বজ্র কড়কড় হাঁকে,
গিন্নী শুয়ে বৌমাকে
'কাপড় তোল্‌ বড়ি তোল্‌' ঘন হাঁকে,
অমনি ছাদের উপর দুপ্‌ দাপ্‌।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জোলো হাওয়া বহে বেগে।
ছেলেরা খেলতে না পেয়ে, রেগে
ঘরের ভিতরে করে হুপ্‌ হাপ্‌।

ছুটিল 'এ কি হল' ভাবি
ঊর্দ্ধ-লাঙ্গুল গাভী।
এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
ফুলুরি খেতে হয় কুপ্‌ কাপ্‌।

বৃষ্টি নামিল তোড়ে,
রাস্তা কর্দমে পোরে।
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছ্‌লে পড়ে সবে ঢুপ্‌ ঢাপ্‌।

ভিজেছে নির্ঝুম শাখী,
শালিক ফিঙে টিয়েপাখি।
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে, একাকী—
ঘরেতে বসে আছি চুপ্‌চাপ্‌॥



বর্ষারানী

মানকুমারী বসু

রাত দিন ঝম্ ঝম্
কি সাজে সেজেছ রানী!

আননে বিজলীহাসি,
আঁচলে কেতকী-ছটা,

শিখী নাচে, ভেকে গায়
বসুধা আনন্দভরে

ডুবেছে রবির ছবি—
আকাশ গলিয়া পড়ে

উথলিছে গঙ্গা, পদ্মা,
মরণে রয়েছে ছেয়ে

রাত দিন ঝম্ ঝম্
দেখেছি অনেকতর

রাত দিন টুপ্ টুপ্
এ কি সাজ অপরূপ!

গলায় কদম-হার,
এ আবার কি বাহার!

মেঘে গুরু গরজন,
কত করে আয়োজন!

ডুবেছে চাঁদিমা-তারা,
তরল রজত-ধারা!

পরানে ধরে না সুখ,
তোমারি স্নেহের মুখ,

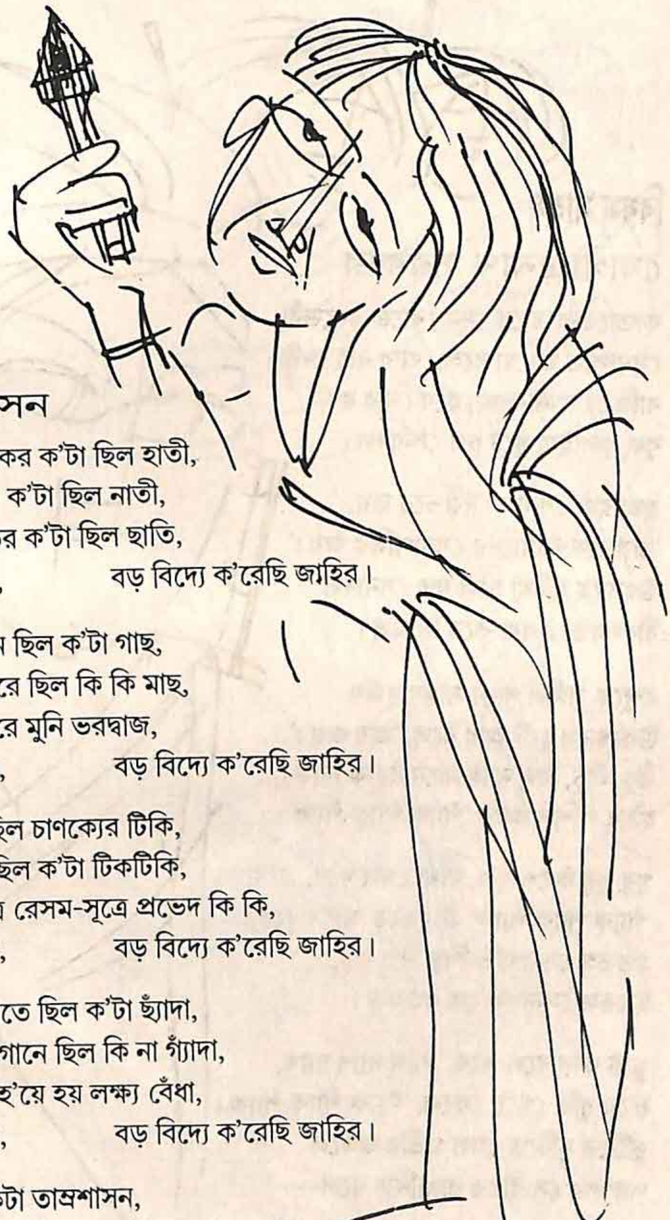
রাত দিন টুপ্ টুপ্,
দেখি নি তো এত রূপ!



কত ভালবাসি

কামিনী রায়

জড়ায়ে মায়ের গলা শিশু কহে আসি
'মা, তোমায় কত ভালবাসি !'
'কত ভালবাস ধন ?' জননী শুধায়।
'এ—ত' বলি দুই হাত প্রসারি দেখায়।
'তুমি মা আমারে ভালবাস কতখানি ?'
মা বলেন, 'মাপ তার আমি নাহি জানি !'
'তবু কতখানি বল !'
                    'যতখানি ধরে
তোমার মায়ের বুকে'।
                    'নহে তারপরে ?'
'তার বড়ো ভালবাসা পারি না বাসিতে।'
'আমি পারি' বলে শিশু হাসিতে হাসিতে।'



পুরাতত্ত্ববিৎ

রজনীকান্ত সেন

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

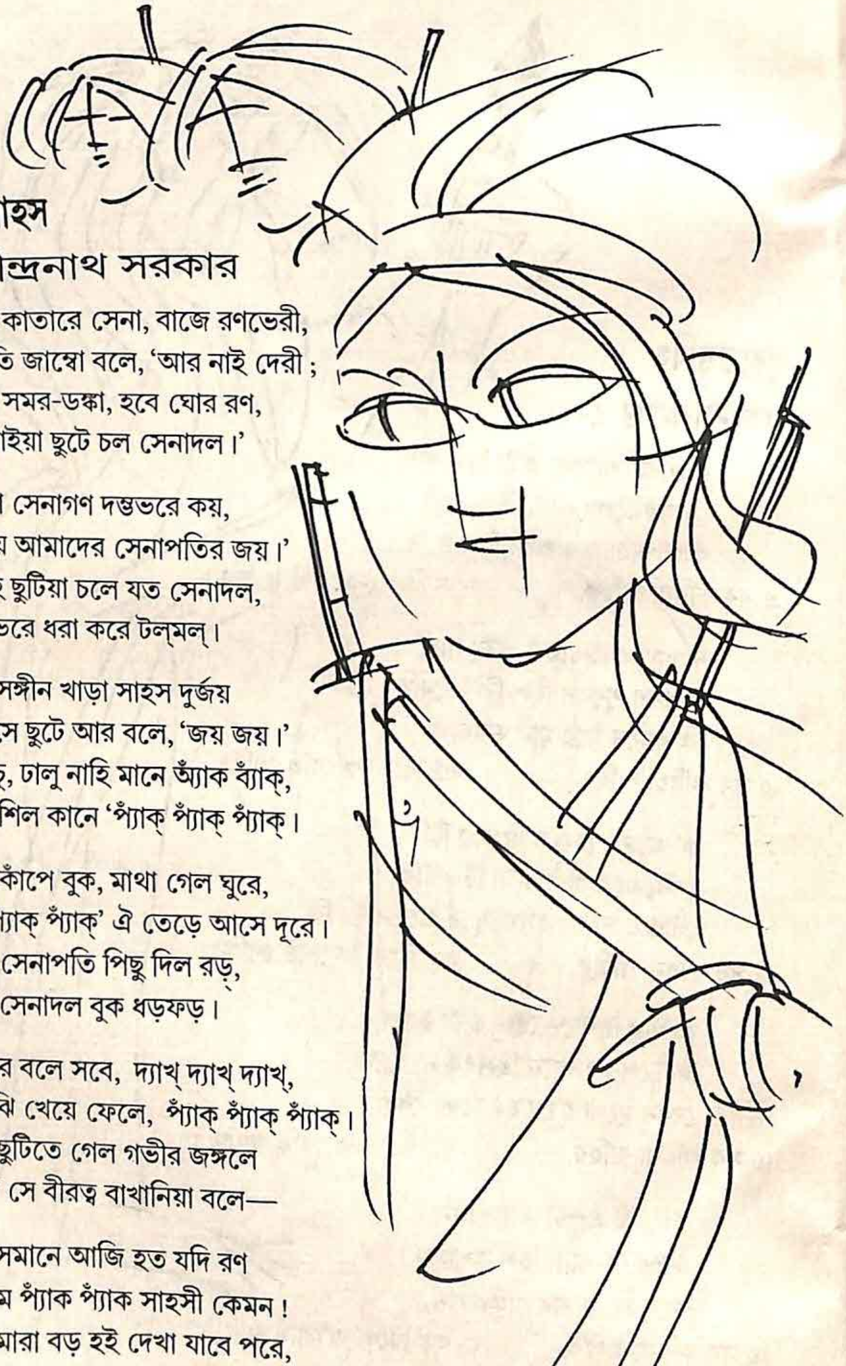
দণ্ডক কাননে ছিল ক'টা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল ক'টা টিকটিকি,
গৌতম-সূত্রে রেসম-সূত্রে প্রভেদ কি কি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

কৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল ক'টা ছ্যাদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গ্যাঁদা,
কোন্ মুখো হ'য়ে হয় লক্ষ্য বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

পেয়েছি একটা তাম্রশাসন,
ক্রতুর ক' খানা ছিল কুশাসন,
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

(সংক্ষেপিত)



বিষম সাহস

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

কাতারে কাতারে সেনা, বাজে রণভেরী,
সেনাপতি জাম্বো বলে, 'আর নাই দেরী ;
বাজিছে সমর-ডঙ্কা, হবে ঘোর রণ,
বুক ফুলাইয়া ছুটে চল সেনাদল।'

হুঙ্কারিয়া সেনাগণ দম্ভভরে কয়,
'জয় জয় আমাদের সেনাপতির জয়।'
উৎসাহে ছুটিয়া চলে যত সেনাদল,
বীরপদভরে ধরা করে টল্‌মল্‌।

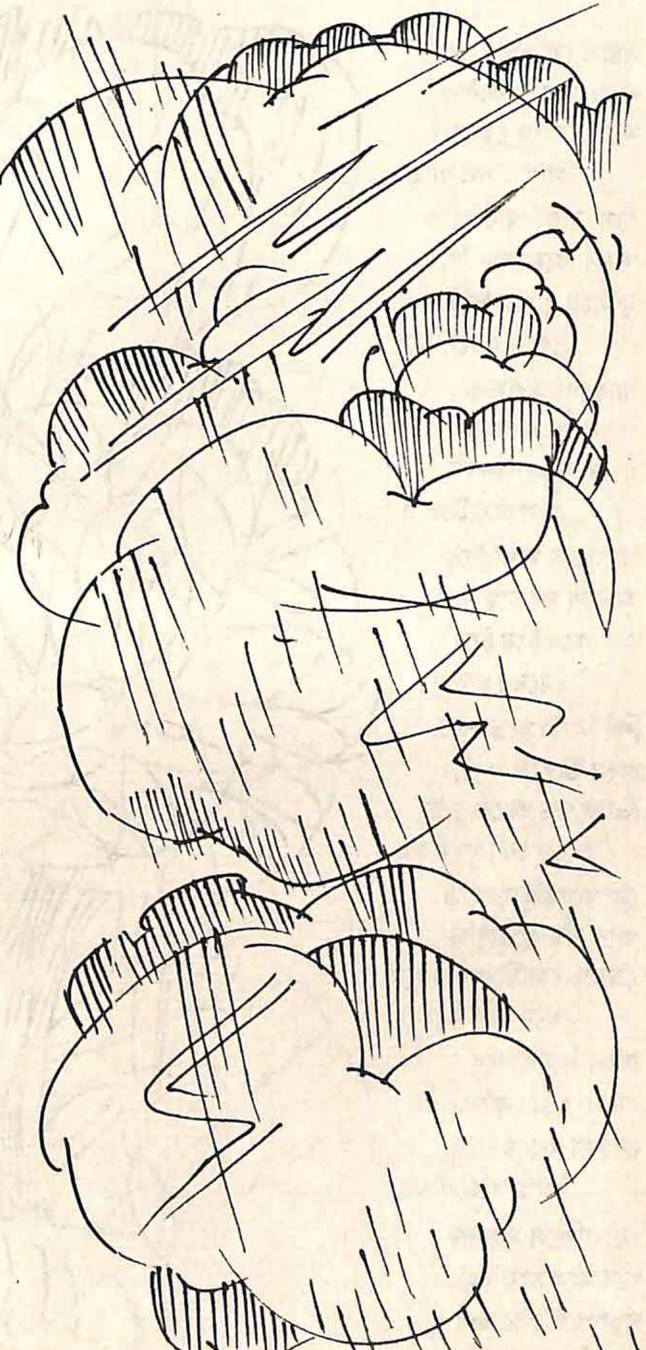
বন্দুকে সঙ্গীন খাড়া সাহস দুর্জয়
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আর বলে, 'জয় জয়।'
উঁচু, নীচু, ঢালু নাহি মানে অ্যাঁক ব্যাঁক্,
হঠাৎ পশিল কানে 'প্যাঁক্ প্যাঁক্ প্যাঁক্।

গুরু গুরু কাঁপে বুক, মাথা গেল ঘুরে,
'প্যাঁক্ প্যাঁক্ প্যাঁক্' ঐ তেড়ে আসে দূরে।
হতভম্ব সেনাপতি পিছু দিল রড়,
ছত্রভঙ্গ সেনাদল বুক ধড়ফড়।

ছুটে আর বলে সবে, দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্,
ধ'রে বুঝি খেয়ে ফেলে, প্যাঁক্ প্যাঁক্ প্যাঁক্।
ছুটিতে ছুটিতে গেল গভীর জঙ্গলে
পরস্পর সে বীরত্ব বাখানিয়া বলে—

'সমানে সমানে আজি হত যদি রণ
দেখাতাম প্যাঁক প্যাঁক সাহসী কেমন !
আগে মোরা বড় হই দেখা যাবে পরে,
কাপুরুষ প্যাঁক্ প্যাঁক্ কত বল ধরে।'

আষাঢ়ে ছড়া
প্রমথ চৌধুরী



এ বুঝি আষাঢ় মাস
তাই ছুটে চারিপাশ
শুধু করে হাঁসফাঁস
পূবের বাতাস।

কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেটফুলো
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
জুড়িয়ে আকাশ॥

হাতির মতন ধড়
নাহি করে নড়চড়
নাক ডাকে ঘড়ঘড়
চারিদিক ছেয়ে।

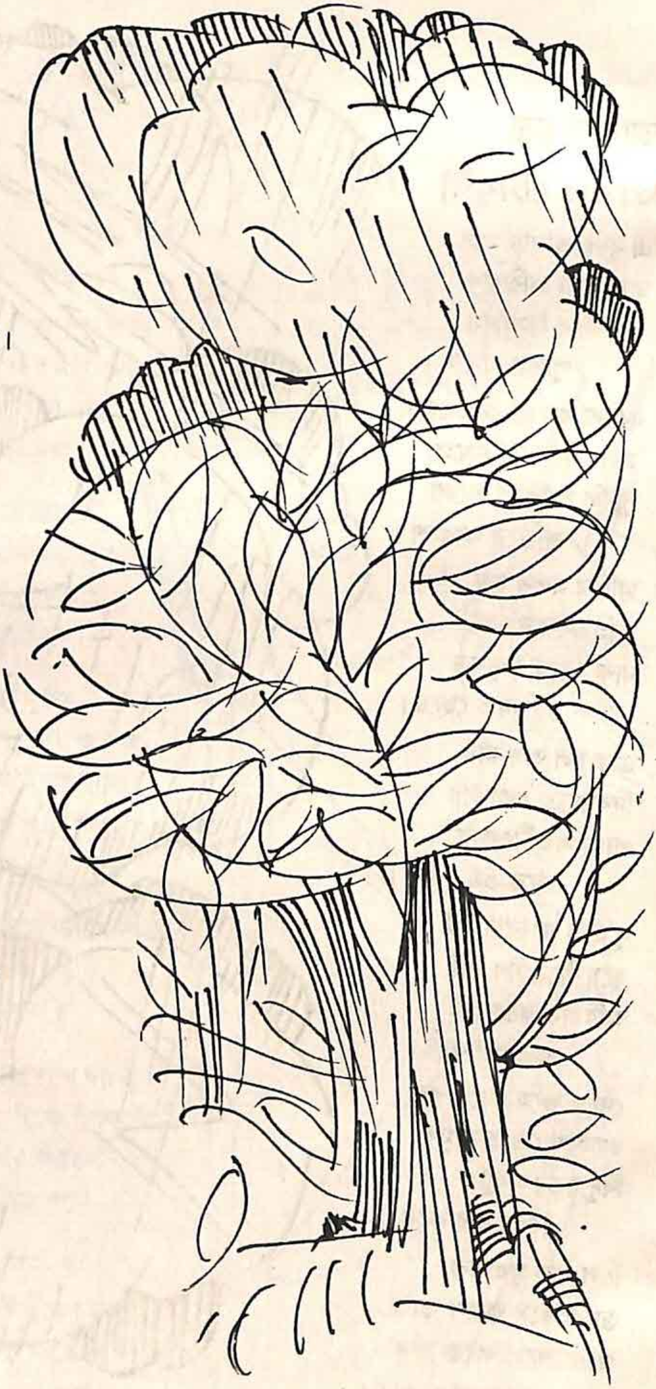
এত হল অন্ধকার
দিবারাত্রি একাকার
পাখী সব চীৎকার
করে ভয় খেয়ে॥

দু'হাত না চলে দৃষ্টি
ধুয়ে পুঁছে সব সৃষ্টি
অবিরাম ঝরে বৃষ্টি
ঝর ঝর ঝরে।

দেখে ভয়ে কাঁপে বুক,
আকাশ ভেংচায় মুখ,
বিদ্যুতের সবটুক
জিভ বার করে॥

চিল খায় ঘুরপাক
ডালে বসে কাঁপে কাক,
আকাশেতে বাজে ঢাক
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।

সারস মেলিয়া পাখা
নাচে হয়ে আঁকাবাঁকা
ময়ূর ধরেছে কেকা
গায় কোলাব্যাঙ।
হাঁস, রাজা আর পাতি
খালে বিলে সার গাঁথি
ফুলিয়ে বুকের ছাতি
হেসে ভেসে চলে।
ব্যাঙদের মকমকি
বিদ্যুতের ঝকমকি
দেখে শুনে বকবকি
একপায়ে টলে ॥
গাছেদের মাথা ছুঁয়ে
আকাশ পড়েছে নুয়ে
জল ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
মেঘের চুলের।
শিউলি ভুঁয়েতে লুটে,
কদম উঠেছে ফুটে,
ভিজে গন্ধ আসে ছুটে
কেতকী ফুলের ॥
মেঘেদের হুড়োহুড়ি
শুনে যত বুড়োবুড়ি
জ্যেঠা, জ্যেঠি, খুড়ো-খুড়ি
ভয়ে মরে আজ।
কখন সড়াৎ করে,
অথবা হড়াৎ করে,
বেজায় কড়াৎ করে
শিরে পড়ে বাজ ॥
ছেলেপিলে মহানন্দ
ঘরে ঘরে হয়ে বন্ধ
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব
মহাতাল ঠুকে।



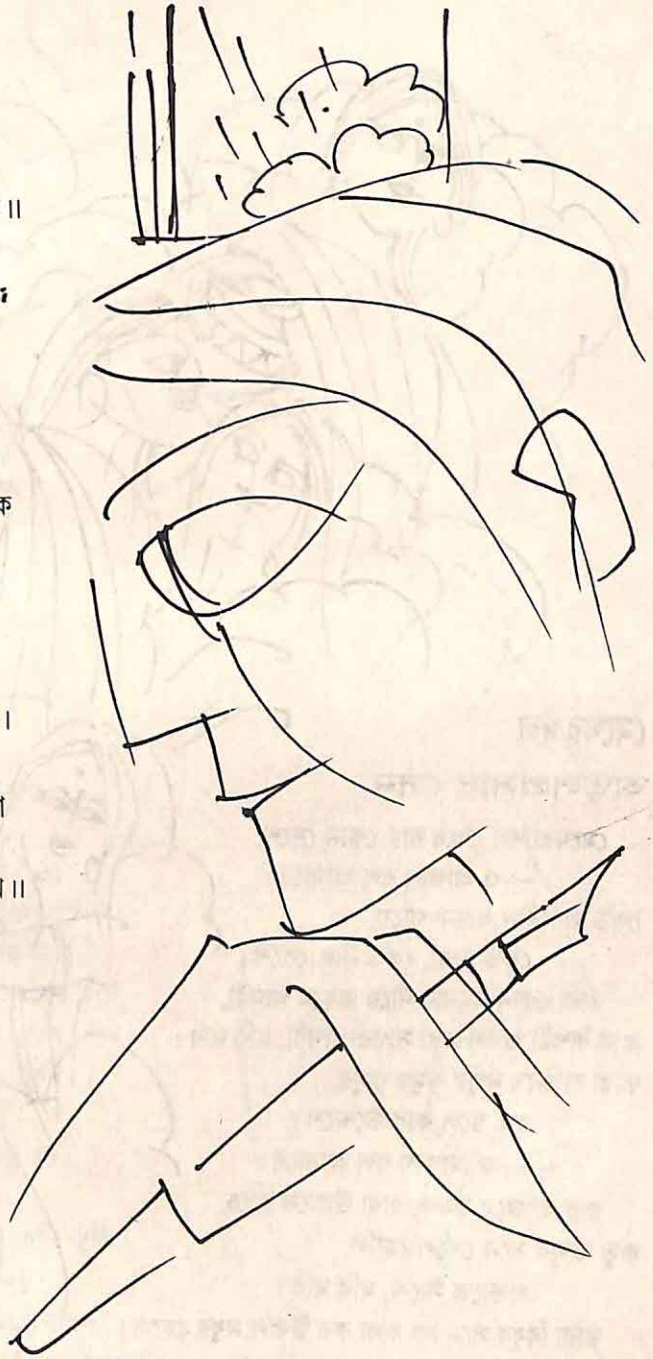
পা ছড়িয়ে নারীকূল
উনুনে শুকোয় চুল
দু' নয়ন বাষ্পাকুল
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে ॥

মাতিয়া বরষা রসে
ভাঙাগলা মেজে ঘষে
কোন যুবা ভাঁজে কসে,
সুরট মল্লার।

কেহ বা মনের ঝোঁকে
কবিতা লিখিছে রোখে
গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে
কুমুদ কহ্লার ॥

বলি শুন, ওহে বর্ষা
আবার যে হবে ফর্সা
এমন হয় না ভর্সা,
না হয় না হোক।

তোমার ঐ রঙ কালো
তোমার ঐ রাঙা আলো
তার বড় লাগে ভালো
যার আছে চোখ ॥



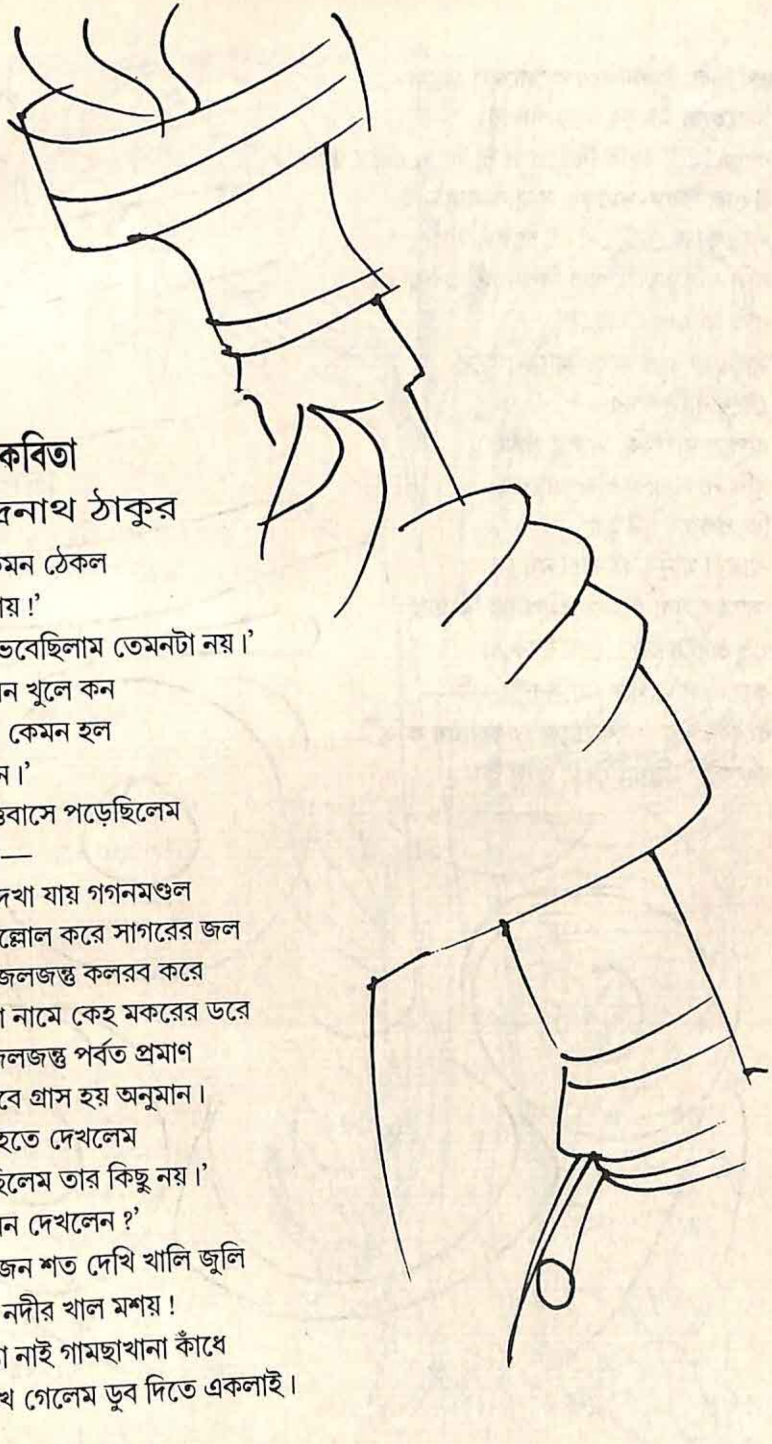


মেঘের দল

অতুলপ্রসাদ সেন

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,
—ও আকাশ বল্ আমারে।
কেউ বা রঙীন ওড়না গায়ে,
কেউ সাদা, কেউ নীল বেশে।
তারা কোন্ যমুনার নীরে ভরবে গাগরী,
কার বাঁশরী শুনল এরা সাগর-নাগরী, মরি মরি!
তারা বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর,
যায় চলে কার উদ্দেশে?
—ও আকাশ বল্ আমারে।
কভু বাজিয়ে ডমরু তারা উল্লাসে নাচে,
কভু ভানুর সনে খেলে হোলি,
প্রভাতে সাঁঝে, মরি মরি!
তারা বিধুর সনে কি কথা কয় উজল মধুর হেসে!
—ও আকাশ বল্ আমারে।

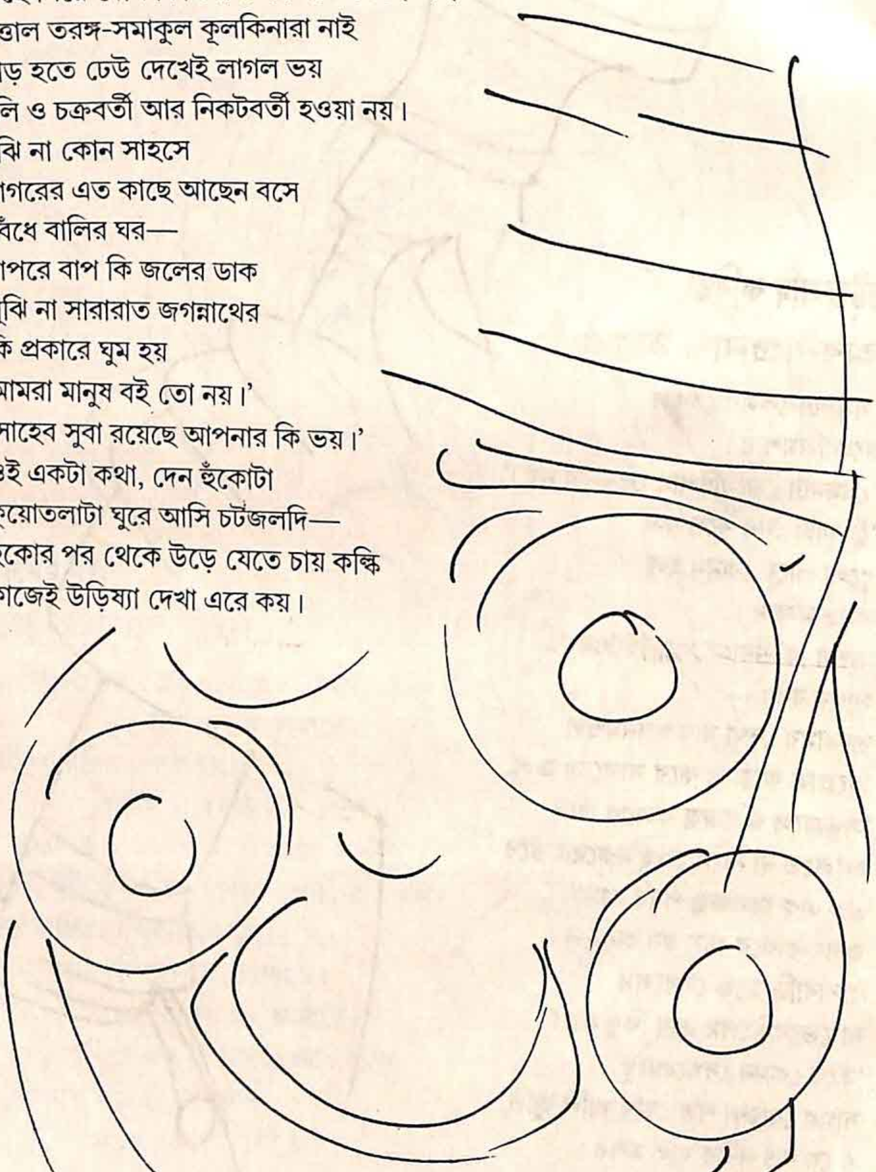
অংশবিশেষ

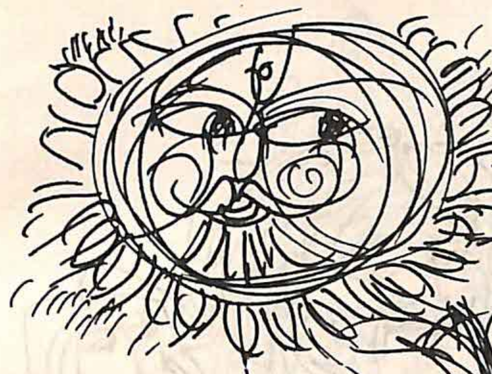


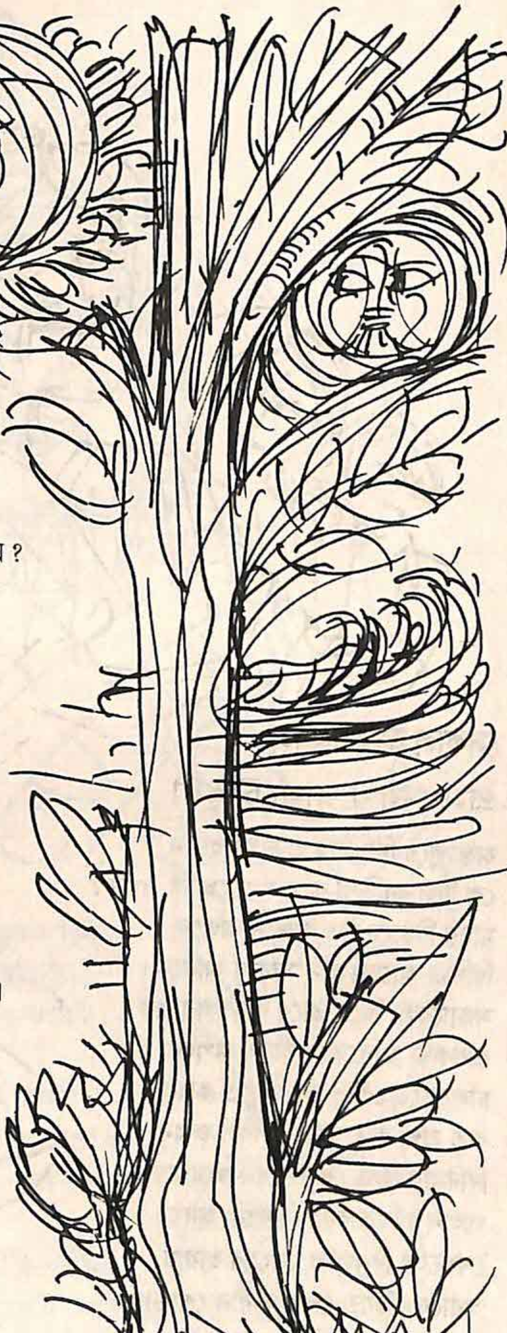
চট্‌জলদি কবিতা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'সমুদ্রটা কেমন ঠেকল
চক্কোত্তিমশায়!'
'যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটা নয়।'
'হুঁকোটা নেন খুলে কন
ধুলো পায়ে কেমন হল
সমুদ্র মজ্জন।'
'মশয় কিত্তিবাসে পড়েছিলেম
সাগর বর্ণন—
তমোময় দেখা যায় গগনমণ্ডল
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে
এক এক জলজন্তু পর্বত প্রমাণ
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান।
বাসাবাড়ি হতে দেখলেম
যা ভেবেছিলেম তার কিছু নয়।'
'তবে কেমন দেখলেন?'
সাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি
এ যে খড় নদীর খাল মশয়!
কোন চিন্তা নাই গামছাখানা কাঁধে
তেল মেখে গেলেম ডুব দিতে একলাই।

দর্প ছিল কেশনগরে কলেজের ছেলে
অবহেলে সাঁৎরে খড়ে পারাই
কাছে গিয়ে দেখি কিত্তিবাস যা লিখে গেছে তাই
উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল কূলকিনারা নাই
পাড় হতে ঢেউ দেখেই লাগল ভয়
বলি ও চক্রবর্তী আর নিকটবর্তী হওয়া নয়।
বুঝি না কোন সাহসে
সাগরের এত কাছে আছেন বসে
বেঁধে বালির ঘর—
বাপরে বাপ কি জলের ডাক
বুঝি না সারারাত জগন্নাথের
কি প্রকারে ঘুম হয়
আমরা মানুষ বই তো নয়।'
'সাহেব সুবা রয়েছে আপনার কি ভয়।'
ওই একটা কথা, দেন হুঁকোটা
কুয়োতলাটা ঘুরে আসি চটজলদি—
হুঁকোর পর থেকে উড়ে যেতে চায় কল্কি
কাজেই উড়িষ্যা দেখা এরে কয়।







খেলা

প্রিয়ংবদা দেবী

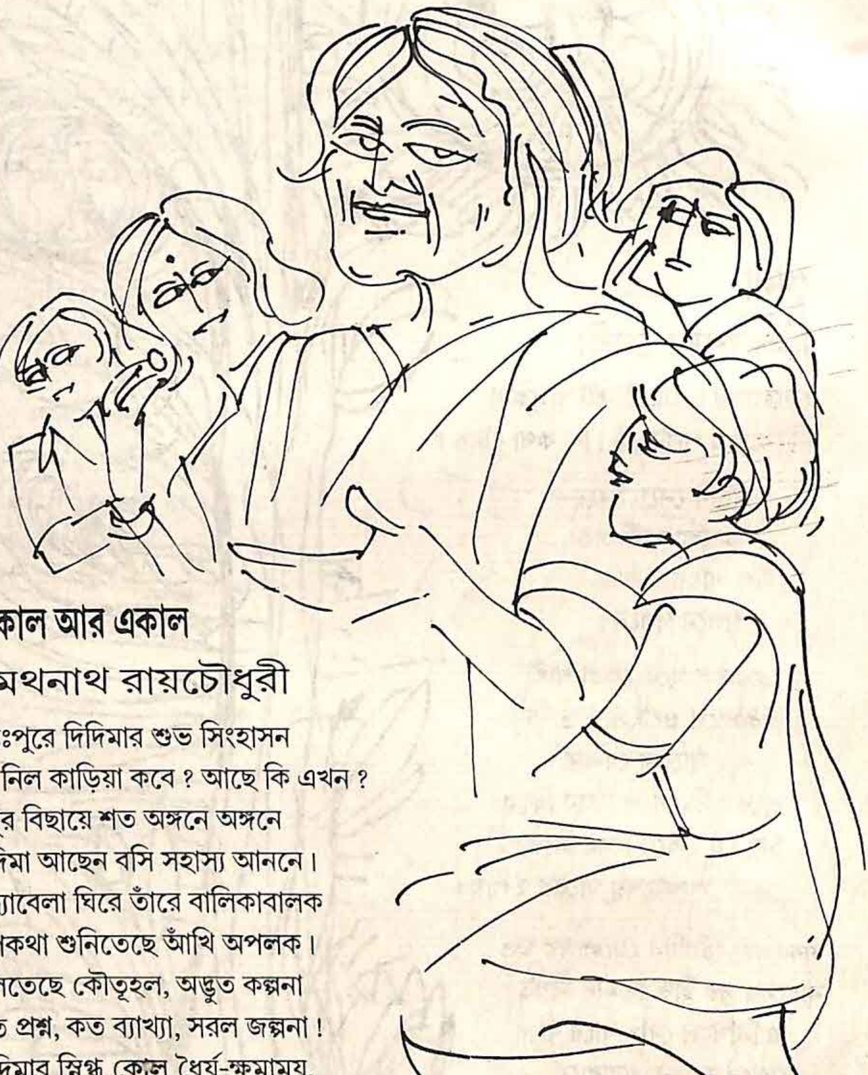
ছেলেদের ছুটোছুটি তট বালুকায়
হেসে খায় লুটোপুটি ; কি কথা রটায় ?

ছায়াছবি নেচে ফিরে
আলো সাথী সনে,
নীল পায়রার ঝাঁক
গগনে গগনে।

তারাদল ঘরে-ফেরা পাখী
একসাথে ওঠে সবে ডাকি'
সাঁঝের বেলায়।
লুকোচুরি খেলে ফিরে ফিরে
চাঁদ যে রবিরে ঘিরে ঘিরে,
আকাশের গাছের তলায়।

একখেলা চিরদিন ছেলেদের মত ;
নাচনের সুর ছাঁদ তেমনি নিয়ত।
এ নিখিলে দেখি বারে বারে
গগনে ভুবনে পারাবারে,
সকল মেলায়—
সেই সে পাতার বাঁশী বাজে,
তেমনি খেলনা সারি রাজে
নীল নভে সাগর বেলায়।

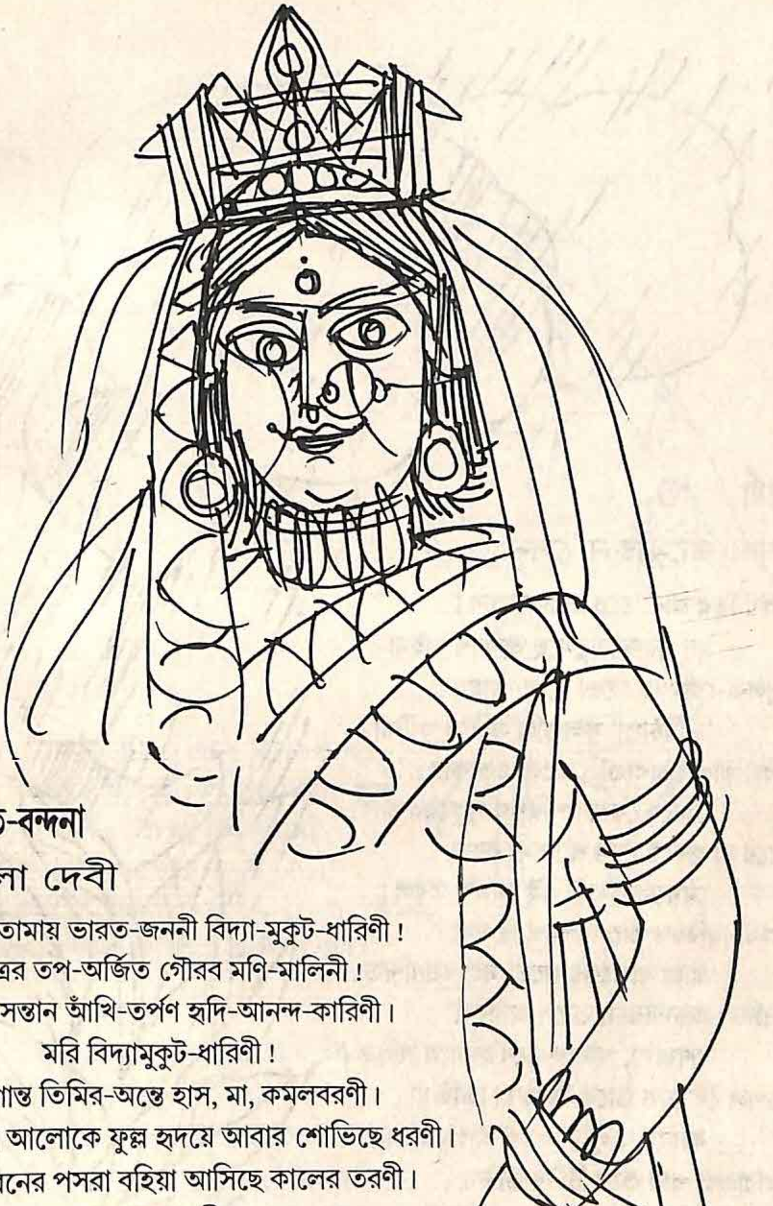
খোলা মাঠে বন ছায়ে তটিনীর তীরে
নাগর-দোলায় কে যে দোলে ফিরে ফিরে।



সেকাল আর একাল

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

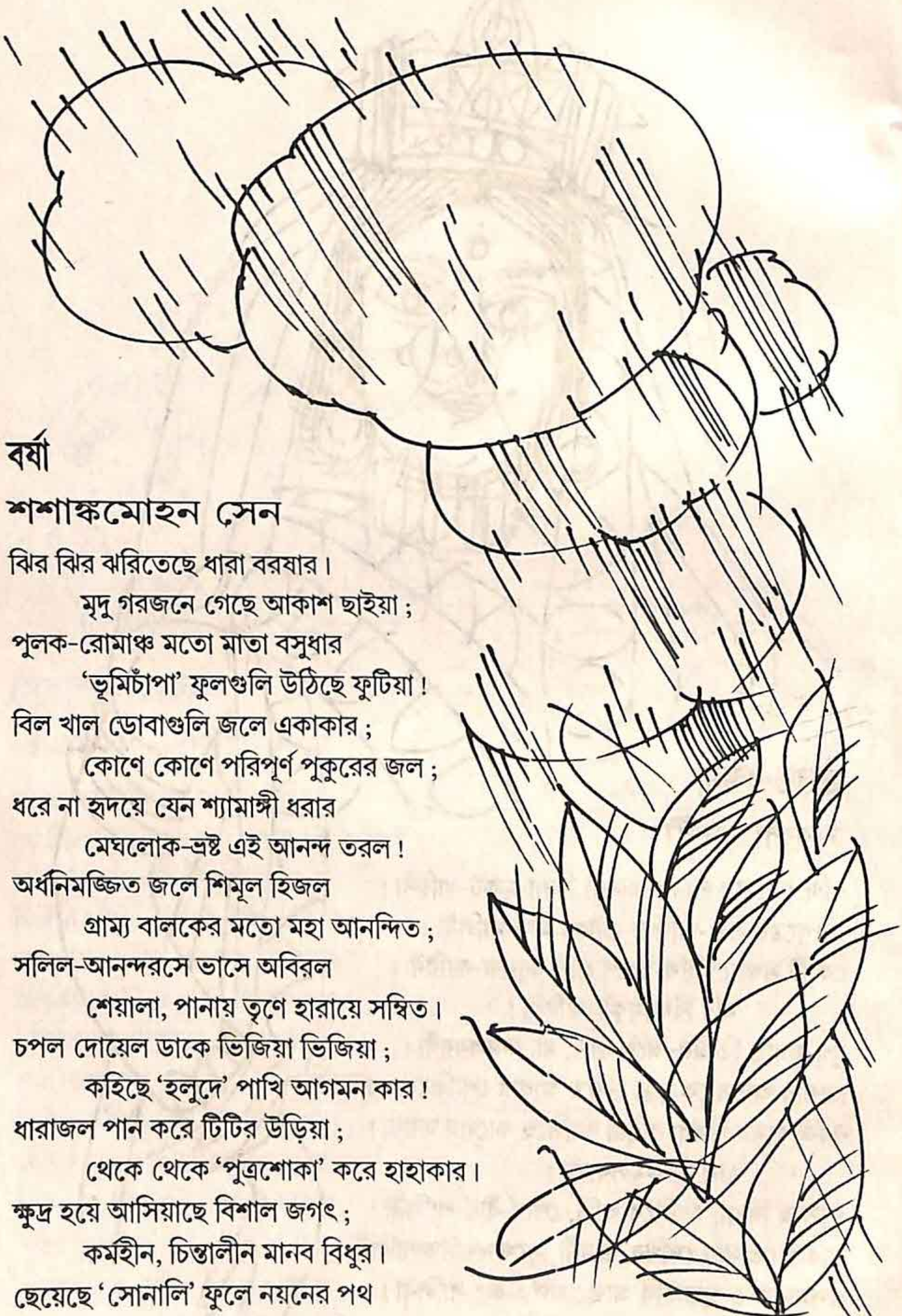
অন্তঃপুরে দিদিমার শুভ সিংহাসন
কে নিল কাড়িয়া কবে ? আছে কি এখন ?
মাদুর বিছায়ে শত অঙ্গনে অঙ্গনে
দিদিমা আছেন বসি সহাস্য আননে।
সন্ধ্যাবেলা ঘিরে তাঁরে বালিকাবালক
রূপকথা শুনিতেছে আঁখি অপলক।
চলিতেছে কৌতূহল, অদ্ভুত কল্পনা
কত প্রশ্ন, কত ব্যাখ্যা, সরল জল্পনা !
দিদিমার স্নিগ্ধ কোল ধৈর্য-ক্ষমাময়,
লালন করিত আগে শিশুর হৃদয়।
শৈশবের দিনগুলি স্নেহের ছায়ায়
অবাধে ছুটিতে পেত স্বাধীন শোভায়
এখন লয়েছে সেই সোনার আসন
কঠোর কর্তব্য আর শাণিত শাসন।



ভারত-বন্দনা

সরলা দেবী

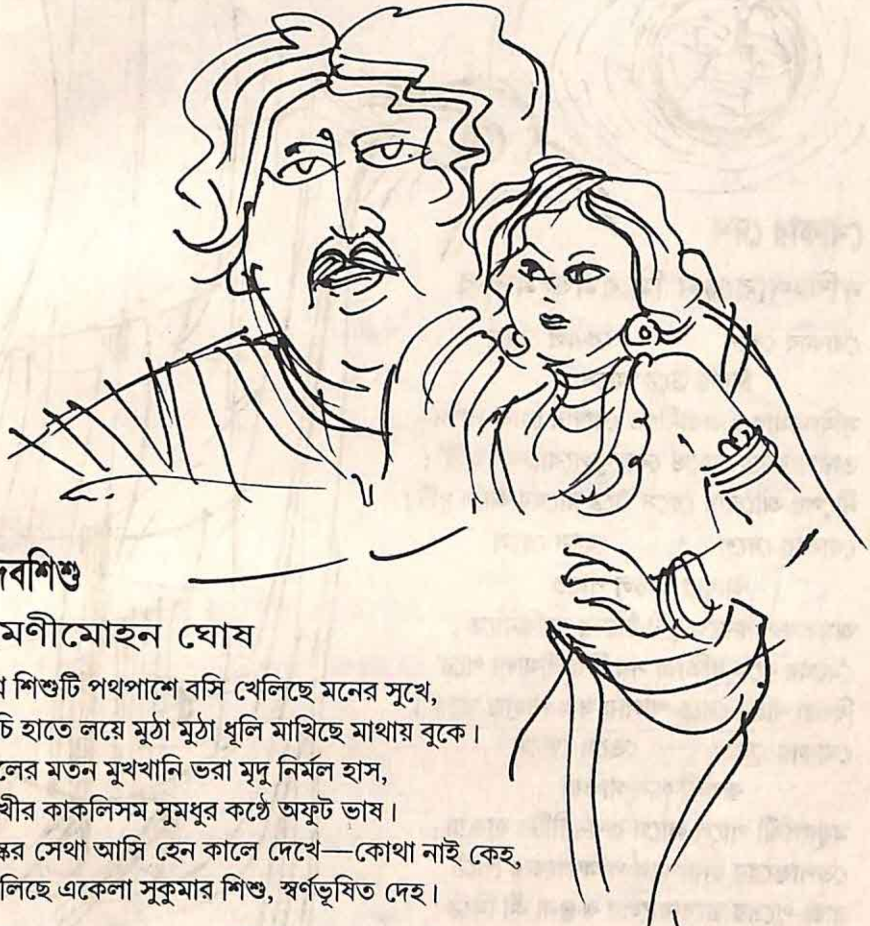
বন্দি তোমায় ভারত-জননী বিদ্যা-মুকুট-ধারিণী !
বরপুত্রের তপ-অর্জিত গৌরব মণি-মালিনী !
কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণ হৃদি-আনন্দ-কারিণী।
মরি বিদ্যামুকুট-ধারিণী !
যুগ-যুগান্ত তিমির-অন্তে হাস, মা, কমলবরণী।
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নবজীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী।
হাস মা কমলবরণী !
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য-বীর্য-শালিনী !
আবার তোমায় দেখিব, জননী, সুখে দশদিকপালিনী ;
অপমানক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পর-কর-বালিনী !
অয়ি শৌর্য-বীর্য-শালিনী।



বর্ষা

শশাঙ্কমোহন সেন

ঝির ঝির ঝরিতেছে ধারা বরষার।
মৃদু গরজনে গেছে আকাশ ছাইয়া ;
পুলক-রোমাঞ্চ মতো মাতা বসুধার
'ভূমিচাঁপা' ফুলগুলি উঠিছে ফুটিয়া !
বিল খাল ডোবাগুলি জলে একাকার ;
কোণে কোণে পরিপূর্ণ পুকুরের জল ;
ধরে না হৃদয়ে যেন শ্যামাঙ্গী ধরার
মেঘলোক-ভ্রষ্ট এই আনন্দ তরল !
অর্ধনিমজ্জিত জলে শিমূল হিজল
গ্রাম্য বালকের মতো মহা আনন্দিত ;
সলিল-আনন্দরসে ভাসে অবিরল
শেয়ালা, পানায় তৃণে হারায়ে সম্বিত।
চপল দোয়েল ডাকে ভিজিয়া ভিজিয়া ;
কহিছে 'হলুদে' পাখি আগমন কার !
ধারাজল পান করে টিটির উড়িয়া ;
থেকে থেকে 'পুত্রশোকা' করে হাহাকার।
ক্ষুদ্র হয়ে আসিয়াছে বিশাল জগৎ ;
কর্মহীন, চিন্তালীন মানব বিধুর।
ছেয়েছে 'সোনালি' ফুলে নয়নের পথ
—হলুদরঞ্জিত দেহ যেন দিগ্বধূর !

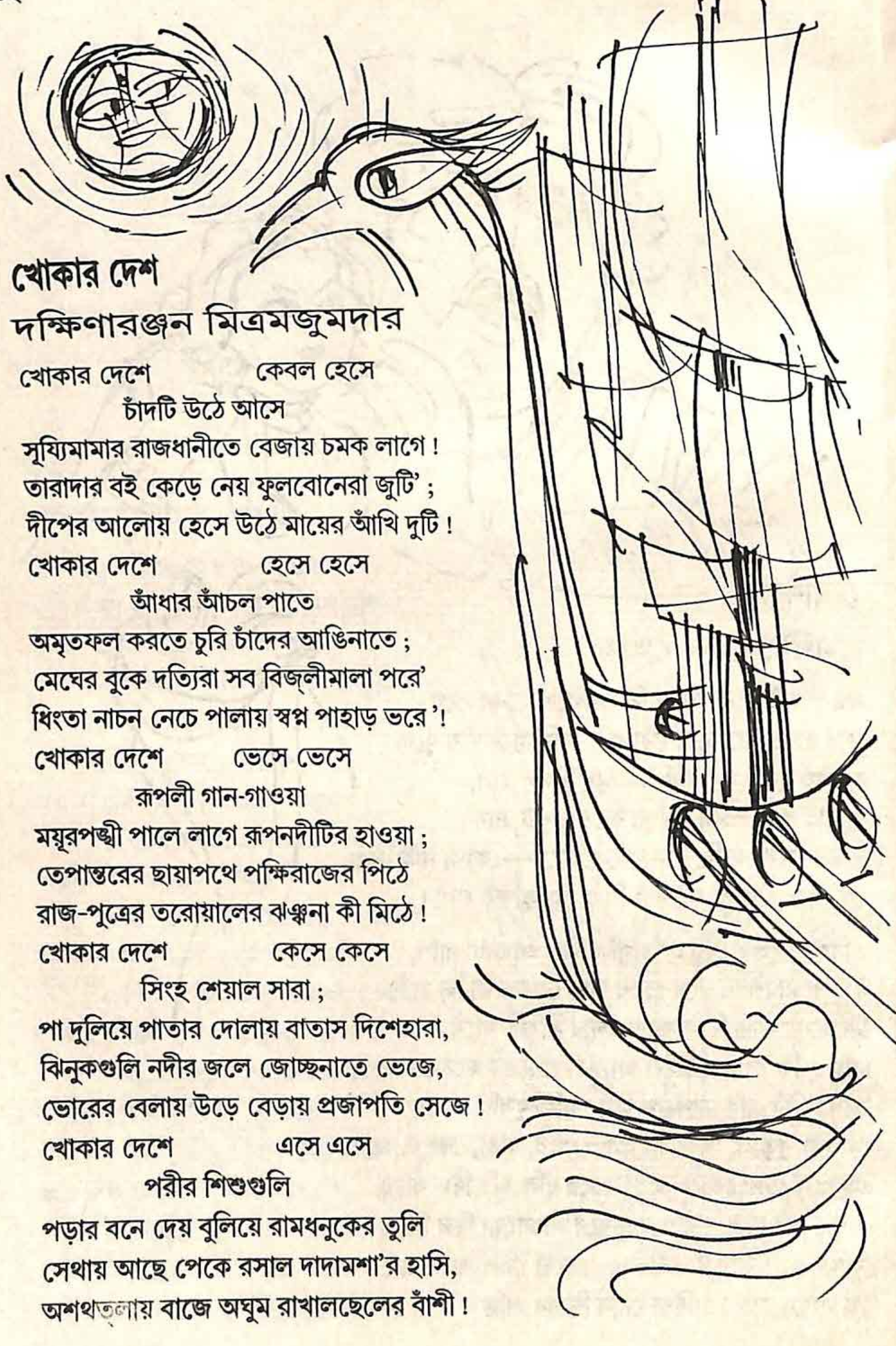


দেবশিশু

রমণীমোহন ঘোষ

নগ্ন শিশুটি পথপাশে বসি খেলিছে মনের সুখে,
কচি হাতে লয়ে মুঠা মুঠা ধূলি মাখিছে মাথায় বুকে।
ফুলের মতন মুখখানি ভরা মৃদু নির্মল হাস,
পাখীর কাকলিসম সুমধুর কণ্ঠে অফুট ভাষ।
তস্কর সেথা আসি হেন কালে দেখে—কোথা নাই কেহ,
খেলিছে একেলা সুকুমার শিশু, স্বর্ণভূষিত দেহ।

ত্বরিতে শিশুর দেহ হতে খুলি নিল আভরণ রাশি,
কাঁদিল না শিশু, মুখে চেয়ে তার কেবল উঠিল হাসি।
নিমেষের তরে রিক্ত-ভূষণ গৌর শিশুর পানে
চাহি—কি বেদনা উঠিল জাগিয়া চোরের কঠোর প্রাণে।
'মরি মরি! একি অপরূপ রূপ! ধূলি-ধূসরিত কায়
সোনার পুতুলি, শিশু-সন্ন্যাসী! আয়, বাছা, কোলে আয়!'
এই বলি চোর কোলে লয়ে তারে ধূলি মুছি দিল ধীরে,
যেখানে যা ছিল—রতনে ভূষণে সাজাইয়া দিল ফিরে।
কোথা গেল তার অর্থলালসা, কোথা গেল পাপে মতি,
মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহিয়া গৌর শিশুর প্রতি।



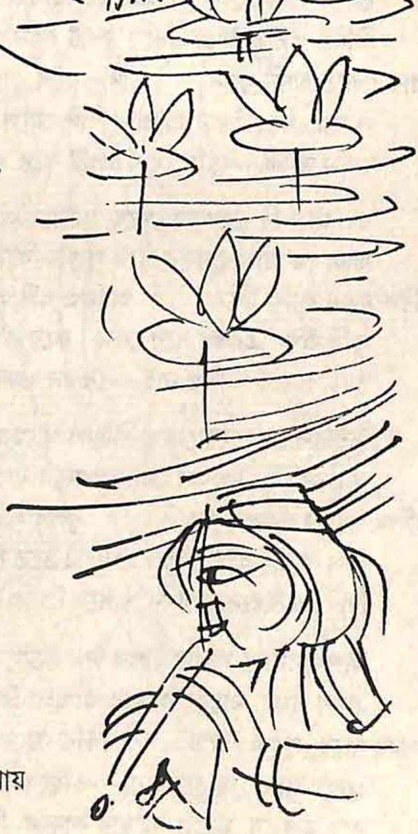
খোকার দেশ

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

খোকার দেশে কেবল হেসে
চাঁদটি উঠে আসে
সূয্যিমামার রাজধানীতে বেজায় চমক লাগে!
তারাদার বই কেড়ে নেয় ফুলবোনেরা জুটি';
দীপের আলোয় হেসে উঠে মায়ের আঁখি দুটি!
খোকার দেশে হেসে হেসে
আঁধার আঁচল পাতে
অমৃতফল করতে চুরি চাঁদের আঙিনাতে;
মেঘের বুকে দত্যিরা সব বিজ্‌লীমালা পরে'
ধিংতা নাচন নেচে পালায় স্বপ্ন পাহাড় ভরে'!
খোকার দেশে ভেসে ভেসে
রূপলী গান-গাওয়া
ময়ূরপঙ্খী পালে লাগে রূপনদীটির হাওয়া;
তেপান্তরের ছায়াপথে পক্ষিরাজের পিঠে
রাজ-পুত্রের তরোয়ালের ঝঞ্ঝনা কী মিঠে!
খোকার দেশে কেসে কেসে
সিংহ শেয়াল সারা;
পা দুলিয়ে পাতার দোলায় বাতাস দিশেহারা,
ঝিনুকগুলি নদীর জলে জোচ্ছনাতে ভেজে,
ভোরের বেলায় উড়ে বেড়ায় প্রজাপতি সেজে!
খোকার দেশে এসে এসে
পরীর শিশুগুলি
পড়ার বনে দেয় বুলিয়ে রামধনুকের তুলি
সেথায় আছে পেকে রসাল দাদামশা'র হাসি,
অশথতলায় বাজে অঘুম রাখালছেলের বাঁশী!



পদ্মপুকুরে



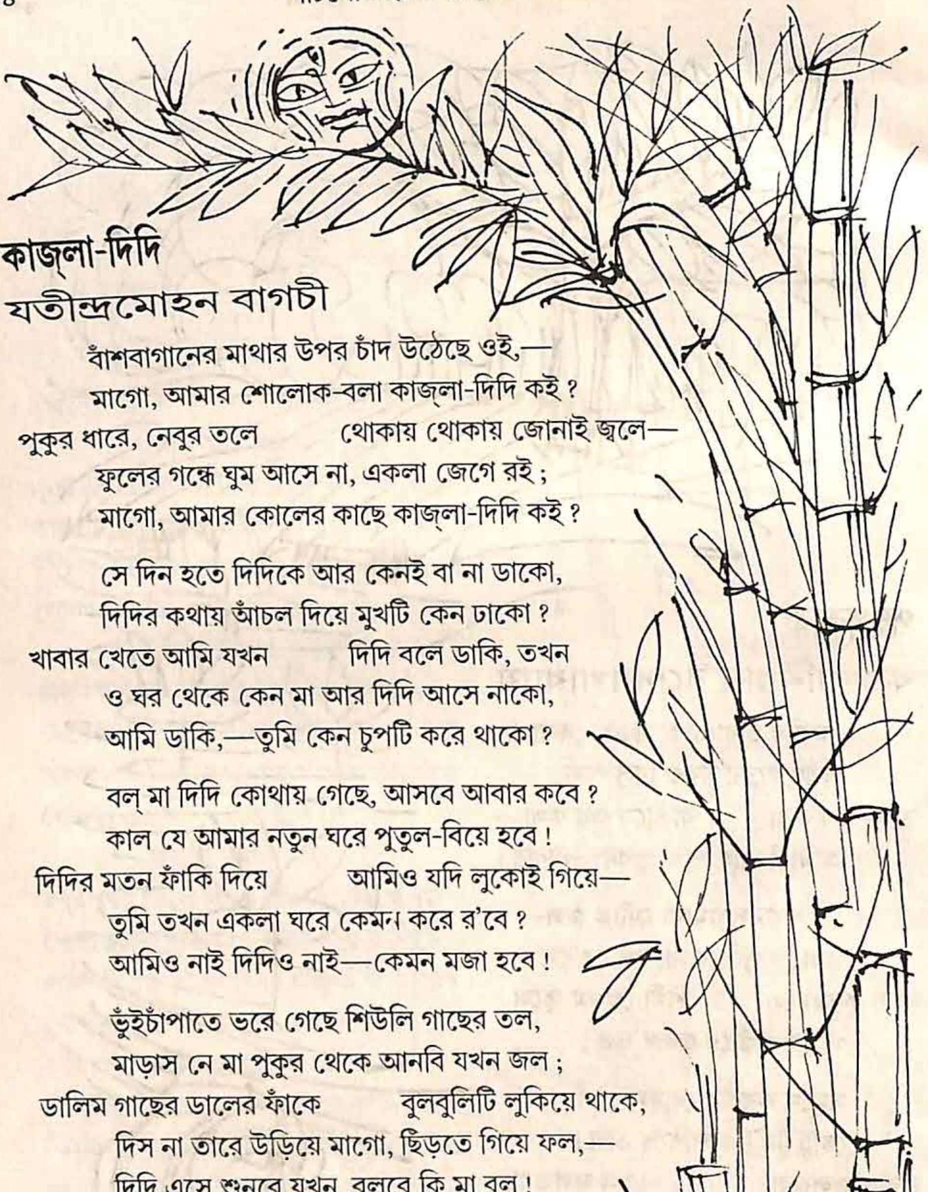
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘের ছায়া-ঢাকা সজল কেয়াঝাড়,
পদ্মপুকুরের সবুজ ঢালু পাড়,
তরুণ তরুলতা বাতাসে কয় কথা—
আমারি নাহি পাখা ভুবন ভুলাবার।

কে যাচে সুধামাখা ফটিক জল—
তৃষা কি পুরিবে না, বল্ রে বল্।
নাচে কদমমূলে শিখী পেখম তুলে
গরজে গম্ভীরে জলদ-দল।

সমুখে করবীর দোদুল ডাল ;
ছোট্ট টুনটুনি শিখিছে তাল।
ফুরাল জলঝরা, বকুল ফুলভরা,
গ্রামের চেনা পথে ফিরে রাখাল।

উপর পানে চাহি দোলে অধীর
তালের বাকলেতে বাবুই নীড় ;
বলাকা উড়ে যায় কে জানে কে কোথায়
হয়তো নয় তারা এ পৃথিবীর।



কাজ্‌লা-দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

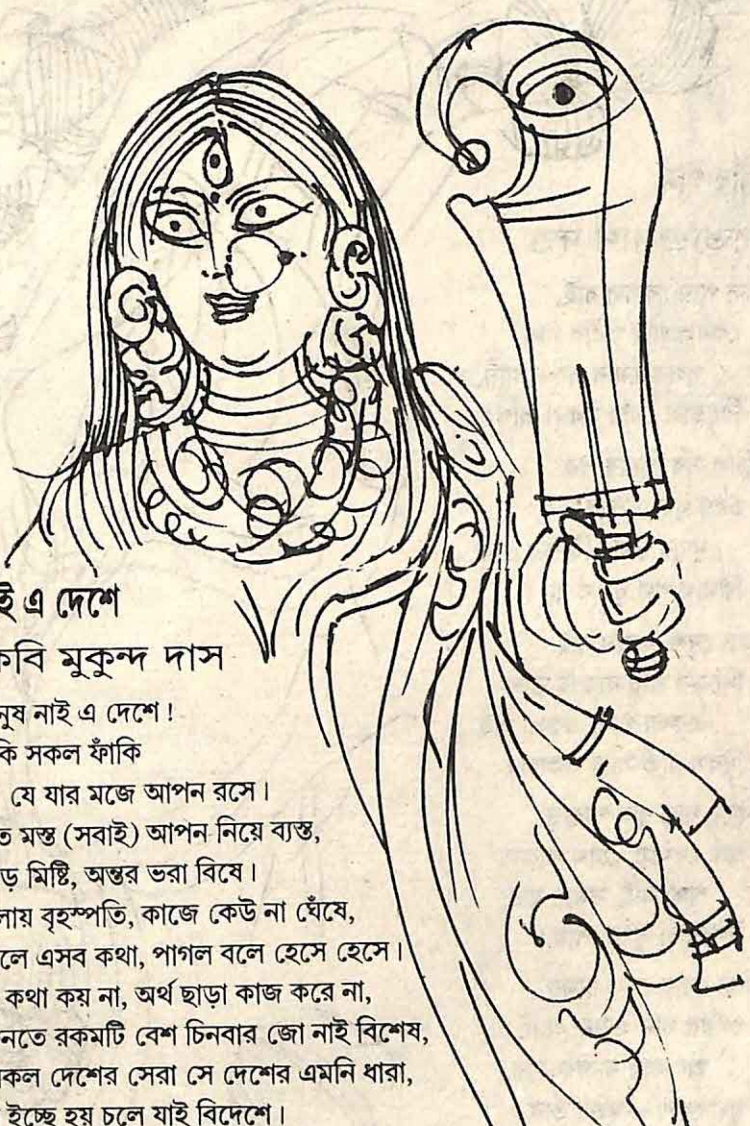
বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,—
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা-দিদি কই ?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই ;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা-দিদি কই ?

সে দিন হতে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে ডাকি, তখন
ও ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি,—তুমি কেন চুপটি করে থাকো ?

বল্ মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে !
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে—
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে র'বে ?
আমিও নাই দিদিও নাই—কেমন মজা হবে !

ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল ;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মাগো, ছিড়তে গিয়ে ফল,—
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কি মা বল্ !

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময়, মাগো, আমার কাজ্‌লা-দিদি কই ?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে ;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না—তাইতে জেগে রই,—
রাত হল যে, মাগো, আমার কাজ্‌লা-দিদি কই ?

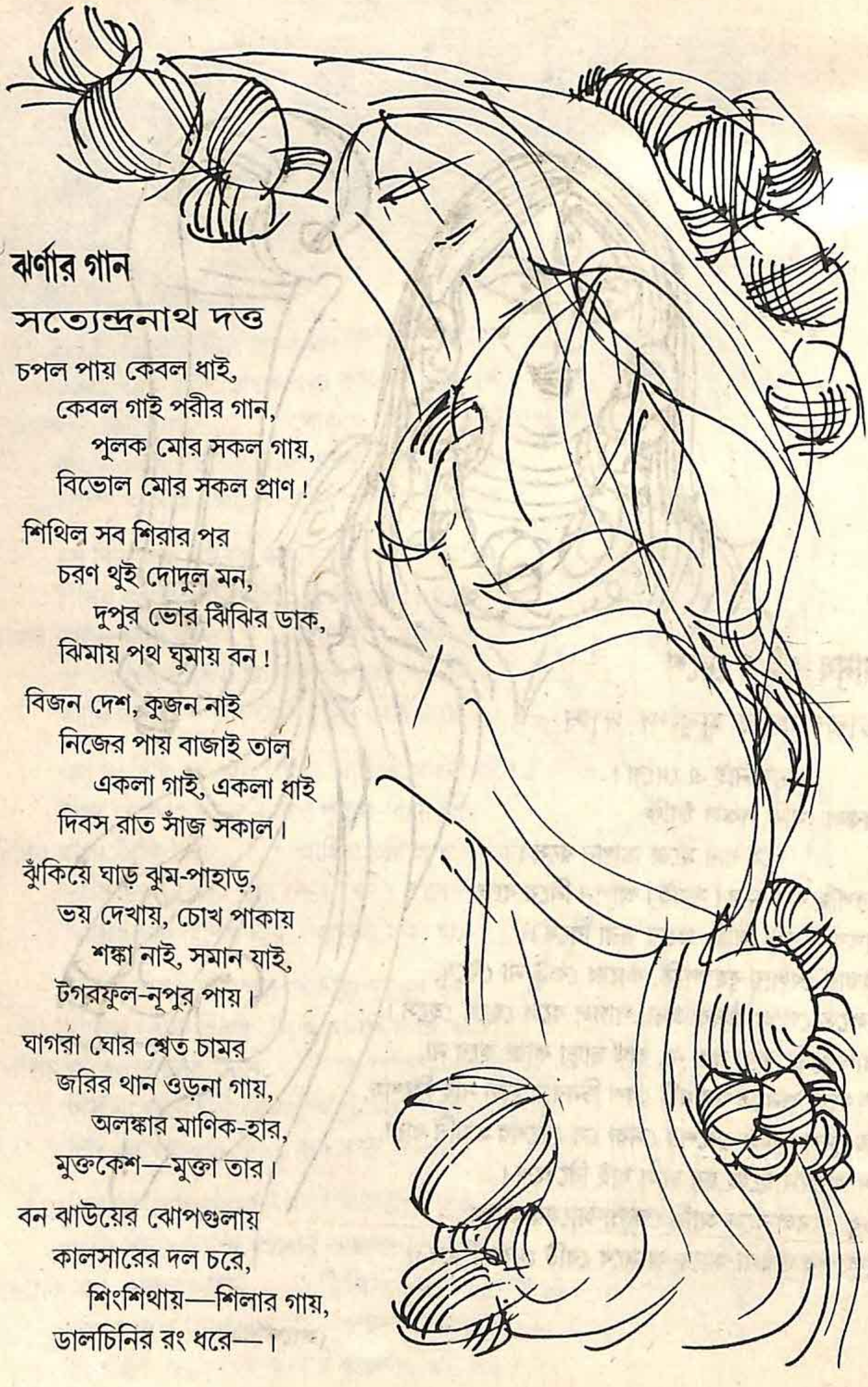


মানুষ নাই এ দেশে

চারণকবি মুকুন্দ দাস

মানুষ নাই এ দেশে !
সকল মেকি সকল ফাঁকি
যে যার মজে আপন রসে।
দেখছি কত মস্ত (সবাই) আপন নিয়ে ব্যস্ত,
মুখখানা বড় মিষ্টি, অন্তর ভরা বিষে।
কথার বেলায় বৃহস্পতি, কাজে কেউ না ঘেঁষে,
বলতে গেলে এসব কথা, পাগল বলে হেসে হেসে।
স্বার্থ ছাড়া কথা কয় না, অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ চিনবার জো নাই বিশেষ,
যে দেশ সকল দেশের সেরা সে দেশের এমনি ধারা,
দেখেশুনে ইচ্ছে হয় চলে যাই বিদেশে।
তবু কেবল বসে আছি ক্ষেপা-মায়ের আশে,
মুকুন্দের ভরসা আছে আসবে বেটি দেবে পিষে।।

(সংক্ষেপিত)



ঝর্ণার গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ!

শিথিল সব শিরার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর ভোর ঝিঁঝির ডাক,
ঝিমায় পথ ঘুমায় বন!

বিজন দেশ, কুজন নাই
নিজের পায় বাজাই তাল
একলা গাই, একলা ধাই
দিবস রাত সাঁজ সকাল।

ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়,
ভয় দেখায়, চোখ পাকায়
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগরফুল-নূপুর পায়।

ঘাগরা ঘোর শ্বেত চামর
জরির থান ওড়না গায়,
অলঙ্কার মাণিক-হার,
মুক্তকেশ—মুক্তা তার।

বন ঝাউয়ের ঝোপগুলায়
কালসারের দল চরে,
শিংশিথায়—শিলার গায়,
ডালচিনির রং ধরে—।

ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই
দুলিয়ে যাই অচল ঠাট
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই
টিলার গায়ে ডালিম ফাট।

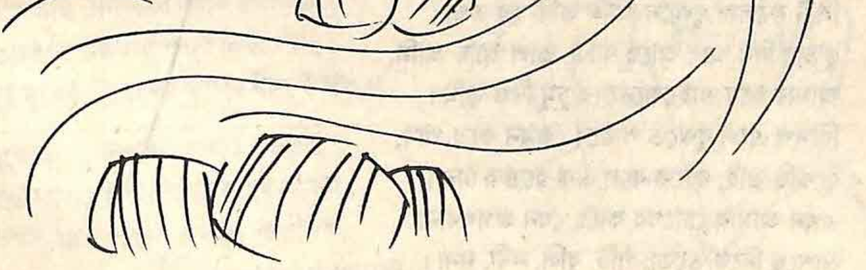
শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্‌-ঝাঁঝির মখমলে
জরির জাল আঙরাখায়
অঙ্গ মোর ঝলমলে।

নিম্নে ধাই শুনতে পাই
'ফটিক জল'। হাঁকছে কে
কণ্ঠতেই তৃষ্ণা যার
নিক্‌ না সে পাঁক ছেঁকে।

গরজ যার জল স্যাঁচার
পাৎকুয়ায় যাক্‌ না সেই
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।

তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান—তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়
আমরা চাই মুগ্ধ চোখ।

চপল পায় কেবল ধাই
উপল ঘায় দিই ঝিলিক,
দুল দুলাই মন ভোলাই,
ঝিলমিলাই দিকবিদিক।

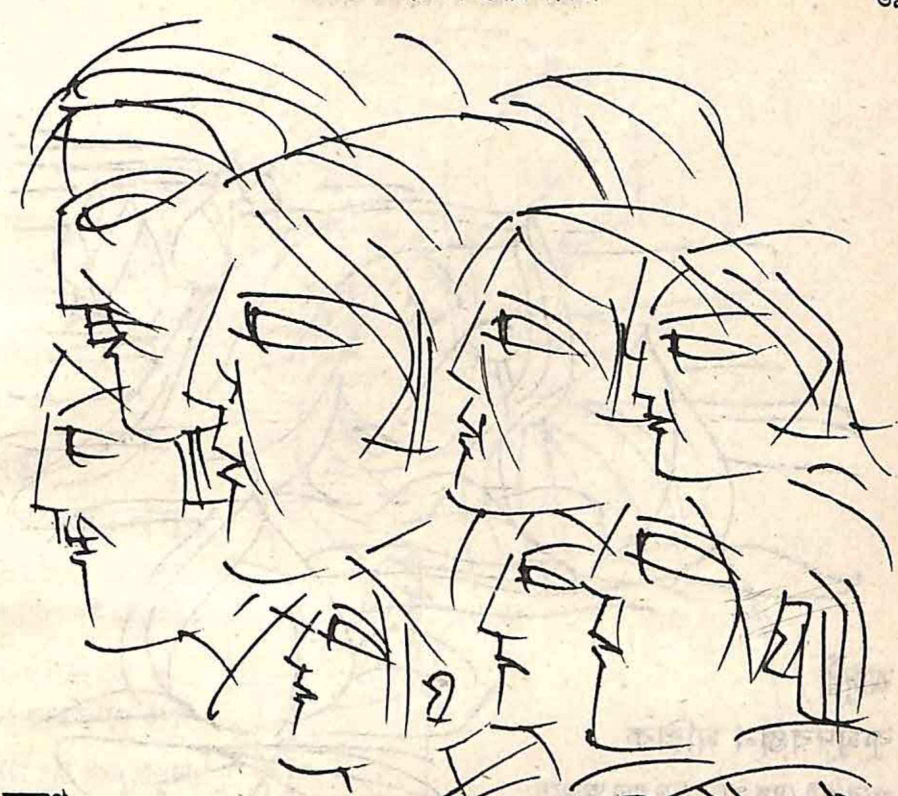



দাদার চিঠি

কুসুমকুমারী দাশ



আয় রে মনা, ভূতো, বুলি আয় রে তাড়াতাড়ি,
দাদার চিঠি এসেছে আজ, শুনাই তোদের পড়ি।
কলকাতাতে এসেছি ভাই কালকে সকালবেলা,
হেথায় কত গাড়ি, ঘোড়া, কত লোকের মেলা।
পথের পাশে সারি সারি দু' কাতারে বাড়ি,
দিন-রাত্তির হুস্ হুস্ করে ছুটছে রেলের গাড়ি।
আমি কি ভাই গেছি ভুলে তোদের মলিন মুখ,
মনে পড়লে এখনও যে কেঁপে ওঠে বুক।
সেই যে মায়ের জলে ভরা স্নেহের নয়নদুটি,
সেই যে আমার হাতটি ছেড়ে দিতে চায়নি পুঁটি।
ভূতি মনাও আবদেরে ভাব, 'দাদা, কোথায় যাবে ?
যদি তুমি যেতে চাও তো সঙ্গে মোদের নেবে।'
সেই যে বুলি ঠোঁট কাঁপায়ে চুলের গোছা ছেড়ে,
'যেতে নাহি দিব' বলে দাঁড়িয়েছিল দোরে—
সেই যে নলিন স্টেশন-ঘরে চোখে কাপড় দিয়ে
কাঁদছিলি তুই হাতখানি মোর তোর হাতেতে নিয়ে।
সে সব কথা মনে প'ড়ে, চোখে আসছে জল,
দিনে দিনে কমে যাচ্ছে ভরা বুকের বল।
আজকে আমি এখান হতে বিদায় হতে চাই
এ সব কথা মায়ের কাছে বলোনা কো ভাই।
আর এক কথা, নিয়মমত লিখো আমায় চিঠি,
কেমন আছ তুমি, মনা, বুলি, ছোট পুঁটি ?
মা বাবাকে প্রণাম দিয়ে বলবে আমার কথা,
সিটি কলেজ খুললে আমি ভর্তি হব তথা।
দু'চার দিন আর আছে বাকি, ভাল আছি আমি,
আমার হয়ে ভাইবোনেদের চুমু দিও তুমি।
বিদেশ এলে বুঝতে পারবে কেমন করে প্রাণ,
বুঝেছি ভাই, কাকে বলে এক রক্তের টান।
এখন আমার চোখের কাছে যেন জগৎখানা
ভাসছে নিয়ে ভূতো, পুঁটি, বুলি, ননী, মনা।



তরুণ

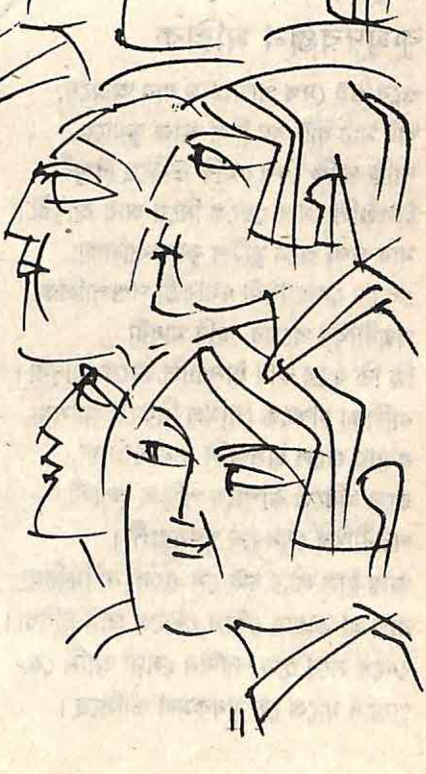
গুরুসদয় দত্ত

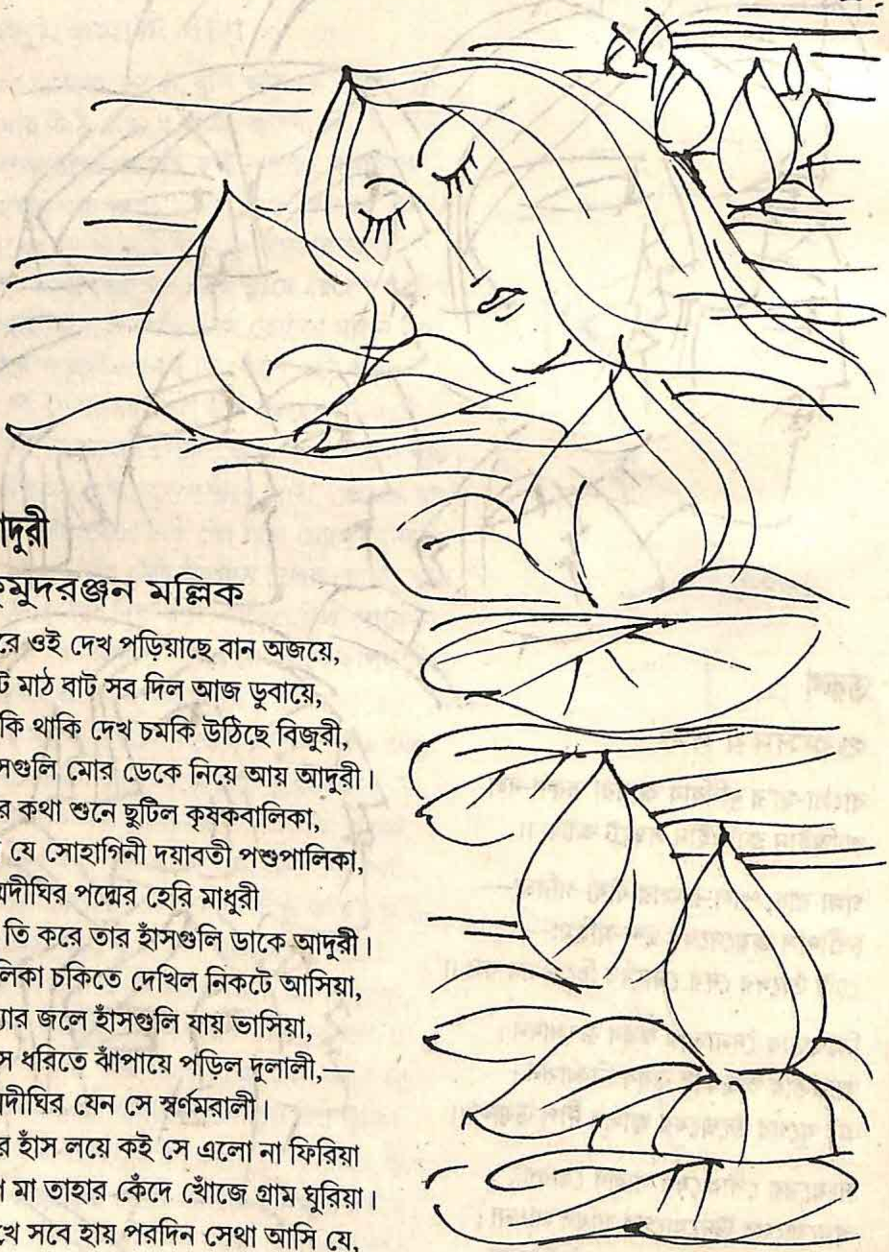
বাংলা-মা'র দুর্নিবার আমরা তরুণ-দল
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সঙ্কটে অটল ॥

গঙ্গা-রাঢ়, পাল-রাজার বীর্য্য-গরিমা—
চণ্ডীদাস জয়দেবের ছন্দ-মহিমা—
ঢেউ তাঁদের দেয় মোদের চিত্তে নব বল ॥

নিঃস্বতার দৈন্যভার করব উৎসাদন ;
অজ্ঞতার অন্ধকার করব নির্ব্বাসন ;
এই যুগের উন্মেষের জ্বাল্‌ব দীপ উজল ॥

সংযমের পৌরুষের পাল্‌ব প্রেরণা,
শ্রমযোগের উদ্‌যোগের সাধ্‌ব সাধনা ;
বাংলা-মা'র লাঞ্ছনায় মুছ্‌ব আঁখিজল,
আমরা তরুণ-দল ॥

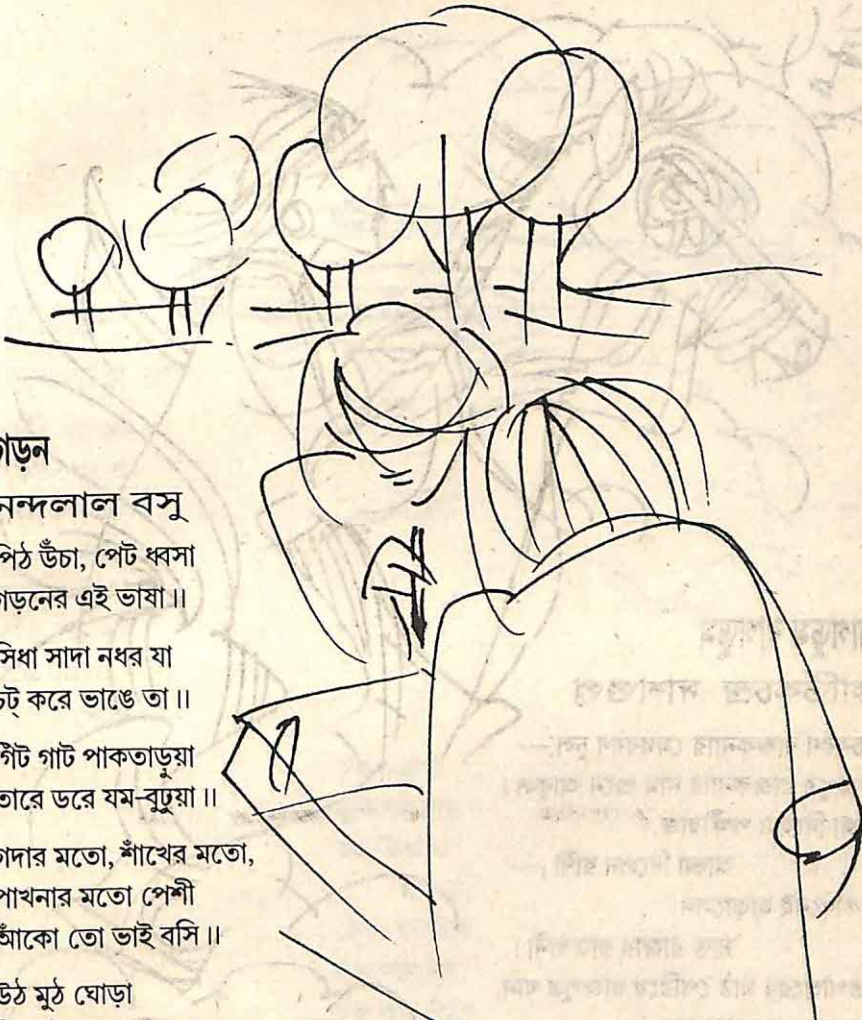




আদুরী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ওরে ওই দেখ পড়িয়াছে বান অজয়ে,
ঘাট মাঠ বাট সব দিল আজ ডুবায়ে,
থাকি থাকি দেখ চমকি উঠিছে বিজুরী,
হাঁসগুলি মোর ডেকে নিয়ে আয় আদুরী।
মার কথা শুনে ছুটিল কৃষকবালিকা,
সে যে সোহাগিনী দয়াবতী পশুপালিকা,
পদ্মদীঘির পদ্মের হেরি মাধুরী
তি তি করে তার হাঁসগুলি ডাকে আদুরী।
বালিকা চকিতে দেখিল নিকটে আসিয়া,
বন্যার জলে হাঁসগুলি যায় ভাসিয়া,
হংস ধরিতে ঝাঁপায়ে পড়িল দুলালী,—
পদ্মদীঘির যেন সে স্বর্ণমরালী।
আর হাঁস লয়ে কই সে এলো না ফিরিয়া
বাপ মা তাহার কেঁদে খোঁজে গ্রাম ঘুরিয়া।
দেখে সবে হায় পরদিন সেথা আসি যে,
পদ্মের মাঝে সে মুখকমল ভাসিছে!



গড়ন

নন্দলাল বসু

পিঠ উঁচা, পেট ধ্বসা
গড়নের এই ভাষা ॥

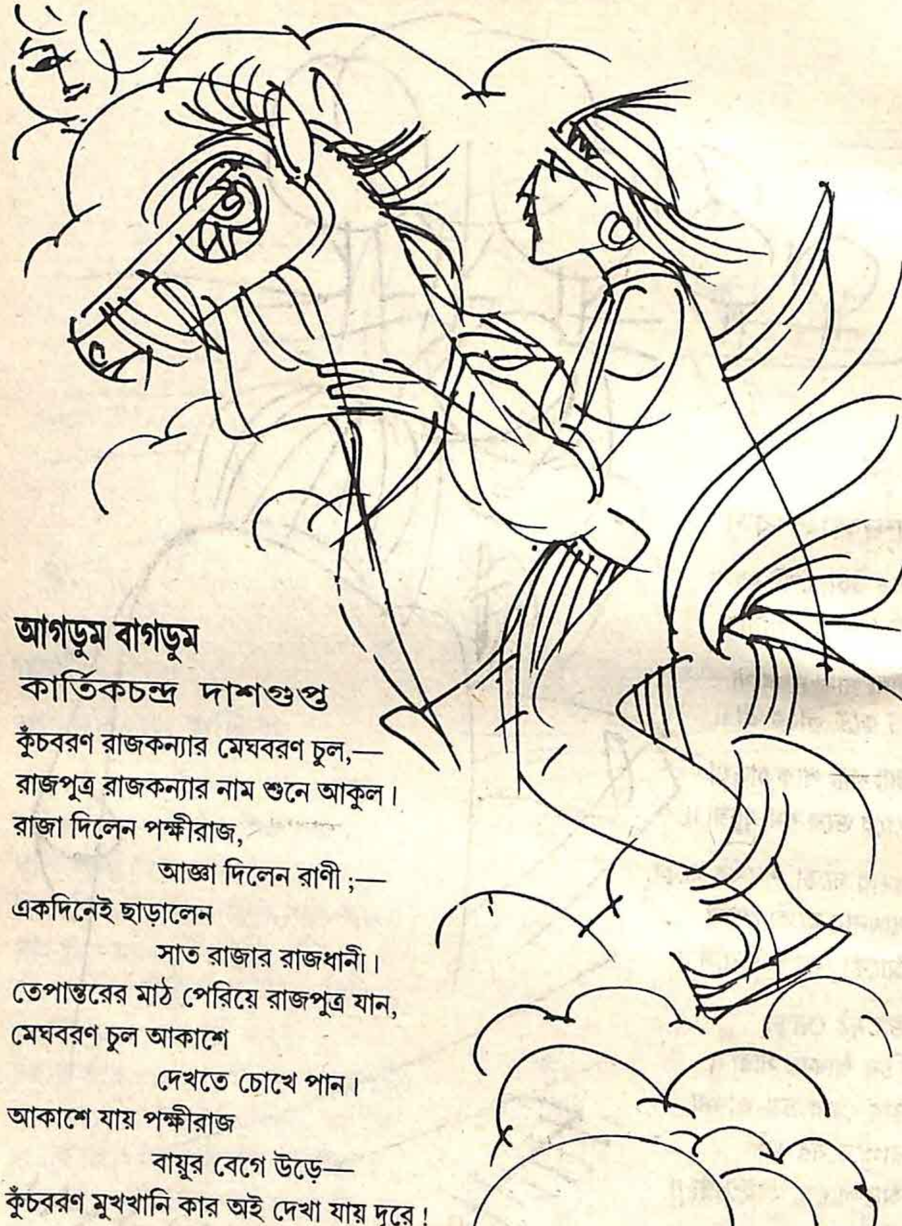
সিধা সাদা নধর যা
চট্ করে ভাঙে তা ॥

গিঁট গাট পাকতাড়ুয়া
তারে ডরে যম-বুড়ুয়া ॥

গদার মতো, শাঁখের মতো,
পাখনার মতো পেশী
আঁকো তো ভাই বসি ॥

উঠ মুঠ ঘোড়া
তিন আঁকায় সারা ॥
ঠার-ঠোর ভয়-ভাবনা
রাগদ্বেষের ভঙ্গী
আঁকো তো ভাই সঙ্গী ॥

ওঠা-পড়ার ভঙ্গী মেলা,
নাচা চলা কথা বলা—
কোন্ খেয়ালের কেমন খেল.
নয়ন মেলে দ্যাখ রে ভোলা,
আঁক রে ভোলা ॥

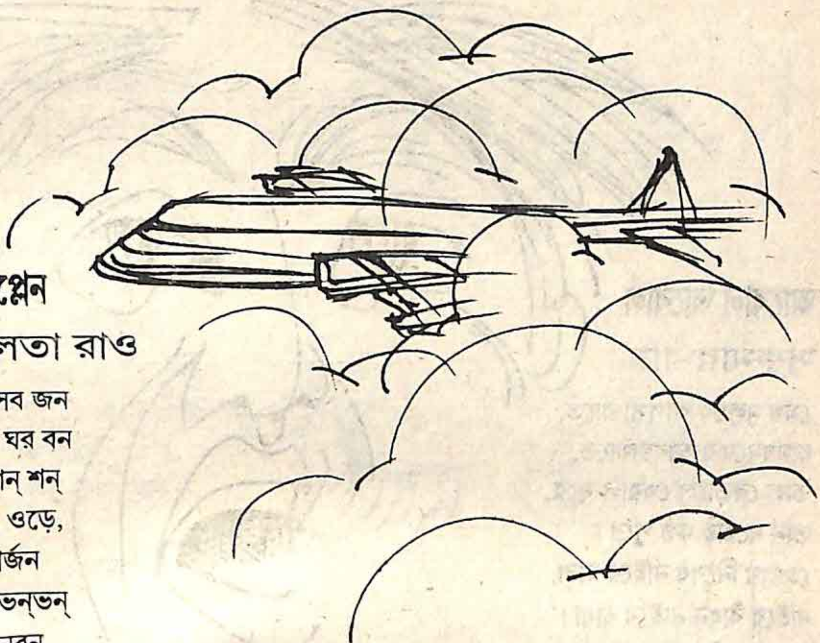


আগড়ুম বাগড়ুম

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল,—
রাজপুত্র রাজকন্যার নাম শুনে আকুল।
রাজা দিলেন পক্ষীরাজ,
আজ্ঞা দিলেন রাণী ;—
একদিনেই ছাড়ালেন
সাত রাজার রাজধানী।
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজপুত্র যান,
মেঘবরণ চুল আকাশে
দেখতে চোখে পান।
আকাশে যায় পক্ষীরাজ
বায়ুর বেগে উড়ে—
কুঁচবরণ মুখখানি কার অই দেখা যায় দূরে!

রাজপুত্র গেলেন কাছে
ভাঙলো চোখের ভুল,—
চাঁদটি হলো রাজকন্যা
মেঘ হলো তাঁর চুল!



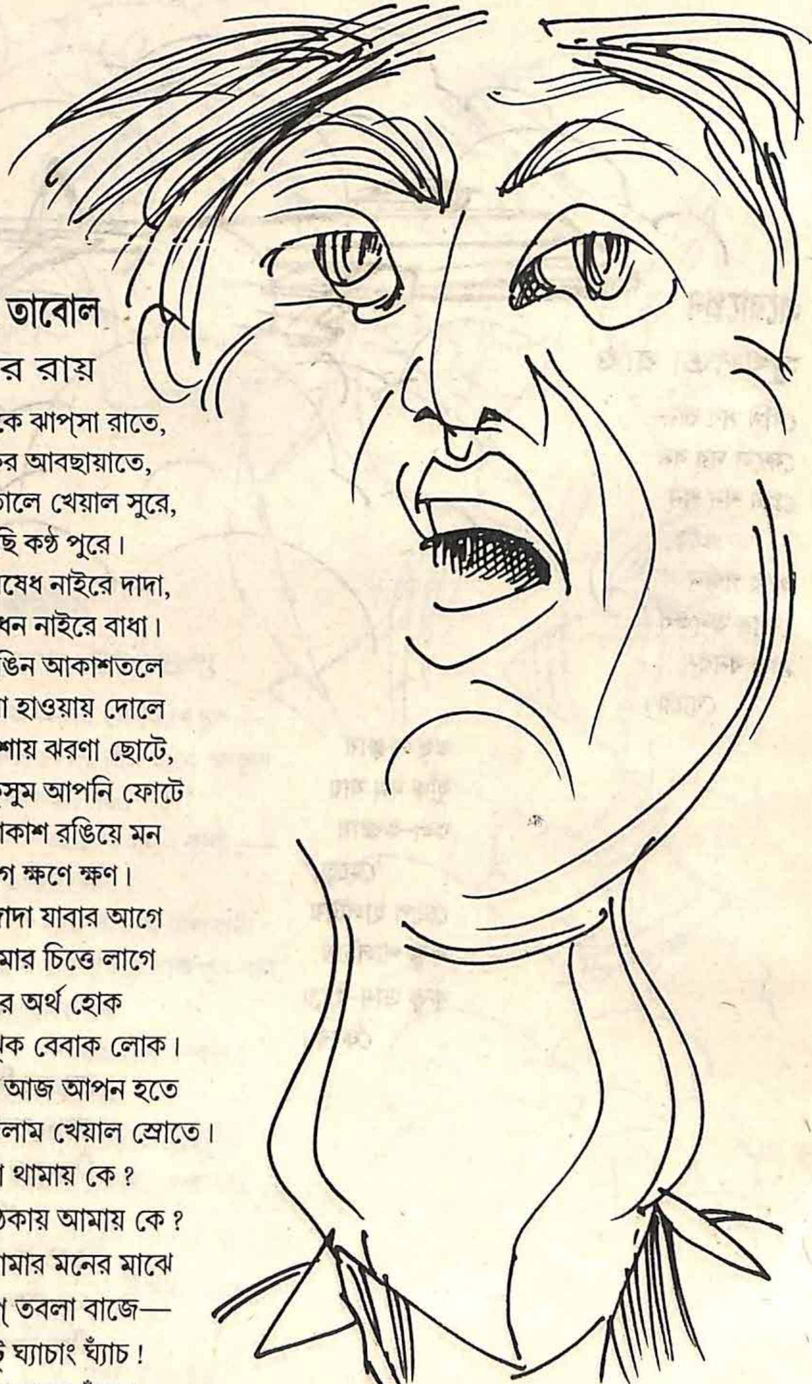
এরোপ্লেন

সুখলতা রাও

দেখি সব জন
ফেলে ঘর বন
প্লেন শন্ শন্
ওড়ে,
করে গর্জন
জোর ভন্‌ভন্
নাক বন্‌বন্
ঘোরে।

ঝড় ঝঞ্ঝায়
বুঝি দম্ যায়
কল-কব্জায়
ছেড়ে,
চেপে হালটায়
কভু পালটায়,
কভু ডান-বাঁয়ে
ফেরে।

তবু সব জিনে
কোন পথ বিনে
ঠিক পথ চিনে
ধায়,
ওঠে ঢের দূরে
ঘন মেঘ ফুঁড়ে,
নীল দেশ ঘুরে
যায়।

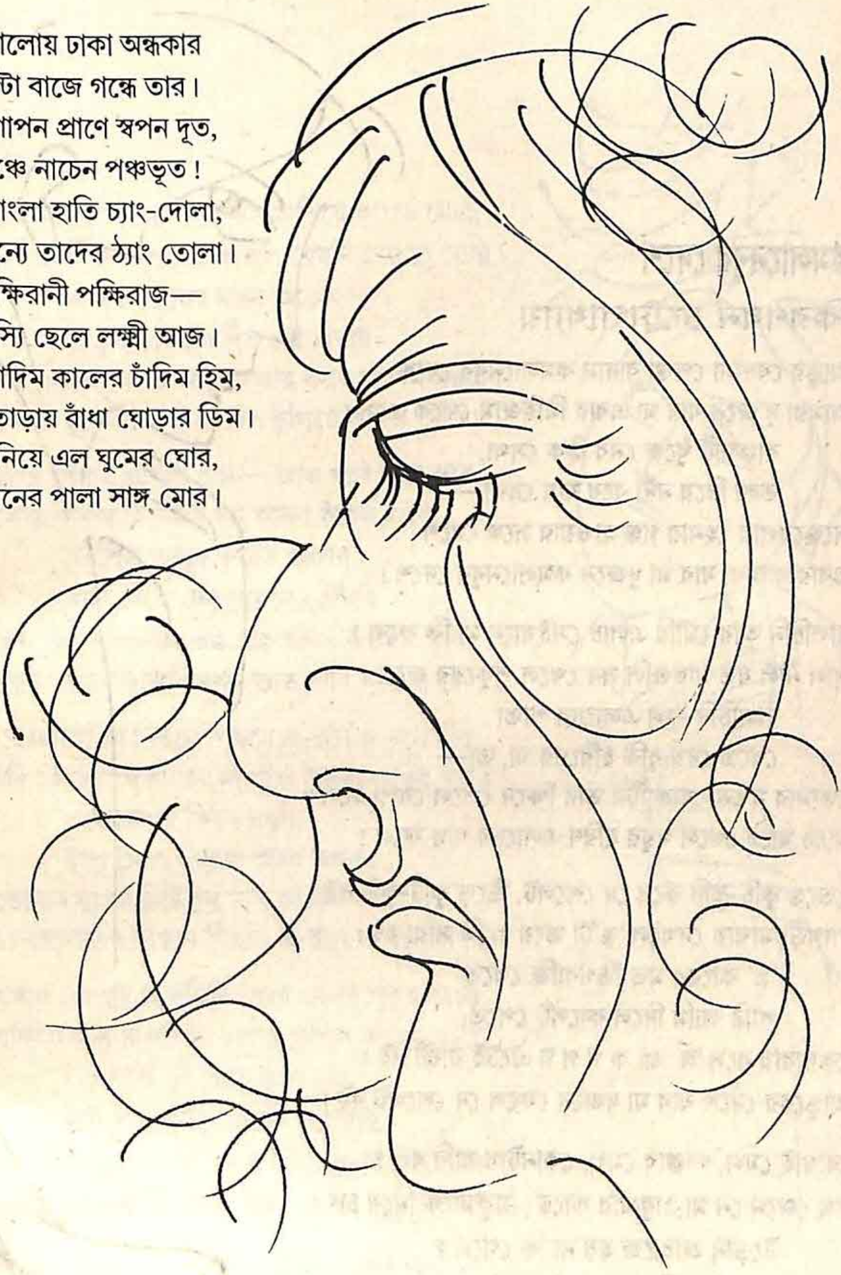


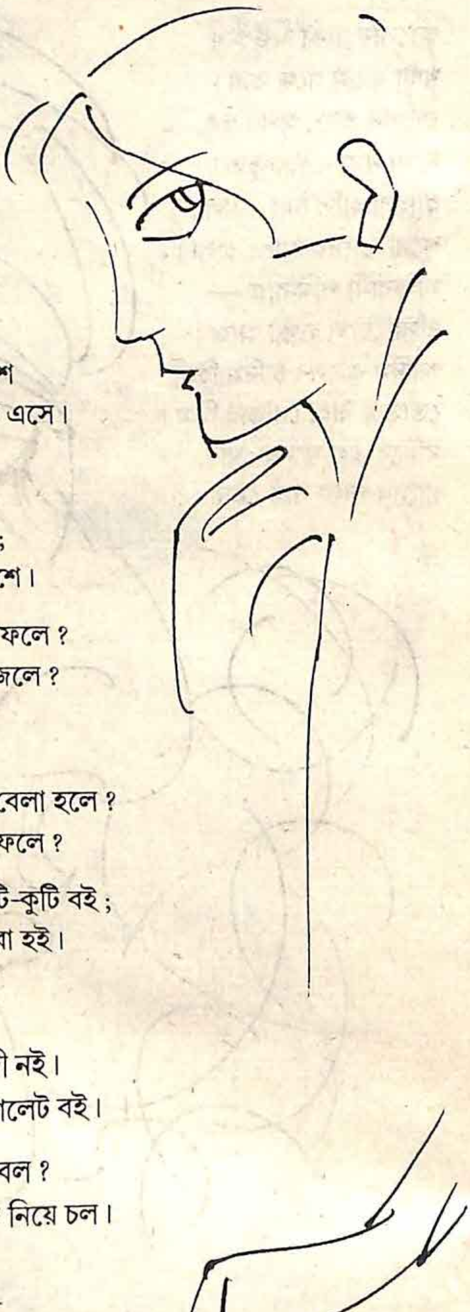
আবোল তাবোল

সুকুমার রায়

মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপ্ন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশায় ঝরণা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে
নাই বা তার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুটলে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ !
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।

আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘন্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত!
হ্যাংলা হাতি চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।





কমলানেবুর দেশে

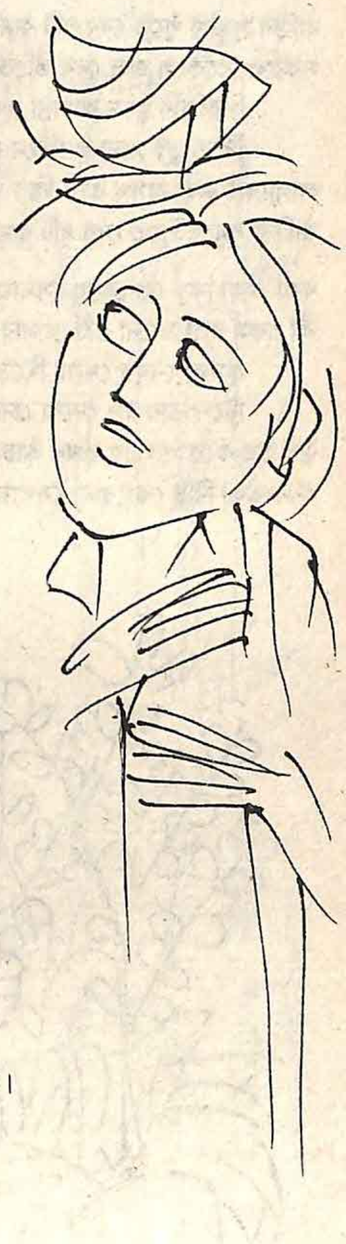
কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

আঙুর বেদানা পেস্তা বাদাম কমলানেবুর দেশে
আমরা দু'জনে যাব মা এবার মিহিজাম থেকে এসে।
বাংলাটি খুঁজে নেব ঠিক সেথা,
তলা দিয়ে নদী বয়ে যায় যেথা—
সন্ধেবেলায় হেনার গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মেশে ;
এবার আমরা যাব মা দুজনে কমলানেবুর দেশে।

দালচিনি আর মৌরি এলাচ সেইখানে মা কি ফলে ?
লাল নীল যত মাছগুলি সব খেলে পুকুরের জলে ?
দালচিনি-ফুল এলাচের পাতা
খেতে দেয় বুঝি হরিণের মা, তা—
তোমার মতন খোকাটির তার ক্ষিদে পেলে বেলা হলে ?
মাঠে মাঠে খেলে ময়ূর হরিণ এলাচের গাছ ফলে ?

ভেঙে কুচি-কুচি করে দে শেলেট, ছিঁড়ে কুটি-কুটি বই ;
পাগড়ী মাথায় দেখলে 'ঙ'টা ভয়ে আমি সারা হই।
'ঌ' কারের মত ডিগবাজি খেতে
পারি আমি দিলে কার্পেট পেতে;
কেদারায় বসে অ আ ক খ গ ঘ ঐটেই রাজী নই।
আঙুরের দেশে যাব মা দুজনে ফেলে দে শেলেট বই।

বোম্বাই মেল, পাঞ্জাব মেল, কোনটায় যাবি বল ?
পথ জেনে নে মা ঠাকুমার কাছে ; ঠাকুমাকে নিয়ে চল।
উড়োন্ জাহাজে হয় না কি গেলে ?
আকাশের নীল মেঘ ঠেলে ঠেলে—
নয় তো জাহাজে দুলে ঢেউ তুলে নাচিয়ে সাগর জল ?
হাসছিস কেন ? বল মা আমায় কোনটায় যাবি বল ?



কমলা ফুলের রঙ দিয়ে দিস ছাপিয়ে কাপড় মোর;
টিপ এঁকে দিস পরিয়ে কাজল যেমনি হবে মা ভোর।
রাখাল ছেলের মতন আমায়
চুড়ো বেঁধে চুল দিস গো মাথায়
আপেলের ক্ষেতে আঙুরতলায় করব মা দিন-ভোর।
কমলা ফুলের রঙ দিয়ে দিস ছুপিয়ে কাপড় মোর।

দুপুর বেলায় ডাকবি যখন—ভাত খাবি আয় ওরে!
পেস্তা বাদাম কিচ্‌মিচি সব আনব আঁচল ভরে;
আপেল আঙুর দু-এক হাজার
এনে ঢেলে দেব সামনে তোমার
ডিম-ভরা লাল-নীল রঙ মাছ আনব কতই ধোরে;
দুপুর বেলায় ডাকবি যখন ভাত খাবি আয় ও রে!

পেরজাপতির পিছনে পিছনে এ-বনে ও-বনে যাব;
যদি ক্ষিদে পায় হাতের নাগালে টাটকা আঙুর খাব।
সন্ধেবেলায় ফিরব যখন,
ঝাঁপ খেয়ে কোলে পড়ব তখন;
তোমার মুখের মিষ্টি চুমু মা মধুর মতন খাব।
পেরজাপতির পিছনে পিছনে এ-বনে ও-বনে যাব।

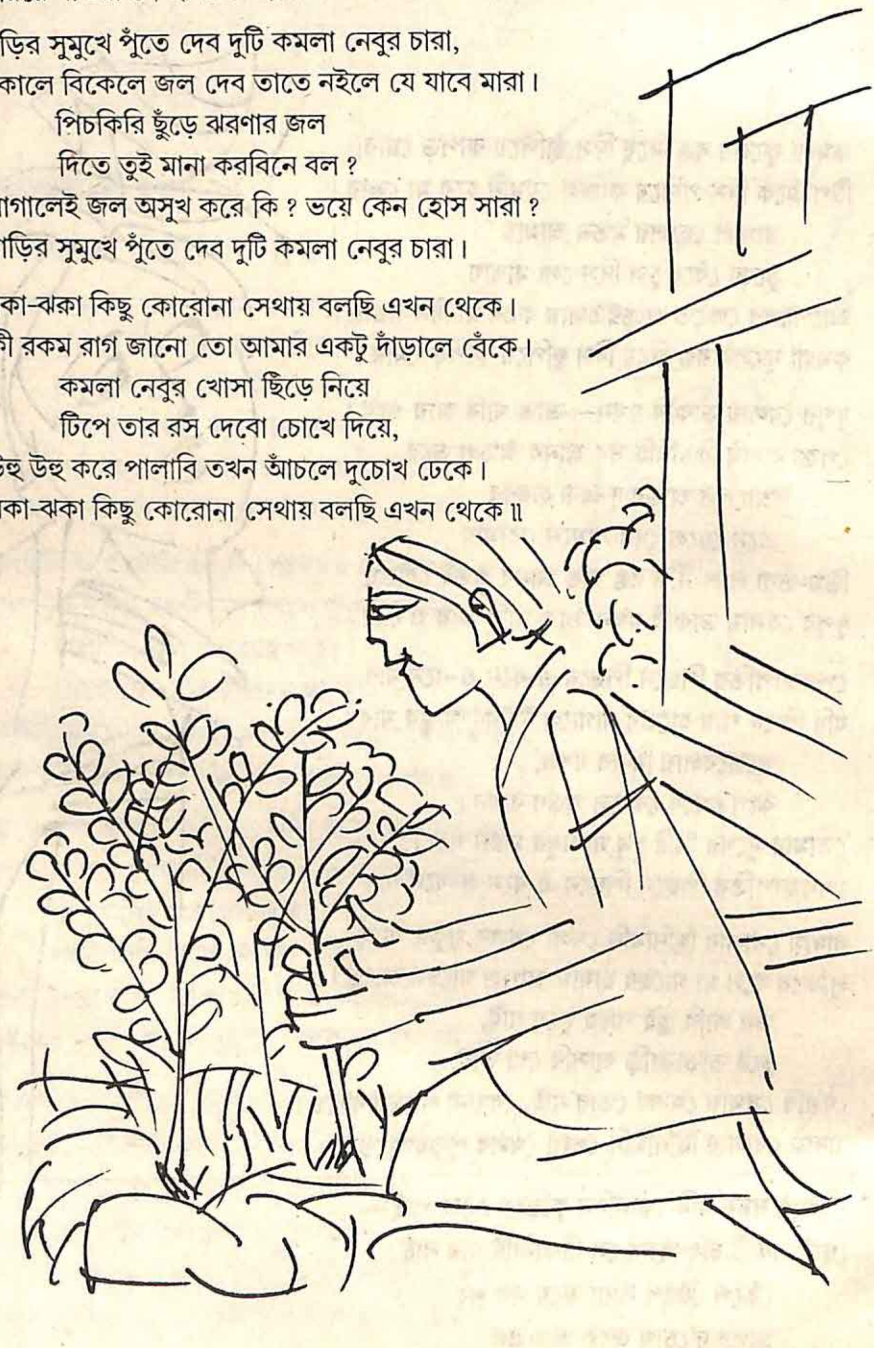
বাদাম খোলার ছিনিমিনি খেলা খেলব পুকুর পাড়ে,
লুকিয়ে বসে মা গাছের ছায়ায় আপল গাছের আড়ে।
ভয় পাবি তুই পাছে ডুবে যাই,
ছুটে তাড়াতাড়ি আসবি গো তাই,
দেখবি সেথায় খোকা তোর নাই; বেদানা গাছের ঝাড়ে।
বাদাম খোলার ছিনিমিনি খেলা খেলব পুকুরপাড়ে।

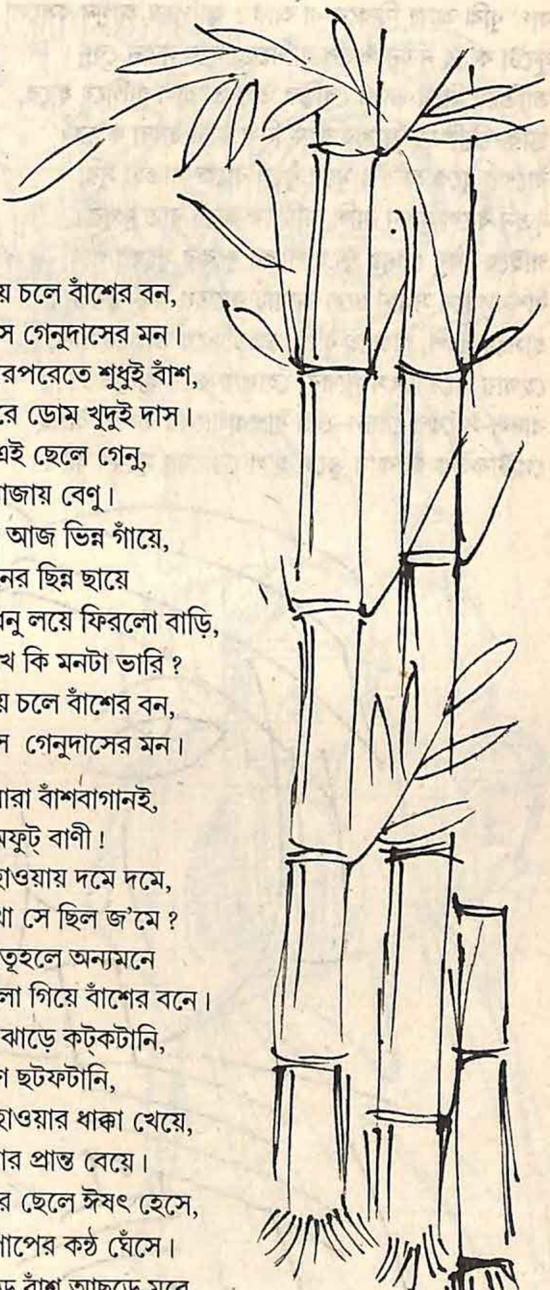
খেলার সময় যদি কোনদিন কুড়িয়ে হঠাৎ পাই—
ছোট্ট একটি হরিণছানা সে ঠিকানাটি যার নাই।
কেঁপে কেঁপে সারা ভয়ে থর থর
ডাগর দু'চোখ জলে ভর-ভর,

বলে যেন খোকা বলতে কি পার মা কোথা আমার ভাই ?
হারিয়ে যাওয়া সে হরিণের ছানা যদি কোনদিন পাই !

বাড়ির সুমুখে পুঁতে দেব দুটি কমলা নেবুর চারা,
সকালে বিকেলে জল দেব তাতে নইলে যে যাবে মারা।
পিচকিরি ছুঁড়ে ঝরণার জল
দিতে তুই মানা করবিনে বল ?
লাগালেই জল অসুখ করে কি ? ভয়ে কেন হোস সারা ?
বাড়ির সুমুখে পুঁতে দেব দুটি কমলা নেবুর চারা।

বকা-ঝকা কিছু কোরোনা সেথায় বলছি এখন থেকে।
কী রকম রাগ জানো তো আমার একটু দাঁড়ালে বেঁকে।
কমলা নেবুর খোসা ছিড়ে নিয়ে
টিপে তার রস দেবো চোখে দিয়ে,
উহু উহু করে পালাবি তখন আঁচলে দুচোখ ঢেকে।
বকা-ঝকা কিছু কোরোনা সেথায় বলছি এখন থেকে ॥





বাঁশির গল্প

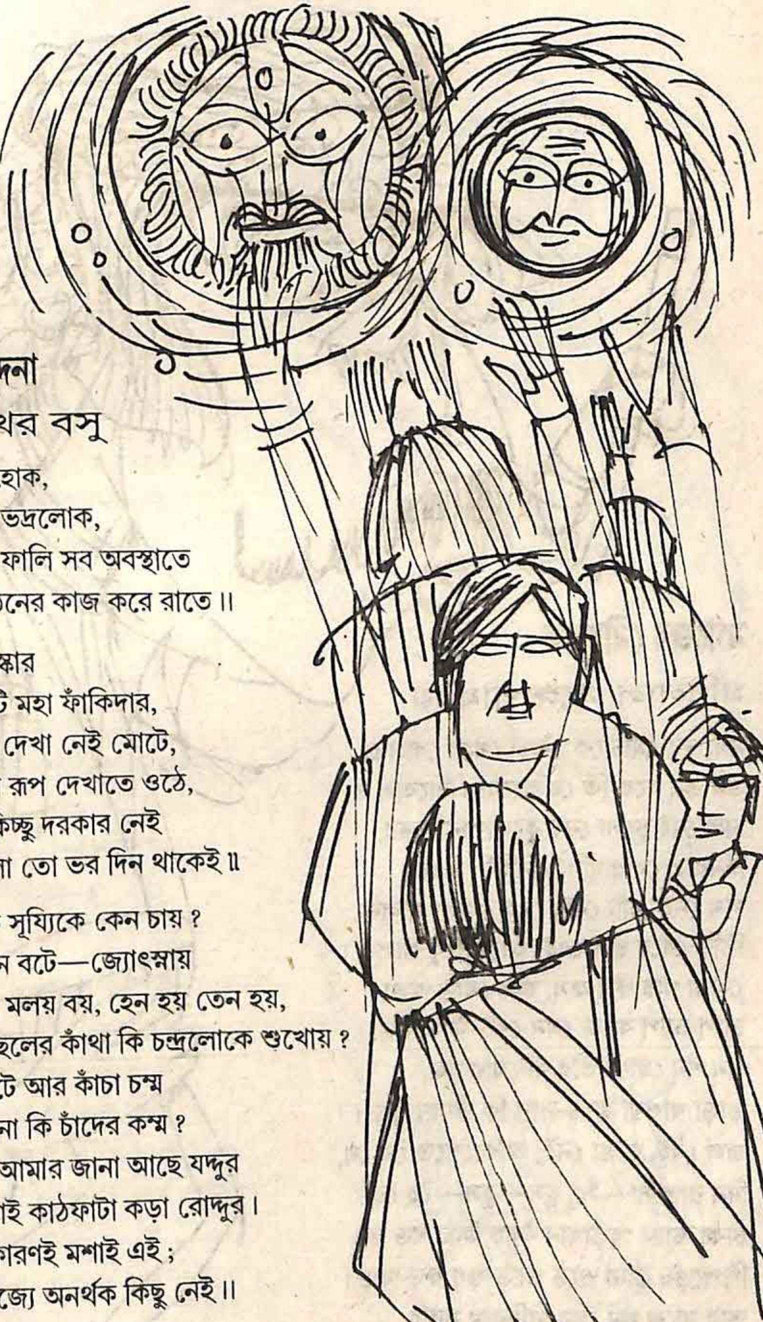
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বাদলা সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন,
কোল-আঁধারে দাওয়ায় বসে উদাস গেনুদাসের মন।
গাঁয়ের শেষে ডোমপাড়া, আর তারপরেতে শুধুই বাঁশ,
বাঁশ-বাগানে আঁধার তীরে বাস করে ডোম খুদুই দাস।
খুদুই দাসের কত সাধের মা-মরা এই ছেলে গেনু,
দিনমানে ধেনু চরায় রাত্তিরে সে বাজায় বেণু।
বাপ গিয়েছে চুবড়ি নিয়ে হাটবারে আজ ভিন্ন গাঁয়ে,
বাদল বেলা কাটিয়ে গেনু বেণু-বনের ছিন্ন ছায়ে
আষাঢ়-সাঁঝের আবছা আলোয় ধেনু লয়ে ফিরলো বাড়ি,
বাপ এখনো ফেরেনিকো, সেই দুখে কি মনটা ভারি ?
বাদলা-সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন,
কোল-আঁধারে দাওয়ায় বসে উদাস গেনুদাসের মন।

হঠাৎ যেন ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো সারা বাঁশবাগানই,
পরক্ষণেই ফুট্‌লো যেন যন্ত্রণারই অফুট্ বাণী !
হুম্ হুসিয়ে ফোঁপায় কেরে দমকা হাওয়ায় দমে দমে,
কট্‌কটিয়ে উঠছে ফেটে, কোন্ ব্যথা সে ছিল জ'মে ?
বাদলা-সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়ায় কৌতূহলে অন্যমনে
দা-হাতে সেই ডোমের ছেলে ঢুকলো গিয়ে বাঁশের বনে।
বাঁশের বনে দাঁড়িয়ে শোনে বাঁশের ঝাড়ে কট্‌কটানি,
পরস্পরে জড়িয়ে ধরে সে কী ভীষণ ছটফটানি,
কঞ্চি ছিঁড়ে আপ্‌সে পড়ে ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে,
টিপ্‌টিপিয়ে বাদল ঝরে ভিজে পাতার প্রান্ত বেয়ে।
আঁধার ক্রমে আসছে জ'মে, ডোমের ছেলে ঈষৎ হেসে,
কোপ্ লাগালে তলদা-ঝাড়ে লম্বা পাঁপের কণ্ঠ ঘেঁসে।
ঝোড়ো হাওয়ায় অন্ধকারে বাঁশঝাড়ে বাঁশ আছ্‌ড়ে মরে,
তলদা বাঁশের পাঁপটি হাতে ফিরলো গেনু আপন ঘরে।

বাপ, বুঝি আজ ফিরবে না আর ? জ্বালিয়ে আগুন বসলো গেনু,
ফুটো ক'রে নূতন পাঁপে বানিয়ে নেবে নূতন বেণু।
তাতিয়ে নিয়ে ভাঙা বেড়ির তপ্ত তাতাল বাগিয়ে ধ'রে,
ছ্যাঁক-ছেঁকিয়ে বাঁশের বুকে নিল ছ'টা ছ্যাঁদা ক'রে।
বাঁশের বুকে ক্ষত'র মুখে ফুঁয়ে বাজে সাতটা সুর,
নূতন বাঁশে নূতন বাঁশি বাজিয়ে কাটে রাত দুপুর।
গাইছে বেণু গেনুর ফুঁয়ে পরের বুকের সুখের গান,—
বাঁশবাগানে সমান চলে আষাঢ় রাতের ঝড়-তুফান্।
হাসছে বাঁশি, বাজছে বাঁশি, চড়চড়িয়ে ভাঙছে বাঁশ,
হেথায় ওঠে উৎস সুরের, হোথায় ওঠে হা-হুতাশ ;
বাদল-সাঁঝের বেদন-ভরা বাঁশবাগানের তলদা বাঁশই
গোটাকতক ছ্যাঁকায় ভুলে হ'ল ডোমের মুখের বাঁশি !





চন্দ্র সূর্য বন্দনা

রাজশেখর বসু

চাঁদের জয় হোক,
পরোপকারী ভদ্রলোক,
আস্ত খেঁদো ফালি সব অবস্থাতে
যথাসাধ্য লুণ্ঠনের কাজ করে রাতে ॥

সূয্যিকে নমস্কার
এই দেবতাটি মহা ফাঁকিদার,
চোপর রাত দেখা নেই মোটে,
দিনের বেলা রূপ দেখাতে ওঠে,
যখন তার কিচ্ছু দরকার নেই
আরে, আলো তো ভর দিন থাকেই ॥

তবে লোকে সূয্যিকে কেন চায় ?
কবিরা বলেন বটে—জ্যোৎস্নায়
ফুল ফোটে, মলয় বয়, হেন হয় তেন হয়,
কিন্তু কচি ছেলের কাঁথা কি চন্দ্রলোকে শুখোয় ?
আমসত্ত্ব, ঘুঁটে আর কাঁচা চম্ম
এ সব শুখনো কি চাঁদের কম্ম ?
আজ্ঞে না। আমার জানা আছে যদ্দুর
এর জন্যে চাই কাঠফাটা কড়া রোদ্দুর।
সূর্য-সৃষ্টির কারণই মশাই এই ;
বিধাতার রাজ্যে অনর্থক কিছু নেই ॥

অতএব গাও চাঁদের জয় সূয্যির জয়,
দুটোর একটিও ফেলবার নয় ॥



মগজের মৌচাকে

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মগজের মৌচাকে খোঁচা খেয়ে বোলতা
ভন্ ভন্ বকে কি যে আবোল তাবোল তা।
চাল নেই চুলো নেই কুলোপানা চক্কর,
দিনরাত ঘোরাঘুরি ছিনিমিনি ছক্কর!
পথ নেই, ঘাট নেই, নেই খোলা জাল্না,
সিঁড়ি বেয়ে ছাদ নেই, আছে শুধু আল্না।
ধোঁয়া খায় ফস্ ফস্, জল খেয়ে অক্কা
ঢ্যাপ্-ঢ্যাপ্ বাজে যেন পেট-ফাঁসা ঢক্কা।
শন্ শন্ ছোটে তীর ঘনঘোর যুদ্ধ,
তাড়া খাওয়া জাত-সাপ কি ভীষণ ক্রুদ্ধ।
জল নেই, ডাঙা নেই, আকাশেতে থৈ থৈ,
দিন রাত সাঁ—সাঁ, হুস্—হুস্—হৈ হৈ!
চাকা ভাঙা গাড়ীখান ক্যাচ্ ক্যাচ্ ঘড় ঘড়
পিঁপড়ের ডানা ওঠে ওড়ে শুধু ফড়-ফড়।
তার মাঝে ঘুম দেয় নিধিরাম সর্দার
শিরে তার শিরোপাটা বাঁধা ছিটে-পর্দার।



কন্যা শরৎ

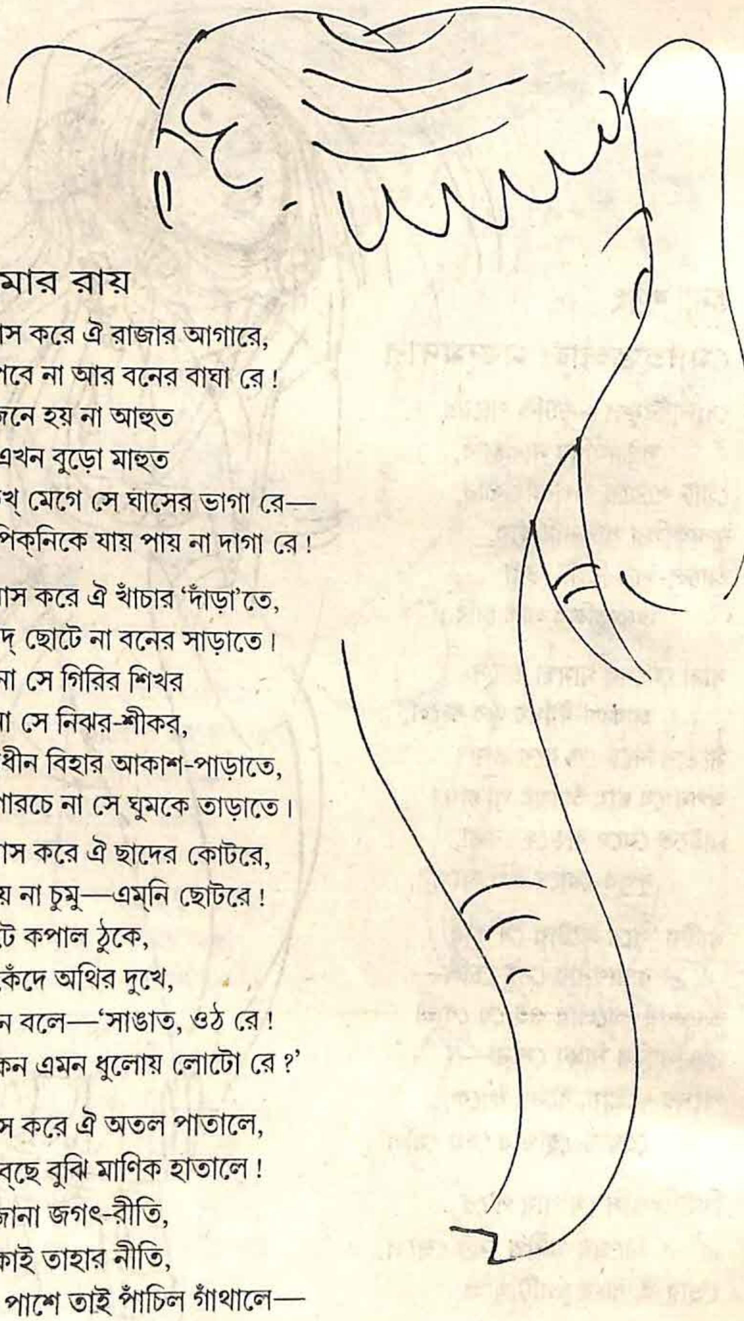
মোহিতলাল মজুমদার

দোপাটি ফুল—চুট্‌কি পায়ের
সন্ধ্যামণির নাকছাবি,
গোট পরেছে অপ্‌রাজিতার,
কুন্দকলির সাতনরী-হার,
আঁচল-খুঁটে রিংটি-ভরা
কৃষ্ণকলির লাখ চাবি।

সাদা মেঘের গামছা ভাসে
আকাশ-দীঘির ডুব-জলে,
সাঁতার দিয়ে কে ধরে তায়!
স্বপন যে ছায় আঁখির পাতায়!
নাইতে নেমে বাড়ছে বেলা,
দুপুর-রোদে রূপ জ্বলে!

মাটির 'পরে লুটোয় যে তার
বারাণসীর সেই চেলি—
আলোয়-কালোয় ওই যে বোনা
কল্কাখানির সাচ্চা সোনা—
পথের ধুলোয়, বনের ফাঁকে,
হেথায়-হোথায় দেয় মেলি'।

শিউলিগুলি খোঁপায় প'রে
সাঁজের প্রদীপ নেয় জ্বেলে,
ভোর-আঁধারে চুলটি খুলে
আবার সে সব দেয় ফেলে।



এক যে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

এক যে হাতী বাস করে ঐ রাজার আগারে,
তার সুমুখে কাঁপবে না আর বনের বাঘা রে!
বনভোজনে হয় না আহুত
দেব্‌তা এখন বুড়ো মাহুত
খায় সুখেতে ভিখ্ মেগে সে ঘাসের ভাগা রে—
পিক্‌নিকে যায় পায় না দাগা রে!

এক যে ঈগল বাস করে ঐ খাঁচার 'দাঁড়া'তে,
প্রভাতে তার নিদ্ ছোটে না বনের সাড়াতে।
দেখ্‌চে না সে গিরির শিখর
মাখ্‌ছে না সে নির্ঝর-শীকর,
করচে না সে স্বাধীন বিহার আকাশ-পাড়াতে,
পারচে না সে ঘুমকে তাড়াতে।

এক যে অশথ্ বাস করে ঐ ছাদের কোটরে,
মেঘের মুখে দেয় না চুমু—এম্‌নি ছোটরে!
মরচে ইঁটে কপাল ঠুকে,
কাত্‌রে কেঁদে অথির দুখে,
ঝড়ের রাজা যখন বলে—'সাঙাত, ওঠ রে!
কেন এমন ধুলোয় লোটো রে?'

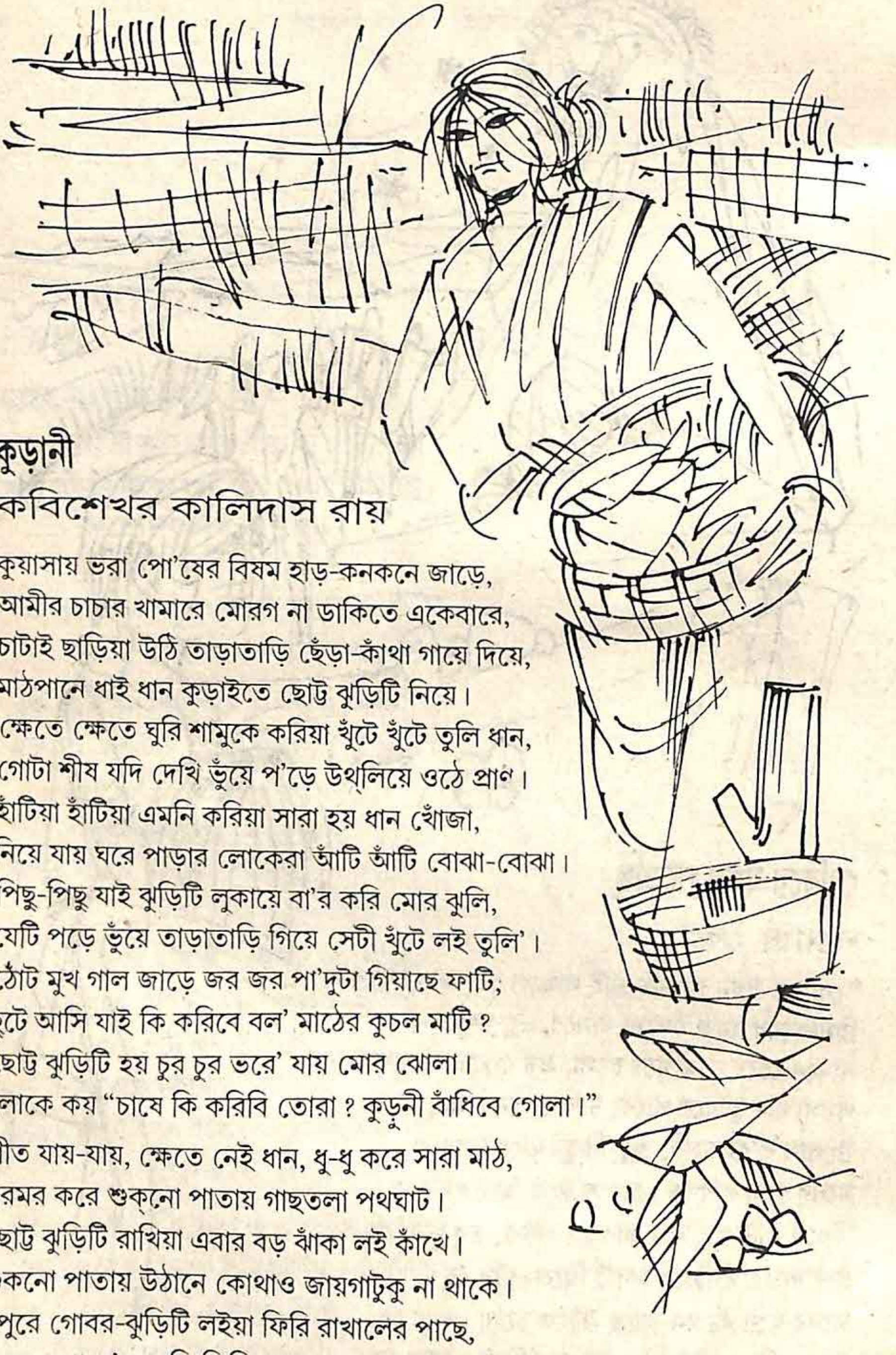
এক যে মানুষ বাস করে ঐ অতল পাতালে,
কাঁচ নিয়ে সে ভাব্‌ছে বুঝি মাণিক হাতালে!
নেইকো জানা জগৎ-রীতি,
কয়েদ থাকাই তাহার নীতি,
নিজের হাতে চার পাশে তাই পাঁচিল গাঁথালে—
আঁধার-নেশায় না-ছোড় মাতাল এ!



বেরিয়ে যখন পড়েছি

নরেন্দ্র দেব

"বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই থামলে তো আর চলবে না,
হিমালয়ের বরফ জেনো ঘামবে,তবু, গল্‌বে না।
সামনে চেয়ে—এগিয়ে চলো, ভয় পেয়ো না বাদ্‌লাতে;
পয়সা যদি ফুরিয়ে থাকে, চালিয়ে নেব আধ্‌লাতে।
উপোস ক'রে চল্‌ব, তবু, কিছুর ভয়ে টল্‌ব না,
মনের কথা লুকিয়ে রেখে শত্রুকে আর ছল্‌ব না।
বিঁধছে কাঁটা ? ফুট্‌ছে কাঁকর ? ফুটুক, তবু ছুট্‌ব হে,
ইন্দ্রদেবের স্বর্গটাকে সবাই মিলে লুট্‌ব হে।
চাঁদের ঘরে কী ধন আছে উট্‌কে চলো দেখ্‌ব রে,
ধাক্‌কা দিয়ে তারায় তারায় সূর্যে গিয়ে ঠেক্‌ব রে।"



কুড়ানী

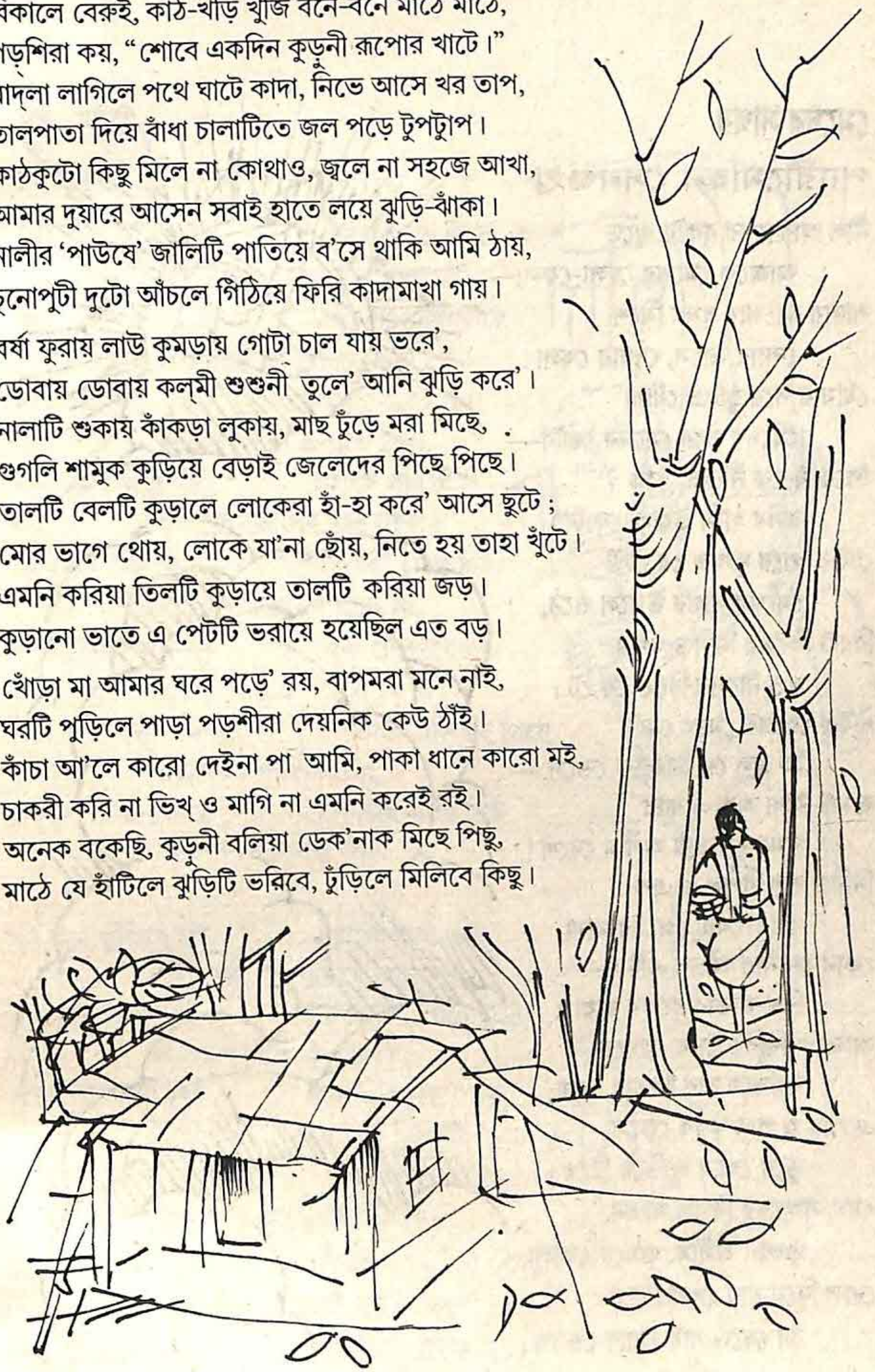
কবিশেখর কালিদাস রায়

কুয়াসায় ভরা পো'ষের বিষম হাড়-কনকনে জাড়ে,
আমীর চাচার খামারে মোরগ না ডাকিতে একেবারে,
চাটাই ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া-কাঁথা গায়ে দিয়ে,
মাঠপানে ধাই ধান কুড়াইতে ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে খুঁটে তুলি ধান,
গোটা শীষ যদি দেখি ভুঁয়ে প'ড়ে উথ্‌লিয়ে ওঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা আঁটি আঁটি বোঝা-বোঝা।
পিছু-পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি,
যেটি পড়ে ভুঁয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটী খুঁটে লই তুলি'।
ঠোঁট মুখ গাল জাড়ে জর জর পা'দুটা গিয়াছে ফাটি,
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল' মাঠের কুচল মাটি ?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুর চুর ভরে' যায় মোর ঝোলা।
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা ? কুড়ুনী বাঁধিবে গোলা।"
শীত যায়-যায়, ক্ষেতে নেই ধান, ধু-ধু করে সারা মাঠ,
মরমর করে শুক্‌নো পাতায় গাছতলা পথঘাট।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝাঁকা লই কাঁখে।
শুকনো পাতায় উঠানে কোথাও জায়গাটুকু না থাকে।
দুপুরে গোবর-ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা ক'য়ে ঘুরি-ফিরি গোরু বাছুরের কাছে কাছে।

বিকালে বেরুই, কাঠ-খড়ি খুঁজি বনে-বনে মাঠে মাঠে,
পড়শিরা কয়, "শোবে একদিন কুড়ুনী রূপোর খাটে।"
বাদ্‌লা লাগিলে পথে ঘাটে কাদা, নিভে আসে খর তাপ,
তালপাতা দিয়ে বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটুাপ।
কাঠকুটো কিছু মিলে না কোথাও, জ্বলে না সহজে আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি-ঝাঁকা।
নালীর 'পাউষে' জালিটি পাতিয়ে ব'সে থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুটী দুটো আঁচলে গিঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।

বর্ষা ফুরায় লাউ কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে',
ডোবায় ডোবায় কল্‌মী শুশুনী তুলে' আনি ঝুড়ি করে'।
নালাটি শুকায় কাঁকড়া লুকায়, মাছ টুঁড়ে মরা মিছে,
গুগলি শামুক কুড়িয়ে বেড়াই জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ-হা করে' আসে ছুটে ;
মোর ভাগে থোয়, লোকে যা'না ছোঁয়, নিতে হয় তাহা খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়।
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছিল এত বড়।

খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে' রয়, বাপমরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া পড়শীরা দেয়নিক কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আ'লে কারো দেইনা পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
চাকরী করি না ভিখ্ ও মাগি না এমনি করেই রই।
অনেক বকেছি, কুড়ুনী বলিয়া ডেক'নাক মিছে পিছু,
মাঠে যে হাঁটিলে ঝুড়িটি ভরিবে, টুঁড়িলে মিলিবে কিছু।



মেঘের সাগর

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নীল আকাশের বুকটা জুড়ে
আজকে মেঘের হেলা-ফেলা—
শাদায় কালোয় ধুসর মিশে
দেদার ভাসে, দেদার খেলা!
ধোঁয়ার পরে ছুটছে ধোঁয়া
মেঘের পরে মেঘের ছোটা—
ফাঁকে ফাঁকে নীলের বুকে
রবির হাসি উজল-ফোটা।
ঢেউর 'পরে দুলছে রে ঢেউ
মেঘের সাগর উথ্‌লে ওঠে,
বিরাট কিসের নিবিড় স্বপন
সুপ্ত নীলের চিত্তে ফোটে।
নাইক রে ঠাঁই মেঘে মেঘে
কি এল রে আজকে ভেসে,—
জমাট-বাঁধা অশ্রু এ কার
থমকে দাঁড়ায় অসীম দেশে!
নিবিড় শুধু বিপুল এ এক
ভুবন-ঘেরা স্নেহের মায়া,
কোন্ জননীর আঁচল এটি ?—
বিশ্ব-মাতার বুকের ছায়া ?
আজকে নিবিড় মেঘ-সাগরে
ঝাঁপিয়ে যাব সাঁতার দিয়ে,
এ পার ও পার করব ভেসে
ডুবে হেসে জুড়িয়ে হিয়ে।
মেঘ-সাগরের বিপুল মাতন,
তুফান অসীম, গুমরে ফোলা,
দোল দিয়ে যায় দেদার বুকে
ঘর ছেড়ে যায় পরাণ ভোলা।



দুই বেয়াই

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়



বেয়াই বাড়িতে এসে হুঁকো হাতে নিয়ে, কেশে
একদিন 'ত' বলে, 'ক'-দাদা গো,
আয় নেই একেবারে প্রাণ ধরে বাখিবারে
ঘটি-বাটি পড়ে গেছে বাঁধা গো।
নিজ তরে নাই দুখ এখন গেলেই সুখ
ছেলে-বৌ নাতি-পুতি রইল,
ওরা সুখে খায়-দায় এইটুকু প্রাণ চায়
মোদের তো সব কিছু সইল।
নাতিটির বায়নায় ঘরে ট্যাকা হোল দায়,
নাতনীর কান্না যে থামে না,
জামাইয়ের আপনার জ্বর, টেম্পারেচার
একশ' পাঁচের কমে নামে না।
তাই ভাবি হোল কি এ! তাড়াতাড়ি হই গিয়ে
বেয়ায়ের শরণ-আপন্ন,
নেহাৎ বরাত জোরে পেয়েছি এমন বেই
ঘরে যার ধরেনাক অন্ন।

'ক' কহে তুলিয়ে হাই দুঃখের কথা ভাই
কারে কই, কে বুঝিবে অন্যে?
ধান চাল টাকা কড়ি ছিল সবই, গেছে উড়ি
বিদেয় করিতে ঐ কন্যে।
এখন তো পেট চলা দায় ভাই, দুই বেলা,
টাকা কোথা? ঘরে নেই সিকিটি,
ধারে মাথা ডুবে আছে মহাজনদের কাছে
বাঁধা পড়ে আছে এই টিকিটি।
তাই আজ বাসি-মুখে পাঁজি খুলে, দিন দেখে
যেতেছিনু তোমারই কাছে তো,
বিধি দিলে আক্কেল, দিয়েছিনু গোঁফে তেল
কাঁটাল ছিল না হায় গাছে তো!



বেদে

কৃষ্ণধন দে

দড়ি-দড়া-ঝুড়ি-টিন-বাঁশ-তাবু পেটরায়,
ডুগডুগি-খঞ্জনি-ঢোলকের ঢেঁটরায়,
বন-মানুষের হাড়, মরা শকুনের দাঁত,
সাদা বাদুড়ের ডানা, শাঁখামুটি-বিষদাঁত,
শ্মশানের পোড়ামাটি, শিকড়ের ঝুলি আর,—
পথে পথে চলে ওরা নিয়ে বেদে-সংসার ;
দল বেঁধে থাকে সব, যেথা যার প্রাণ চায়,
মেয়েগুলো ঘোরে ফেরে রঙদার ঘাগরায়।
কুকুর ছাগল হাঁস মুরগীও সাথী তাই,
বাঁকে ঝোলে হাঁড়িকুঁড়ি, তাঁবু গাড়ে সব ঠাঁই।
ঝাড়ফুঁক তুকতাক জানে ভানুমতী খেল্,
আছে কুমীরের দাঁত, ধনাই পাখির তেল,
হাত দেখে বলে দেয়—কোথা যশ, অপযশ,—
মনের মানুষ টানে শিকড়েতে করি বশ ;
ঘরভাঙা, ঘরবাঁধা, মারণ ও উচাটন,
সবকিছু জানে ওরা যখন যা প্রয়োজন ;
ট্যারা-চোখো বুড়ো বেদে, ঝানু বুড়ী বউ তার,
মিটিমিটি হাসে শুধু খুকখুক কাশে আর !
মেঘ-কালো আকাশের নীচে বসে গালে হাত
ঘুমহারা চোখে বুড়ো কি যে ভাবে সারারাত,
কত গ্রাম দেখেছে সে, কত গিরি, নদীপথ,
কত বন, কত মরু, সাগরের সৈকত ;
জানে না সে পথচলা কবে তার হবে শেষ,
মরণের শেষ-ঘুমে ডেকে নেবে কোন্ দেশ !
যে মাটিতে কিছুদিন ওরা এসে বাঁধে ঘর,
সে মাটির মায়া যেন ভরে থাকে অন্তর।
তবু ছেড়ে যেতে হবে, যাযাবর ওরা, তাই—
চলা-পথে দেখে নেবে পৃথিবীর শেষটাই !



আমি জানি আর খুকু জানে

কৃষ্ণদয়াল বসু

তারারা কী করে কানাকানি,
চাঁদ কেন চায় মুখপানে,—
খুকু জানে আর আমি জানি,
আমি জানি আর খুকু জানে।

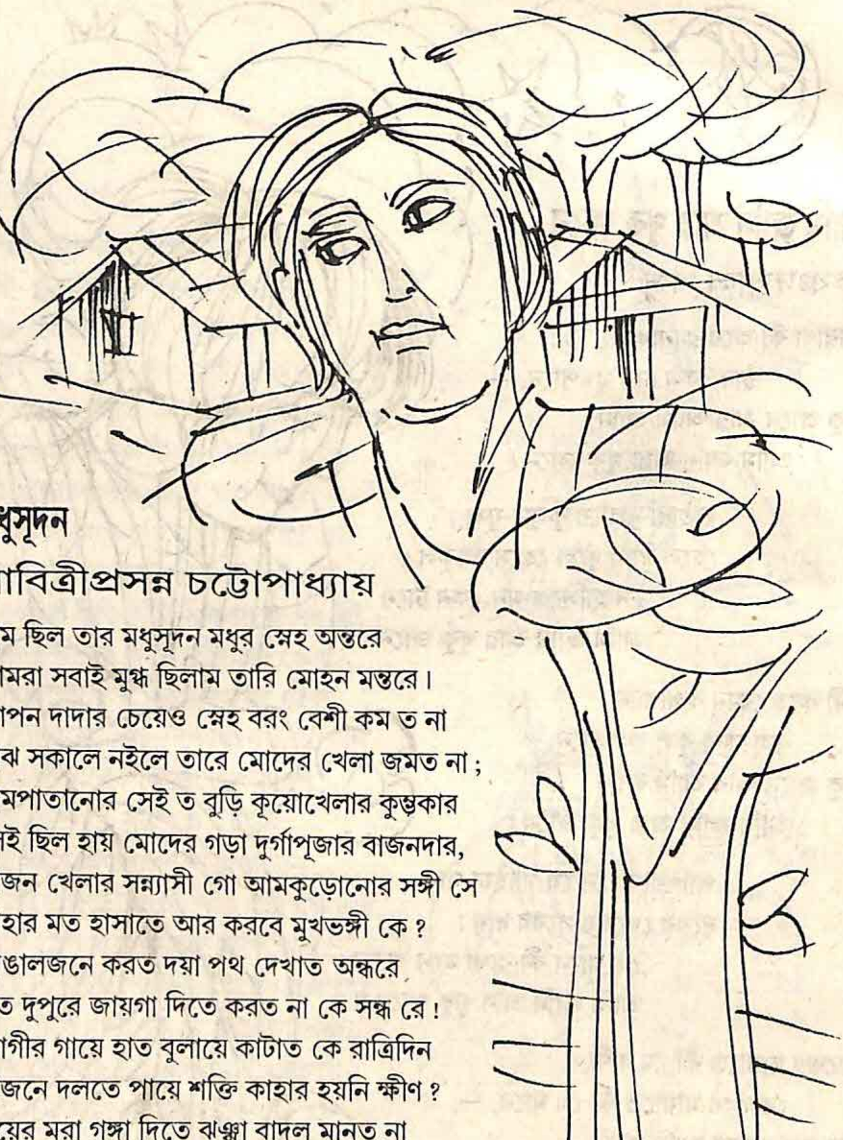
লতারা দুলায়ে কুসুম-ফুল
হেলে দুলে দুলে হেসে আকুল।
সে হাসিতে মন কেন টানে
আমি জানি আর খুকু জানে।।

নদী কহে কোন্ কথাখানি
কুলু-কুলু-কুলু কলতানে,—
খুকু জানে আর আমি জানি
আমি জানি আর খুকু জানে।

পাখিরা আনে যে গাহিয়া গান
দূরের দেশের সুরের দান।
সে গানে কী ব্যথা মনে আনে
আমি জানি আর খুকু জানে।।

সাঁঝের ছায়াতে কী যে বাণী,
ভোরের মায়াতে কী যে মানে,—
খুকু জানে আর আমি জানি
আমি জানি আর খুকু জানে।

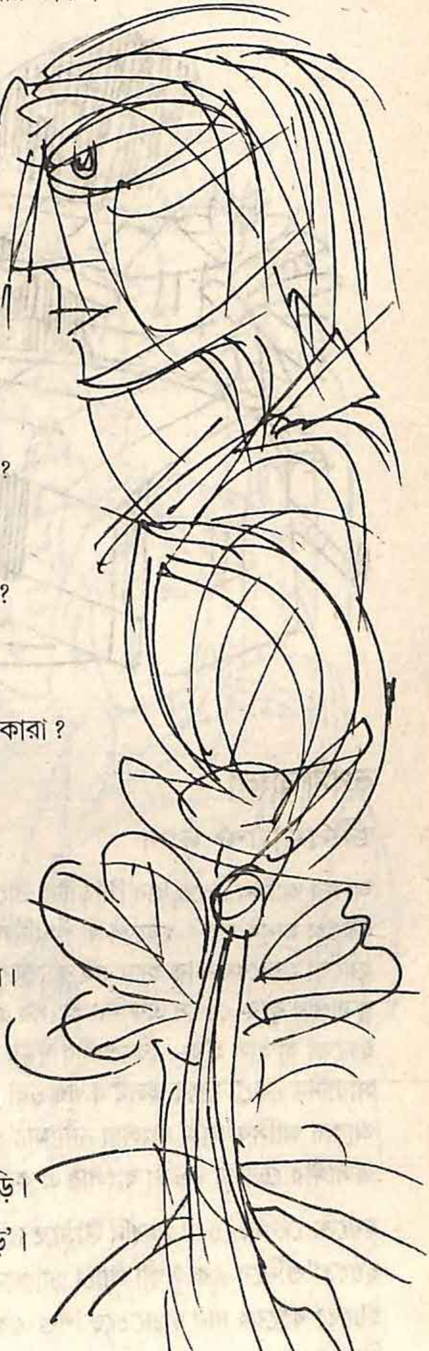
মেঘে মেঘে লুকোচুরি খেলা
জেগে জেগে দেখি সারাবেলা।
বাঁশিখানি কার বাজে প্রাণে
আমি জানি আর খুকু জানে।।



মধুসূদন

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নাম ছিল তার মধুসূদন মধুর স্নেহ অন্তরে
আমরা সবাই মুগ্ধ ছিলাম তারি মোহন মন্তরে।
আপন দাদার চেয়েও স্নেহ বরং বেশী কম ত না
সাঁঝ সকালে নইলে তারে মোদের খেলা জমত না ;
নামপাতানোর সেই ত বুড়ি কূয়োখেলার কুম্ভকার
সেই ছিল হায় মোদের গড়া দুর্গাপূজার বাজনদার,
গাজন খেলার সন্ন্যাসী গো আমকুড়োনোর সঙ্গী সে
তাহার মত হাসাতে আর করবে মুখভঙ্গী কে ?
কাঙালজনে করত দয়া পথ দেখাত অন্ধরে,
রাত দুপুরে জায়গা দিতে করত না কে সন্ধ রে !
রোগীর গায়ে হাত বুলায়ে কাটাত কে রাত্রিদিন
দুষ্টজনে দলতে পায়ে শক্তি কাহার হয়নি ক্ষীণ ?
গাঁয়ের মরা গঙ্গা দিতে ঝঞ্ঝা বাদল মানত না
পরের কাজে ধন্য হোত, বলতে 'না' সে জানত না ;
উৎসবে সে হাজির আছে দায় বিপদে বন্ধু সার,
আনন্দে সে আনন্দময় ঝরত দুখে নয়ন তার !
তোষামোদি জানত না সে তবু মধুর গৌরবে
মোদের পল্লী পূর্ণ ছিল মুগ্ধ গুণ-সৌরভে।



কিশোর

কাজী নজরুল ইসলাম

ওরে ও কিশোর-প্রাণ!
কোন্ যৌবন-রঙ্গীন দেশে আজি তোর অভিযান?
ঘনাইল চোখে কিসের স্বপন,
অলখ-লোকের ইশারা গোপন
নেহারি' কখন্ বাহিরিলি পথে, শুনি কার আহ্বান?
ওরে ও কিশোর প্রাণ!

ওরে ও ঝর্ণাধারা!
কোন্ সাগরের ডাক শুনি' আজ ভাঙিলি পাষাণ-কারা?
উপলে নুড়িতে চপল দু'-পায়ে
উর্মি-ছন্দে নূপুর বাজায়ে
নদ-নদী-পথ অনুসরি' যাস ছুটিয়া বাঁধন-হারা,
ওরে ও ঝর্ণাধারা!

ওরে ও উষার লালী!
তোরি রঙে ঐ রাঙিয়া উঠিল গভীর রাতের কালি।
জানালি খবর তরুণ আশার
অনাগত নব অরুণ আসার,
ঘুম-ঘরে তুই বাজাইলি তোর বিহগের করতালি।
ওরে ও উষার লালী!

ওরে ও অফুট কুঁড়ি!
কুসুম-গন্ধ রেখেছে বনানী তোরি সে তবকে মুড়ি'।
তোরি তরে ভাই—জানি মোরা জানি
ভ্রমরে কাননে এত কানাকানি,
তোরি তরে বধূ সাজি আনে, জাগে দেবতা দেউল জুড়ি'!
ওরে ও অফুট কুঁড়ি!

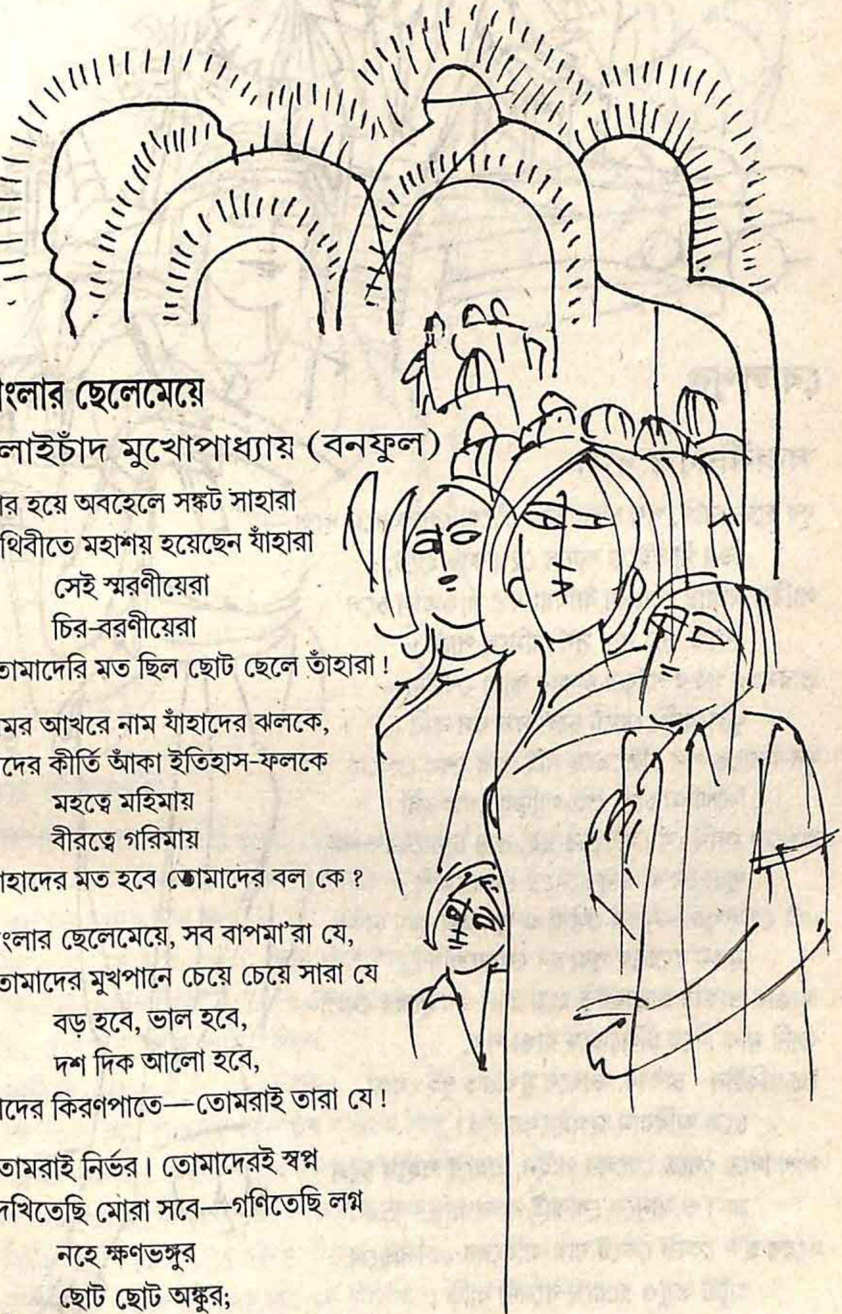


রূপসী বাংলা

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্ত্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়,
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে,
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ করুণ সবুজ ডাঙায়।

হয়তো দেখিব চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মী প্যাঁচা ডাকিতেছে শিমূলের ডালে
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিব ধবল বক ঃ আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভীড়ে—



বাংলার ছেলেমেয়ে

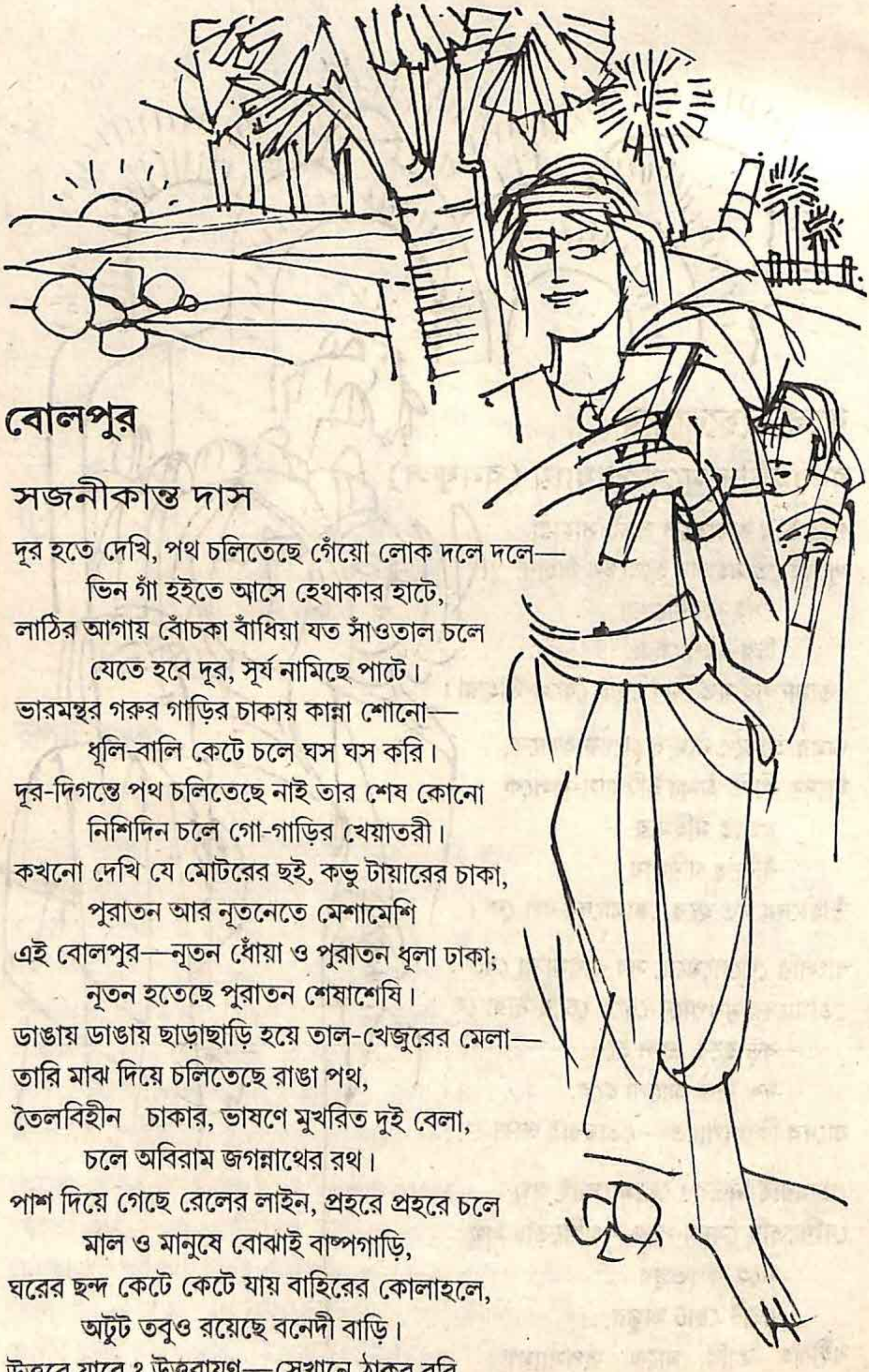
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

পার হয়ে অবহেলে সঙ্কট সাহারা
পৃথিবীতে মহাশয় হয়েছেন যাঁহারা
সেই স্মরণীয়েরা
চির-বরণীয়েরা
তোমাদেরি মত ছিল ছোট ছেলে তাঁহারা!

অমর আখরে নাম যাঁহাদের ঝলকে,
যাঁদের কীর্তি আঁকা ইতিহাস-ফলকে
মহত্বে মহিমায়
বীরত্বে গরিমায়
তাঁহাদের মত হবে তোমাদের বল কে?

বাংলার ছেলেমেয়ে, সব বাপমা'রা যে,
তোমাদের মুখপানে চেয়ে চেয়ে সারা যে
বড় হবে, ভাল হবে,
দশ দিক আলো হবে,
যাদের কিরণপাতে—তোমরাই তারা যে!

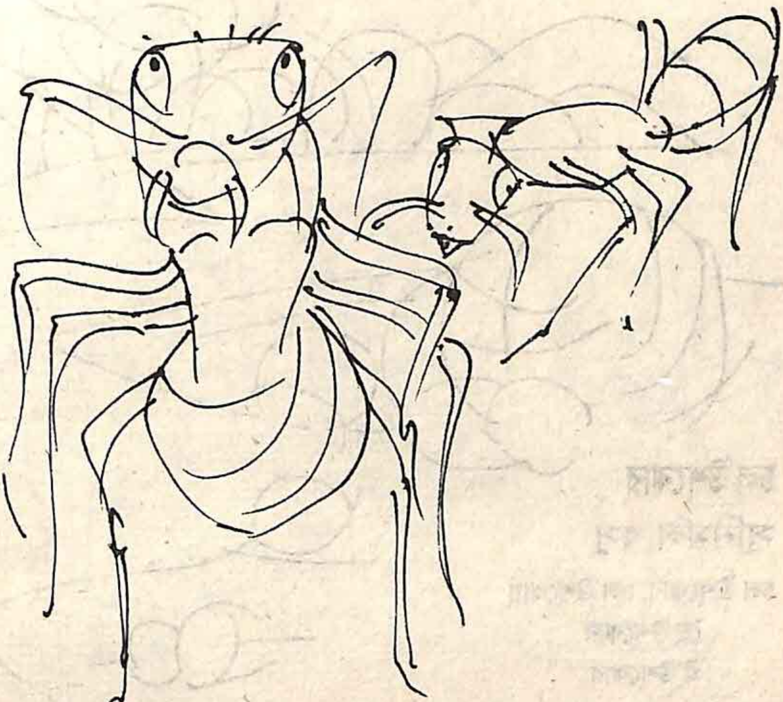
তোমরাই নির্ভর। তোমাদেরই স্বপ্ন
দেখিতেছি মোরা সবে—গণিতেছি লগ্ন
নহে ক্ষণভঙ্গুর
ছোট ছোট অঙ্কুর;
মহীরুহ তারি মাঝে তপস্যামগ্ন!



বোলপুর

সজনীকান্ত দাস

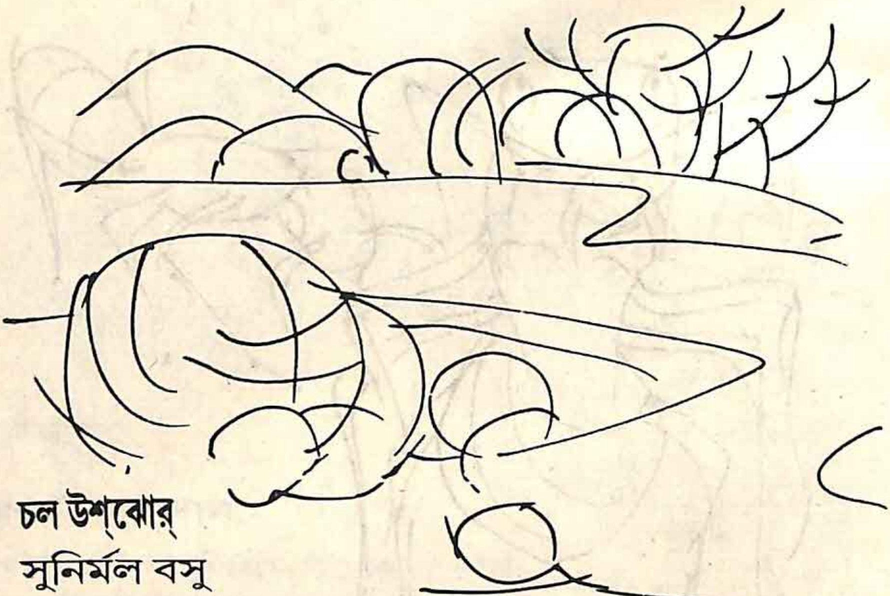
দূর হতে দেখি, পথ চলিতেছে গেঁয়ো লোক দলে দলে—
ভিন গাঁ হইতে আসে হেথাকার হাটে,
লাঠির আগায় বোঁচকা বাঁধিয়া যত সাঁওতাল চলে
যেতে হবে দূর, সূর্য নামিছে পাটে।
ভারমন্থর গরুর গাড়ির চাকায় কান্না শোনো—
ধূলি-বালি কেটে চলে ঘস ঘস করি।
দূর-দিগন্তে পথ চলিতেছে নাই তার শেষ কোনো
নিশিদিন চলে গো-গাড়ির খেয়াতরী।
কখনো দেখি যে মোটরের হুই, কভু টায়ারের চাকা,
পুরাতন আর নূতনেতে মেশামেশি
এই বোলপুর—নূতন ধোঁয়া ও পুরাতন ধূলা ঢাকা;
নূতন হতেছে পুরাতন শেষাশেষি।
ডাঙায় ডাঙায় ছাড়াছাড়ি হয়ে তাল-খেজুরের মেলা—
তারি মাঝ দিয়ে চলিতেছে রাঙা পথ,
তৈলবিহীন চাকার, ভাষণে মুখরিত দুই বেলা,
চলে অবিরাম জগন্নাথের রথ।
পাশ দিয়ে গেছে রেলের লাইন, প্রহরে প্রহরে চলে
মাল ও মানুষে বোঝাই বাষ্পগাড়ি,
ঘরের ছন্দ কেটে কেটে যায় বাহিরের কোলাহলে,
অটুট তবুও রয়েছে বনেদী বাড়ি।
উত্তরে যাবে ? উত্তরায়ণ—সেখানে ঠাকুর রবি...



পিঁপড়ে

অমিয় চক্রবর্তী

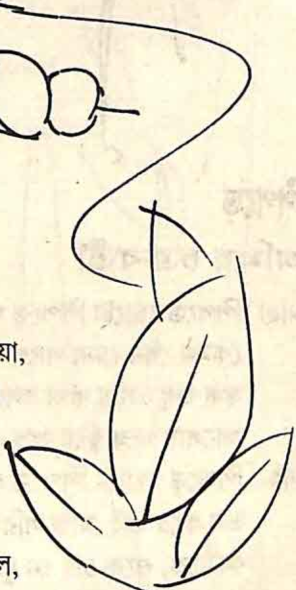
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক।
ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাই নে দুঃখ নিতে।
কে জানে প্রাণ আনলো কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ায় ভোরে কোথায় চলে নিচু—
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দু-দিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে।



চল উশ্‌ঝোর্

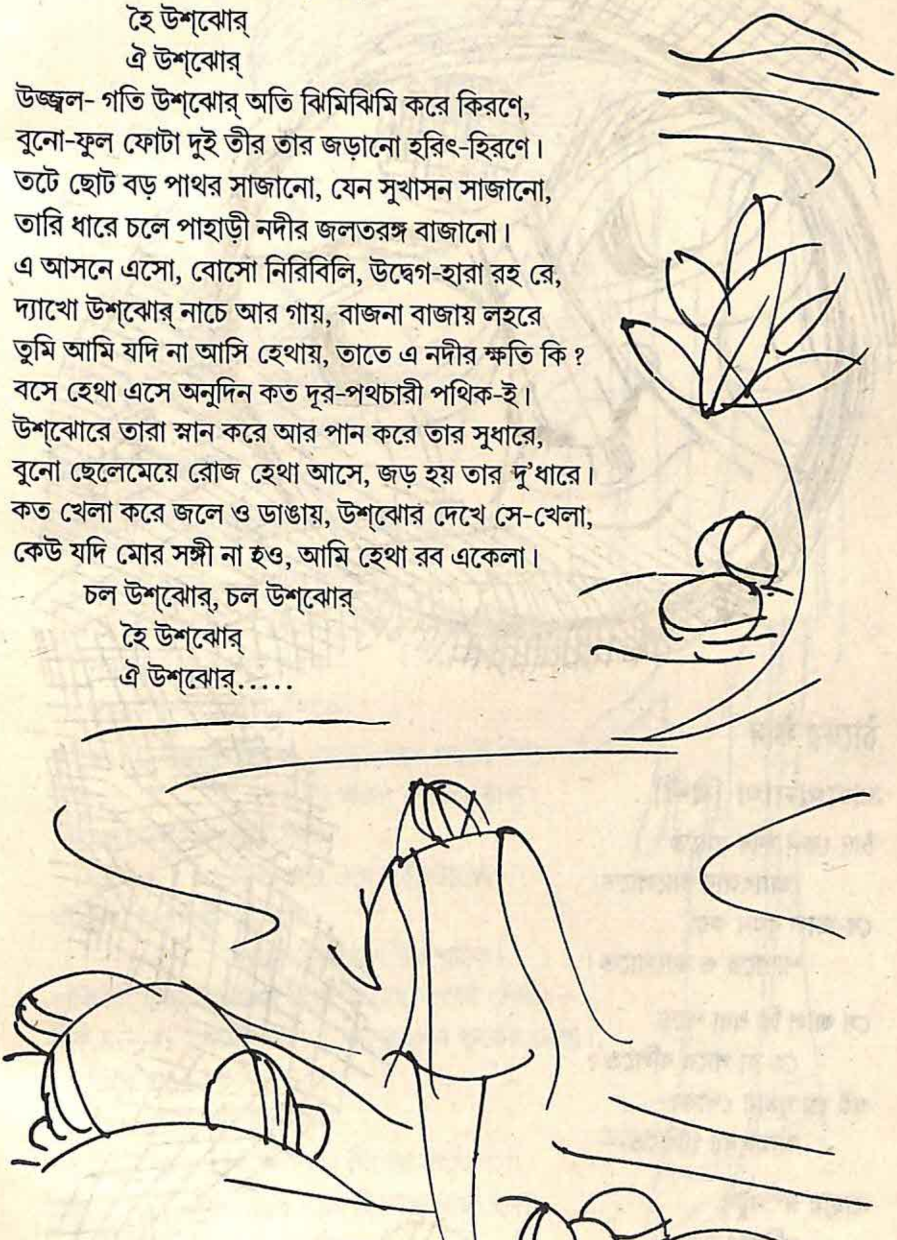
সুনির্মল বসু

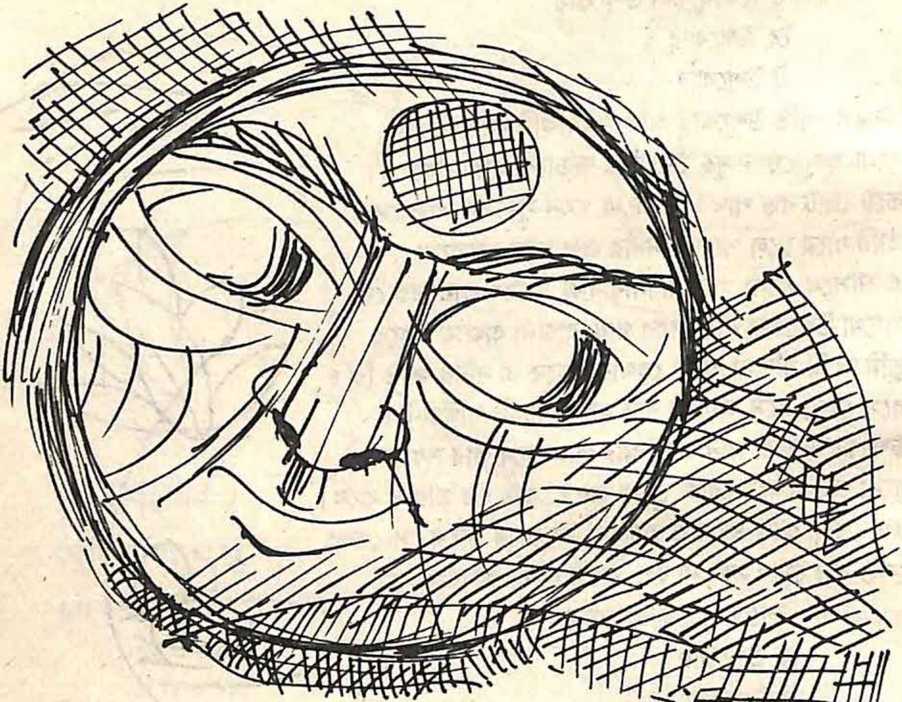
চল উশ্‌ঝোর্, চল উশ্‌ঝোর্
হৈ উশ্‌ঝোর
ঐ উশ্‌ঝোর্



উশ্‌ঝোর্ সেই ছোট বাঁকা নদী সাঁওতাল-পরগণাতে
নেচে নেচে চলে পাহাড়ী-দুলালী পল্লীর বন-কোণাতে;
শুনেছি যে তার চপল ছন্দ উপল-ঘুঙুর চরণে,
দেখেছি যে তার মোহনীয় রূপ. বালির ওড়্‌না পরনে,
ভেবেছি কেবলি তটে বসে তার,—কার পানে চলে নাচিয়া,
কুলকুলু তালে 'উলু উলু' ধ্বনি বারে বারে ওঠে বাজিয়া।
চল উশঝোর্, চল উশ্‌ঝোর্
হৈ উশ্‌ঝোর্
ঐ উশ্‌ঝোর্
সাঁওতাল ছেলে ঝাঁপতাল তোলে ডিমি ডিমি ডিমি মাদলে,
ঝিমি ঝিমি ঝিমি সুর ঝরে পড়ে ক্ষণিক ভাদর-বাদলে।
বুনো মেয়ে আসে এপাশে ওপাশে তোফা জবা শোভে খোঁপাতে
জল ভরে আর গান করে তারা, আমি বসে দেখি তফাতে।
হরিয়াল ডাকে বনের আড়ালে, মেঘ উড়ে যায় বাতাসে,
জাগে রবি-কর, কাঁপে থর্‌থর্ শাল-পিয়ালের পাতা সে।

চল উশ্‌ঝোর্, চল উশ্‌ঝোর্
হৈ উশ্‌ঝোর্
ঐ উশ্‌ঝোর্
উজ্জ্বল- গতি উশ্‌ঝোর্ অতি ঝিমিঝিমি করে কিরণে,
বুনো-ফুল ফোটা দুই তীর তার জড়ানো হরিৎ-হিরণে।
তটে ছোট বড় পাথর সাজানো, যেন সুখাসন সাজানো,
তারি ধারে চলে পাহাড়ী নদীর জলতরঙ্গ বাজানো।
এ আসনে এসো, বোসো নিরিবিলি, উদ্বেগ-হারা রহ রে,
দ্যাখো উশ্‌ঝোর্ নাচে আর গায়, বাজনা বাজায় লহরে
তুমি আমি যদি না আসি হেথায়, তাতে এ নদীর ক্ষতি কি ?
বসে হেথা এসে অনুদিন কত দূর-পথচারী পথিক-ই।
উশ্‌ঝোরে তারা স্নান করে আর পান করে তার সুধারে,
বুনো ছেলেমেয়ে রোজ হেথা আসে, জড় হয় তার দু'ধারে।
কত খেলা করে জলে ও ডাঙায়, উশ্‌ঝোর দেখে সে-খেলা,
কেউ যদি মোর সঙ্গী না হও, আমি হেথা রব একেলা।
চল উশ্‌ঝোর্, চল উশ্‌ঝোর্
হৈ উশ্‌ঝোর্
ঐ উশ্‌ঝোর্.....





চাঁদের ফাঁদ

প্রমথনাথ বিশী



চাঁদ কেন ফাঁদ পাতে
জ্যোৎস্নার আলোতে,
যে-জাল বয়ন করা
শাদাতে ও কালোতে।

সে জাল কি ধরা পড়ে
কে বা পারে বলিতে ?
ওই যে ঘুমায় খোকা
আমাদের গলিতে—

তাহার স্বপনটুকু
ধরিবার তরে,
চাঁদ পাতে ফাঁদখানি
এই চরাচরে ॥

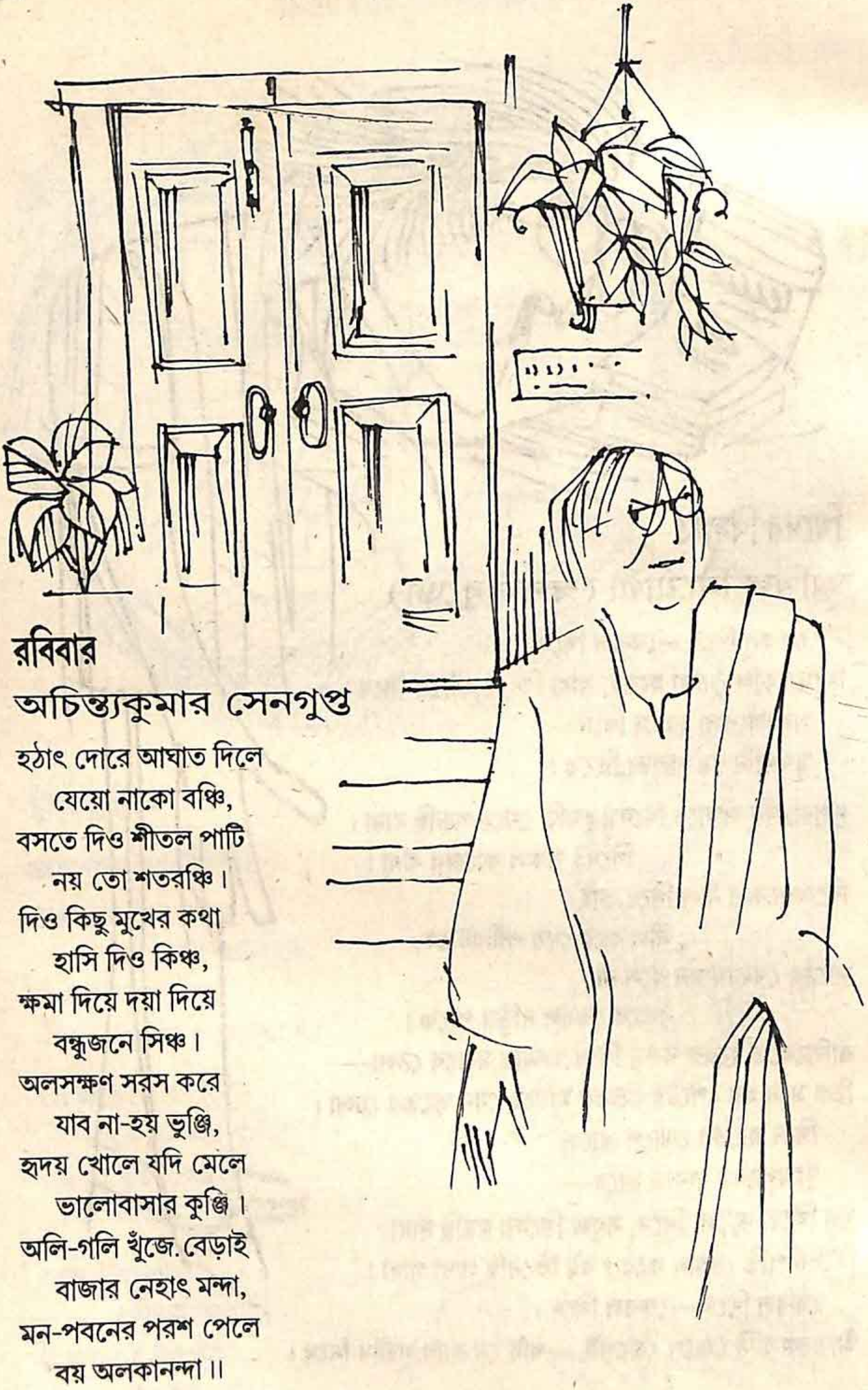


খিদের খিদমত

অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

কেবল খিদে—কেবল খিদে!
খিদেয় চলি কুঁজো হয়েই, সাধ্য কি রে হই যে সিধে!
সকালবেলা হলদে খিদে—
মুখখানি রয় পলতা তিতে!

দুপুরবেলা লালচে খিদেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ছি দাদা!
খিদেই সকল কাজের বাধা!
বিকেলবেলা নীল খিদে ভাই
নীল করে দেয় শরীরটাকে,
মাঠের খেলায় মন বসে না
বাঁধবে কেবল দড়ির পাকে!
রাত্তিরেতে হরেক রকম খিদে আমায় মারবে ঠেলা—
ঠিক মনে হয় পেটের ভেতর মারছে যেন ভূতের ঢেলা!
খিদে রাতের ঝোপে ঝাড়ে
দুঃস্বপনের দাবড়ি মারে—
ঘন খিদে, কালো খিদে, সবুজ খিদেয় মরছি দাদা
খিদেয় পড়ি কেমন করে? বই কিনেছি গাদা গাদা!
কেবল খিদে—কেবল খিদে!
আঁতকে উঠি জেগে জেগেই,—খাই যে খাবি গভীর নিদে!



রবিবার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হঠাৎ দোরে আঘাত দিলে
যেয়ো নাকো বঞ্চি,
বসতে দিও শীতল পাটি
নয় তো শতরঞ্চি।
দিও কিছু মুখের কথা
হাসি দিও কিঞ্চ,
ক্ষমা দিয়ে দয়া দিয়ে
বন্ধুজনে সিঞ্চ।
অলসক্ষণ সরস করে
যাব না-হয় ভুঞ্জি,
হৃদয় খোলে যদি মেলে
ভালোবাসার কুঞ্জি।
অলি-গলি খুঁজে বেড়াই
বাজার নেহাৎ মন্দা,
মন-পবনের পরশ পেলে
বয় অলকানন্দা॥

খুকু ও খোকা

অন্নদাশঙ্কর রায়



তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো !
তার বেলা ?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি !
তার বেলা ?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিসঘর
চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি
পিওন পুলিশ প্রোফেসর !
তার বেলা ?

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির লুট !
তার বেলা ?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো !
তার বেলা ?

জোনাকিরা

প্রেমেন্দ্র মিত্র



রাতের জোনাকিগুলো চরায় কারা
সারা রাত ভরে কারা দেয় পাহারা!
জোনাকির ঝাঁক সব চরায় কারা!

তাদের রাখাল বুঝি ছোট্ট পরী
মাঠের আঁধারে ছোটে ফড়িঙে চড়ি!
জোনাকি চরায় বুঝি ছোট্ট পরী!

রাখালের মতো তারা কোথাও বসে,
বাজায় না মেঠো বাঁশী শুয়ে আলসে?
রাখালের মতো তারা আলসে বসে?

পরী-রাখালের গান কি হিজিবিজি!
তাদের বাঁশির সুর রাতের ঝিঁঝি!
মানে নেই সে গানের, কী হিজিবিজি!

জোনাকি হারালে তারা কি করে ডাকে?
—জোনাকির ফাঁক সব শাসনে রাখে?
জোনাকি হারিয়ে গেলে কি দিয়ে ডাকে?

আলেয়ার আলো বুঝি তখন জ্বালে!
তাড়া খেয়ে জোনাকিরা ফিরলে পালে,
আলেয়ার আলো বুঝি তাইতে জ্বালে?

ঝাঁক নিয়ে কোথা যায় ভোরের বেলা?
কোথায় তাদের বসে দিনের মেলা?
জোনাকিরা কোথা যায় ভোরের বেলা?

তারারা যেখানে যায় সেই আকাশে
জোনাকির মেঘ-পুরী শূন্যে ভাসে?
—জোনাকির মৌচাক সেই আকাশে?

কিম্বা হয়তো তারা রাতের শেষে
প্রজাপতি হয়ে যায় নতুন বেশে!
প্রজাপতি হয় তারা রাতের শেষে!

ঘুম তারা একেবারে জানে না নাকি?
দিনে প্রজাপতি তারা রাতে জোনাকি!
খেলা ছাড়া ঘুম তারা জানে না নাকি?

জোনাক পোকা

রাধারাণী দেবী

শোন্ শোন্ শোন্ সন্তু খোকা,
কাগজী লেবুর ঝাঁকড়া ঝোপে
টিপ্ টিপ্ টিপ্ জ্বলছে পোকা।
ঐ দেখ্, নিভেই জ্বলে!
জোনাক্ পোকা ওকেই বলে।

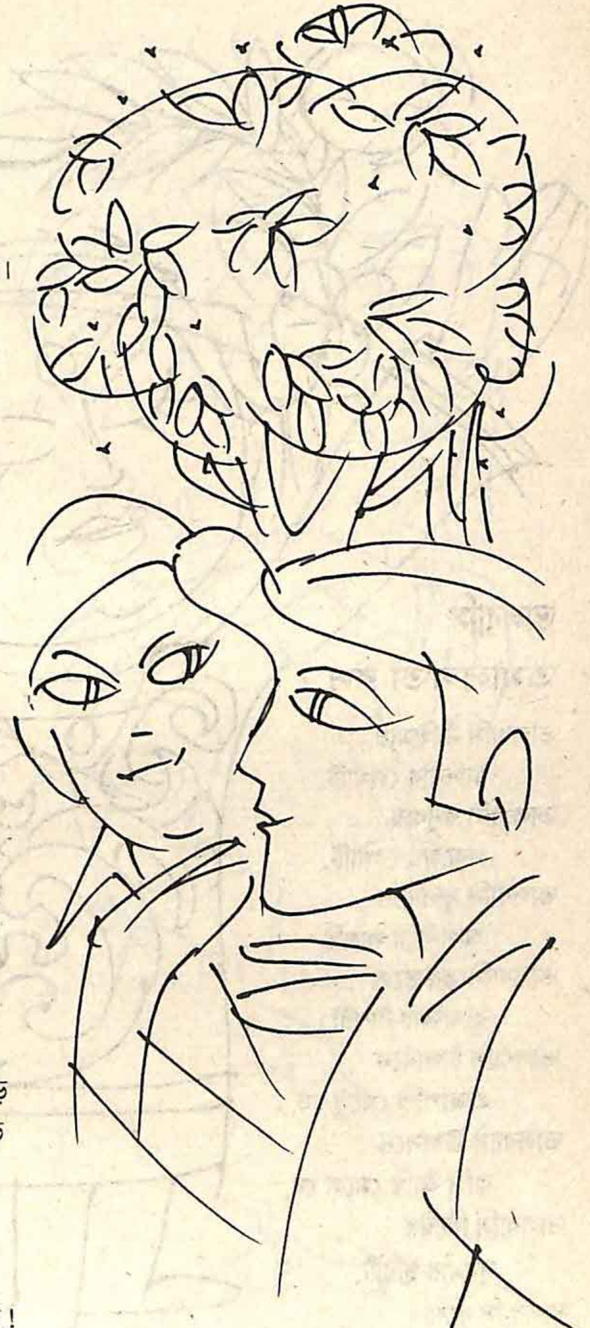
চুপ কর্ না ঝোটন মামা!
চেঁচিয়ে কথা একটু থামা।
ঠানদি সেদিন বল্লে—"জানিস্,
আমার কথা সত্যি মানিস।
জোনাক্ পোকা মন্ত্র জানে।
সব কথা পায় শুনতে কানে।"
ফিসফিসিয়ে বলচি, চুপ!
ধরতে পারে অনেক রূপ!
পিটপিটে ঐ নীল জোনাকী!
মিটমিটে ডান ওরাই নাকি!

এখন তবে বলছি খুলে!
দিনের আলোয় যাস্‌নে ভুলে।

সকাল হলে এই জোনাকী
কিচির মিচির ডাকবে পাখী
বর্ষা এলেই সাজবে ব্যাঙ
গাইবে এরাই গ্যাঙোর গ্যাঙ!

এমন কি শোন—হাওয়ায় উড়ে
জোনাক্ পোকাই আকাশ জুড়ে
স্থির হয়ে রয় ফুলের পারা।
আমরা ভাবি, স্বর্গতারা।

জোনাক্ পোকা ঠিক চিনেছি
আলেয়া ভূতের বাচ্চা ভাই!
সাঁচ্চা আলোর কাঁচ্চাও নেই
চম্‌কে বেড়ায় রাত্রে তাই।





ভালবাসি

তমাললতা বসু

ভালবাসি নীলিমায়
চাঁদিনীর লেখাটি,
ভালবাসি বসুধায়
সবুজের রেখাটি,
ভালবাসি ফুলদলে
আপনারে পাশরি—
ভালবাসি তরুতলে
রাখালের বাঁশরী।
ভালবাসি চাঁপাবনে
প্রজাপতি খেলে যে,
ভালবাসি ঊষাসনে
কলি আঁখি মেলে যে,
ভালবাসি বিশ্বের
সুষমার ছবিটি,
ভালবাসি দৃশ্যের
অতীত যে কবিটি।

স্বপ্নলোকে

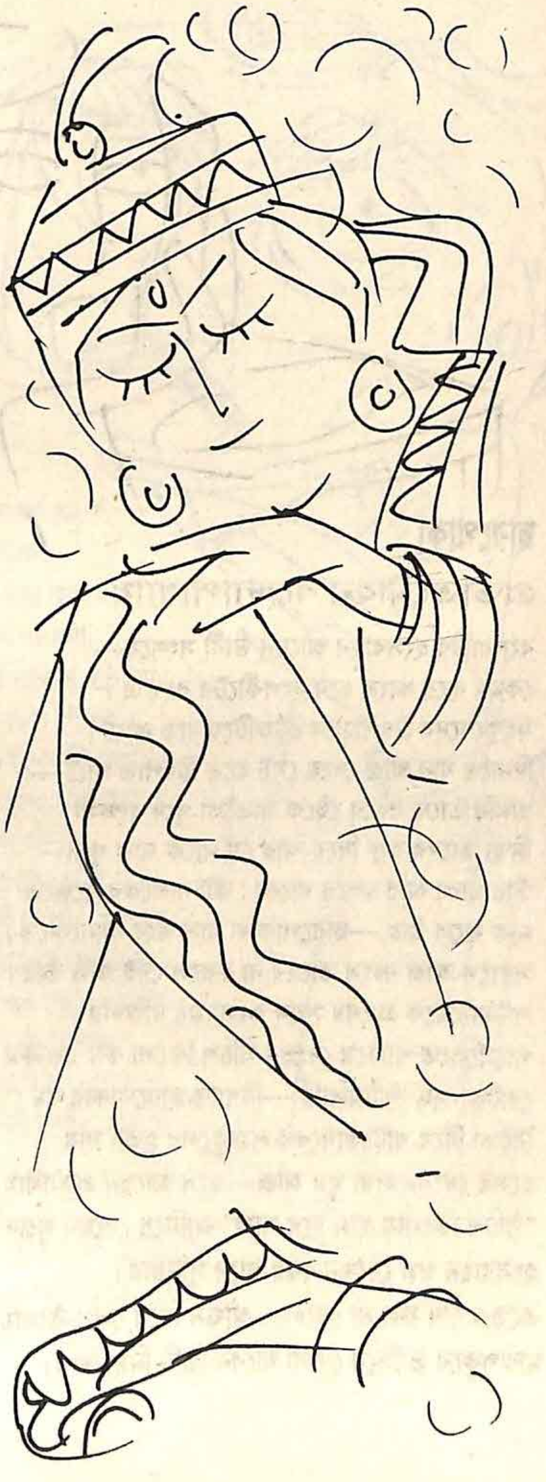
হরেন ঘটক

স্বপ্নে তুমি হ'তেই পারো
এই পৃথিবীর রাজা,
খুশি মত করতে পারো
হাজার আইন জারি;
অকারণেই নিজের হাতে
সৎ-কে দিয়ে সাজা,
চোরকে পারো সুযোগ দিতে
গড়তে জমিদারী।

স্বপ্নে তুমিই দিতেই পারো
ভূতের দেশে হানা,
ঢাল তলোয়ার বাগিয়ে নিয়ে
পক্ষীরাজের পিঠে ;
তোমার হাতে বাঁচার আশায়
সকল দত্যি-দানা
ভয়ের চোটেই ছেড়ে যাবে
সাত-পুরুষের ভিটে।

স্বপ্নে তুমি দিতেই পারো
সপ্ত-সাগর পাড়ি।
ছেলেবেলায় কাঠের ঘোড়ায়
পাখির ডানা জুড়ে;
নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে
রাবণরাজার বাড়ি,
প্রচুর সোনা আনতে পারো
তোমার পকেট পুরে।

স্বপ্নলোকের নিয়ম কানুন
নেই কো ধরা বাঁধা;
এই পৃথিবীর সাথে মোটেই
মিল কিছু নেই তার;
রঙিন স্বপন ভাঙলে পরে
লাগবে চোখে ধাঁধা!
মর্তলোকের চতুর্দিকেই
শুনবে হাহাকার!



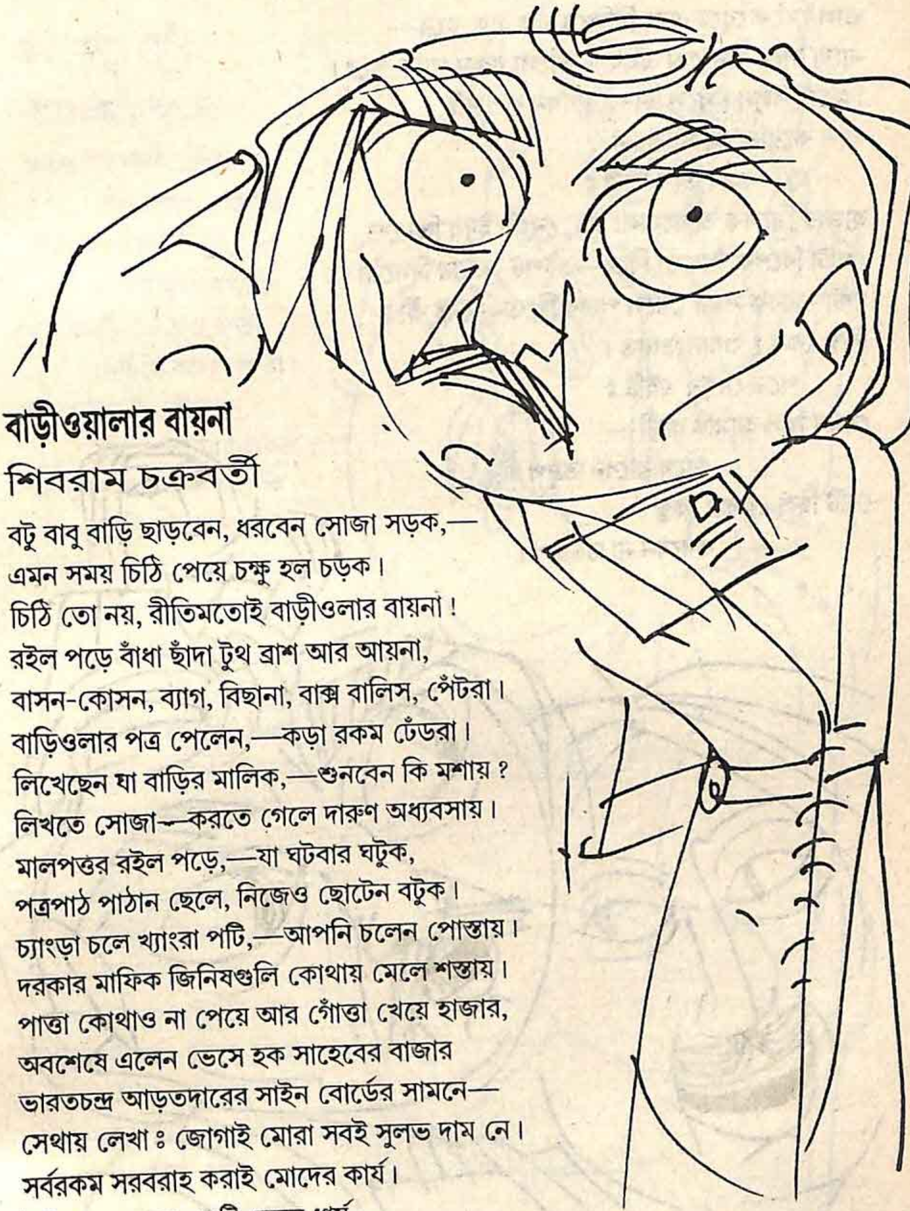


ছারপোকা

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়



বংশবাটীর হংসবাহন আছেন ভারী সংশয়ে—
কেমন করে ধ্বংস হবে দংশকীটের বংশ এ ?
মৎকুণেদের উৎপীড়নে ছট্‌ফটিয়ে রাত কাটে।
দিনান্তে যান শ্রান্ত দেহে যেই হতে চিৎপাত খাটে—
অমনি তাঁকে ধরবে ছেঁকে সাতশো খুদে রাক্ষসী
নিত্য তাদের রক্ত দিয়ে আর যে থাকে থাক খুশী—
তাঁর থাকা আর চলছে নাকো। কীটনাশকের গন্ধেতে
নাক জ্বলে তাঁর,—ছারপোকারা বাস করে আনন্দেতে।
সবংশে আজ ধ্বংস তাদের না করলে নেই স্বস্তি তাঁর।
পাটনা থেকে প্রাণের সুহৃদ্ কংসদমন দস্তিদার
পার্সেলেতে পাঠিয়ে দেছেন পঁচিশ কিলো কম-সে-কম
বোট্‌কা-গন্ধ 'খাটমলারি'—বিখ্যাত ছারপোকার যম।
টাট্‌কা বিষে খাটতোষকের শত্রুকুলের হত্যা সায়
হলেই দেবেন লম্বা ঘুম আজ—হংস আছেন প্রত্যাশায়।
"পঁচিশ কিলোয় গ্রাম হবে সাফ" জানিয়ে দেছেন সুহৃদ তাঁর।
হংসবাহন স্বপ্ন দেখেন বছর-বাদে সুনিদ্রার।
এতেও যদি ফল না মেলে—আগুন দিয়ে লেপ-কাঁথায়—
মাঝপুকুরে ভাসিয়ে ভেলা যাবেন তিনি নিদ্রা তায়।

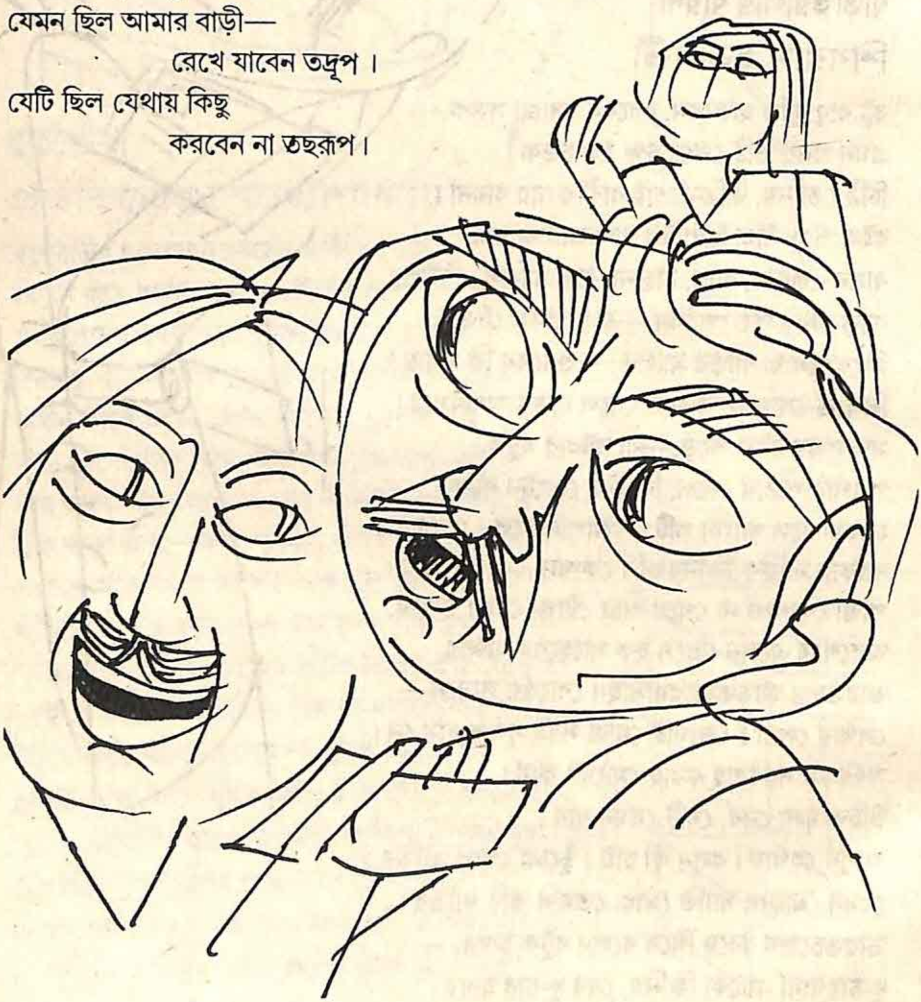


বাড়ীওয়ালার বায়না

শিবরাম চক্রবর্তী

বটু বাবু বাড়ি ছাড়বেন, ধরবেন সোজা সড়ক,—
এমন সময় চিঠি পেয়ে চক্ষু হল চড়ক।
চিঠি তো নয়, রীতিমতোই বাড়ীওলার বায়না !
রইল পড়ে বাঁধা ছাঁদা টুথ ব্রাশ আর আয়না,
বাসন-কোসন, ব্যাগ, বিছানা, বাক্স বালিস, পেঁটরা।
বাড়িওলার পত্র পেলেন,—কড়া রকম ঢেঁডরা।
লিখেছেন যা বাড়ির মালিক,—শুনবেন কি মশায় ?
লিখতে সোজা—করতে গেলে দারুণ অধ্যবসায়।
মালপত্তর রইল পড়ে,—যা ঘটবার ঘটুক,
পত্রপাঠ পাঠান ছেলে, নিজেও ছোটেন বটুক।
চ্যাংড়া চলে খ্যাংরা পটি,—আপনি চলেন পোস্তায়।
দরকার মাফিক জিনিষগুলি কোথায় মেলে শস্তায়।
পাত্তা কোথাও না পেয়ে আর গোঁত্তা খেয়ে হাজার,
অবশেষে এলেন ভেসে হক সাহেবের বাজার
ভারতচন্দ্র আড়তদারের সাইন বোর্ডের সামনে—
সেথায় লেখা ঃ জোগাই মোরা সবই সুলভ দাম নে।
সর্বরকম সরবরাহ করাই মোদের কার্য।
উচিত মূল্য নেব, যেটি যেমন ধার্য ;
আসুন হেথায়। বলুন কী চাই ? ছুঁচের থেকে হাতির ?
যেমন মোদের খ্যাতি মোরা তেমনি করি খাতির।
ভারতচন্দ্রের কাছে গিয়ে বলেন বটুক চন্দর,—
দু-চারখানা নয়কো জিনিষ, নেব দু-চার হন্দর।

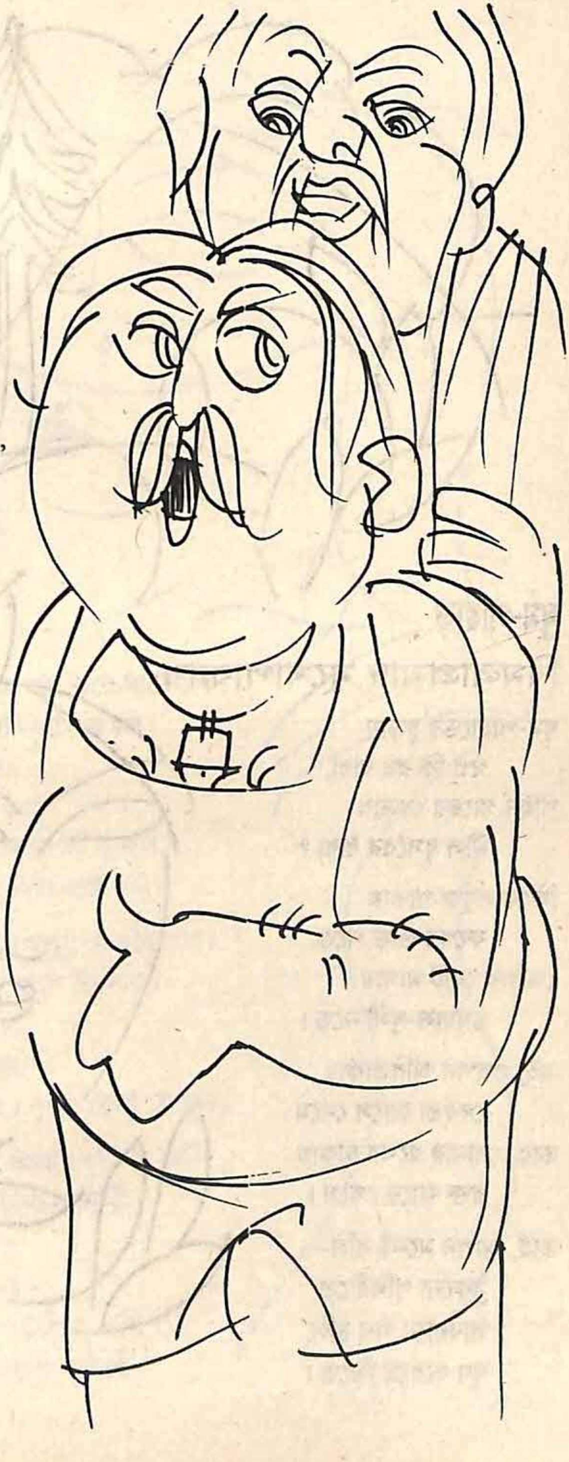
ভাল দেখে বেছে এবং মিলিয়ে এক এক করে—
ন্যায্য দামে দিন তো এসব—ভালো রকম প্যাক করে।
কি চাই বলুন ? বলে ভারত। যখন কৃপাদৃষ্টি
লাভ করেছি, আজ্ঞা করুন।
ধরুন তবে লিষ্টি ঃ
হাজার ত্রিশেক আরসোলা চাই, নেংটি ইঁদুর তিনশো,
গোটা বিশেক কাঁকড়া বিছে—চটপট আমায় দিনতো !
ঘণ্টা খানেক সময় পেলে পারব দিতে—নেই কী ?
কিন্তু কেন ? শুধান ভারত।
পড়ে দেখুন এইটি ঃ
যেমন ছিল আমার বাড়ী—
রেখে যাবেন তদ্রূপ।
যেটি ছিল যেথায় কিছু
করবেন না তছরূপ।

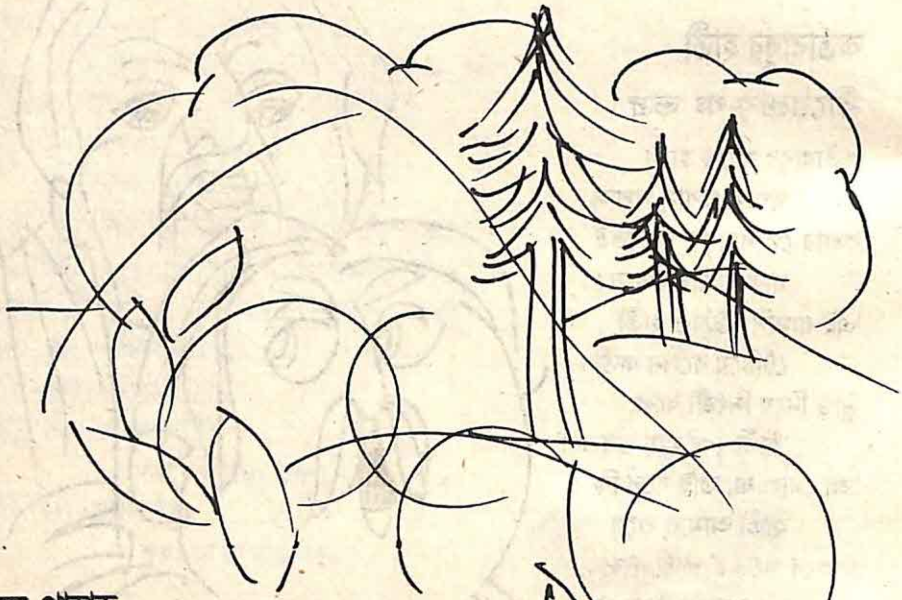


কর্তাবাবুর হাতী

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

কর্তাবাবুর যাচ্ছে হাতী
থপাস্ থপাস্ থপাস্
কলার খোসায় পা পড়তেই
মাঝ রাস্তায় ধপাস !
'এই রামসিং উঠাও হাতী'
চেঁচিয়ে বলেন কর্তা।
ভুঁড়ি নিয়ে সিংজী বলে,
'হাঁথী কো ম্যয় ডর্‌তা !'
'আ মোল যা, তাই বলে কি
হাতী আমার শুয়ে
থাকবে পড়ে ?' কর্তা বলেন,
'ঐখানেতে ভুঁয়ে ?'
সকাল সন্ধে দিস্তে দিস্তে
খাচ্ছ রুটি সেঁটে,
সে-সবগুলো যাচ্ছে কোথায়,
থাকছে নাকো পেটে ?
ভুঁড়ির বহর তিন মণ-টাক,
কুস্তি অত কর,
বাচ্চা হাতী তুলতে এখন
কাঁপছ থরথর !
শুঁড় ধরছি নিজে আমি,
লেজের দিকটা ধরে,
উস্‌কো উঠাও, দৌড়ে গিয়ে
হেঁইও মারি করে !'
এই কায়দায় উঠল হাতী
অর্ধেকটা শেষে
পিছলে আবার শুয়ে পড়ল
রামসিংকে ঠেসে।
হাতী কোলে মাটির ওপর
রামসিং দুম্ পটাস
সঙ্গে সঙ্গে ধুম্বো ভুঁড়ি
ভটাং করে ফটাস !





ঘুম-পাহাড়

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



ঘুম-পাহাড়ের চূড়ায়
স্বপ্ন কি রয় বাঁধা,
পাইন গাছের বেড়ায়
নীল ধূসরের ধাঁধা ?

ফিকে সবুজ পাতায়
ফগের গুঁড়ি পড়ে,
ডেজির ছোট মাথায়
খেয়াল-খুসী নড়ে।

এই, গোপন অধিত্যকায়
দেব্‌তা আসে নেমে
তার, সোনার রথের চাকায়
রক্ত আছে থেমে।

তাই, আপন মনেই বলি—
ঠুকনো পৃথিবীতে
সাবধানে পথ চলি,
ঘুণ ধরেছে ভিতে।



মেঘনা

হুমায়ুন কবির

শোন্ মা আমিনা, রেখে দে রে কাজ ত্বরা করে মাঠে চল্ ;
এল মেঘনায় জোয়ারের বেলা এখনি নামিবে ঢল্।
নদীর কিনার ঘন ঘাসে ভরা
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা
করিস না দেরী—আসিয়া পড়িবে সহসা অথৈ জল।
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা মেঘনায় নামে ঢল্।

এখনো যে মেয়ে আসে নাই—ফিরে দুপুর যে বহে যায় !
ভরা জোয়ারের মেঘনার জল কূলে কূলে উছলায়।
নদীর কিনার জলে একাকার,
যেদিকে তাকাই অথৈ পাথার,
এখনো সে কি রে আসে নাই ফিরে ? দুপুর বেলা যে যায় !

ভর্ বেলা গেল, ভাঁটা পড়ে আসে, আঁধার জমিছে আসি ;
এখনো তবুও এলো না ফিরিয়া আমিনা সর্বনাশী।
দেখ্ দেখ্ দূরে মাঝ-দরিয়ায়
কালো চুল যেন ঐ দেখা যায়—
কাহার শাড়ীর আঁচল আভাস সহসা উঠিছে ভাসি ?
আমিনারে মোর নিল কি টানিয়া মেঘনা সর্বনাশী ?

মনের কথা

ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

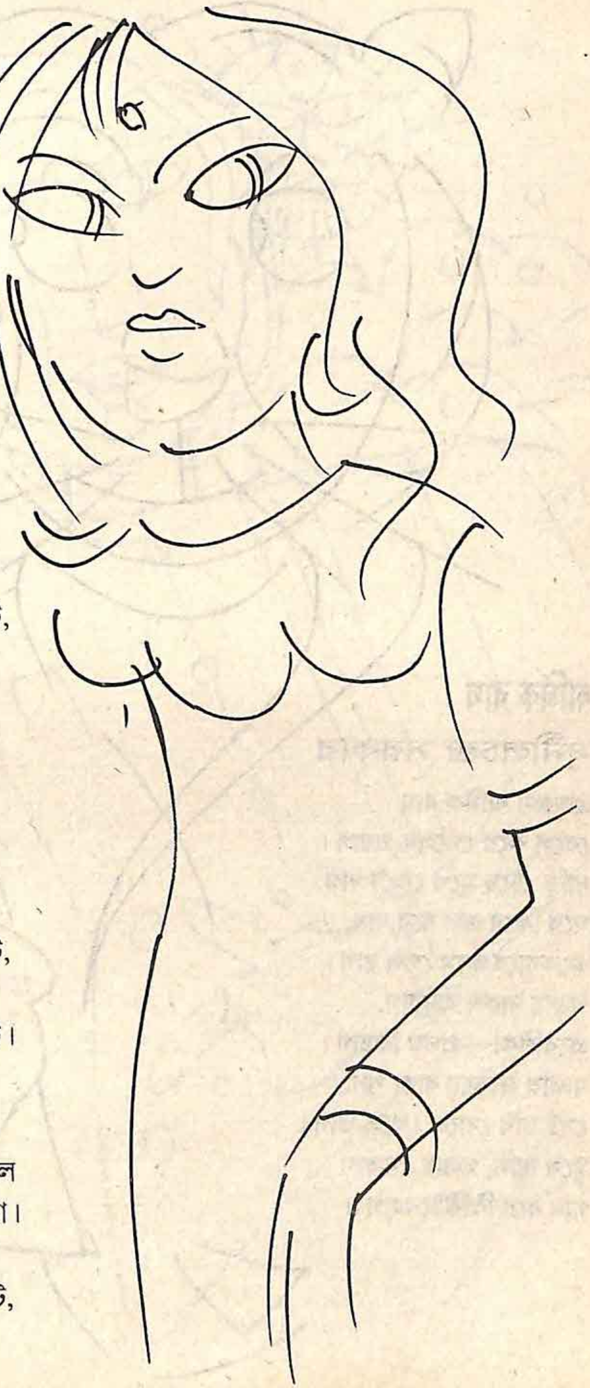


ছোটো তারাটির মনের কথাটি
কে বলো জানে।
ঝিকিমিকি সাজে আসে রোজই সাঁঝে
কিসের টানে!
জানালাটি খুলে খুকু ওর পানে
চেয়ে যে থাকে।
ছোটো তারা হাসে ছোটো খুকুটির
স্নেহের ডাকে।

খুকু বলে তার ঘরের কথাটি
তারার কাছে।
দূরের কাহিনী তারা বলে মুখে
দু'জনে নাচে।
দুজনের কাছে দুজনেই বলে
মায়ের কথা।
দূরের সাথীরে পেয়ে জাগে বুকে
কি ব্যাকুলতা।

ছোটো খুকু ছোটে তারাটির কাছে
কি কথা বলে!
সাঁঝের বাতাসে ওঠে মর্মরে
কাননতলে
পাতার আড়ালে চাঁপা ভাইবোন
পুলকে দোলে;
দূর মাঠে মাঠে সোনা মাখা ছায়া
পড়ে যে গ'লে!

সবাই শুনেছে ও দুটি সাথীর
বুকের বাণী
শুনেছে সে কথা নিঝুম রাতের
চাঁদের রানী।
সাঁঝের পহরে দুটি বুক ভ'রে
যে ব্যথা দোলে
ফুল হয়ে তারা ফুটে ওঠে ভোরে
কুঁড়ির কোলে।

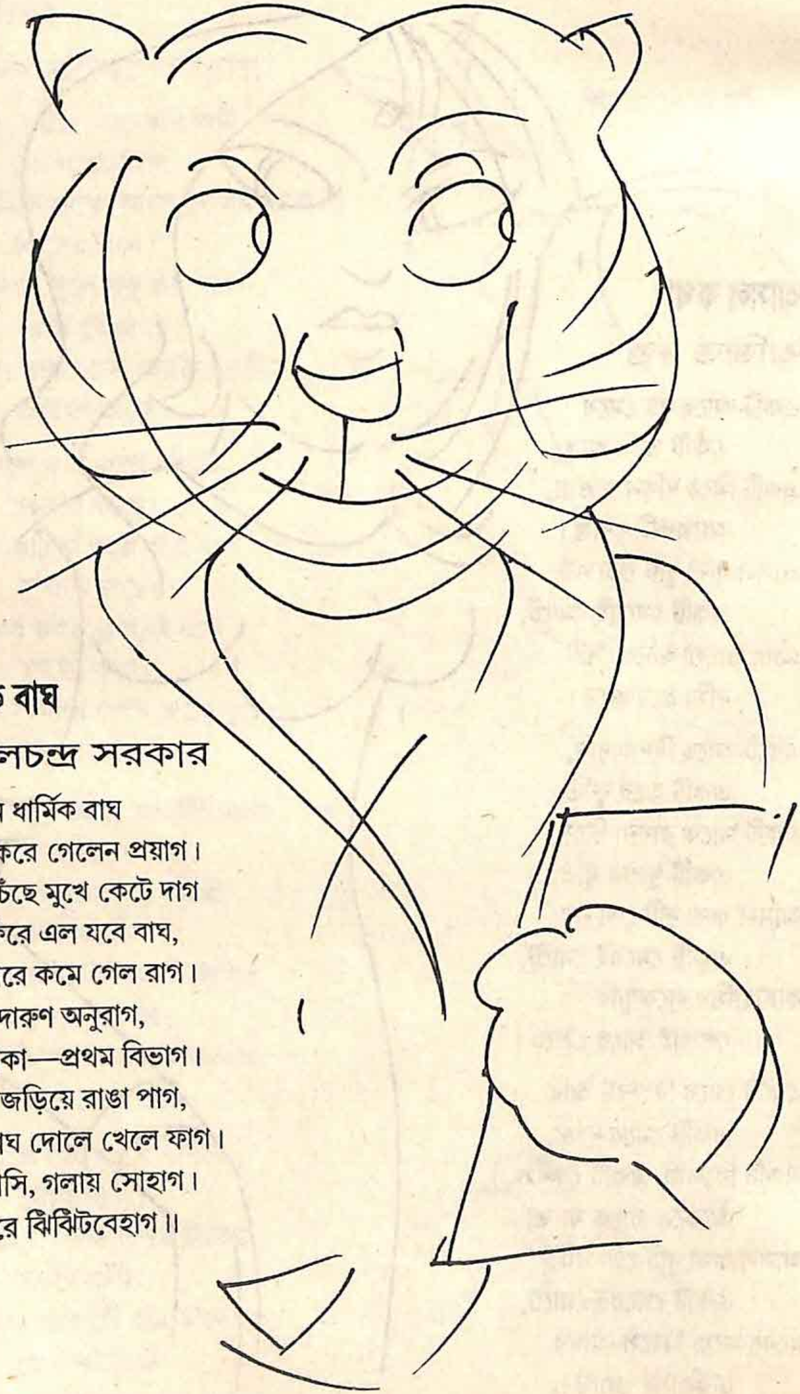


আসল কথা
অজিত দত্ত

একটি আছে দুষ্ট মেয়ে
একটি ভারি শান্ত,
একটি মিঠে দখিন হাওয়া,
আরেকটি দুর্দান্ত।
আসল কথা দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
হঠাৎ ভালো হঠাৎ সেটি
দস্যি হয়ে ওঠে।

একটি আছে ছিঁদকাঁদুনি,
একটি করে ফুর্তি,
একটি থাকে বায়না নিয়ে
একটি খুশির মূর্তি।
আসল কথা দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
কান্নাহাসির লুকোচুরি
লেগেই আছে ঠোঁটে।

একটি মেয়ে হিংসুটে আর
একটি মেয়ে দাতা,
একটি বিলোয়, একটি কেবল
আঁকড়ে থাকে যা-তা।
আসল কথা দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
মনের মধ্যে হিংসে-আদর
চর্কিবাজি ছোটে।।



ধার্মিক বাঘ

সুনীলচন্দ্র সরকার

একজন ধার্মিক বাঘ
রেলে করে গেলেন প্রয়াগ।
দাড়ি চেঁছে মুখে কেটে দাগ
ঘরে ফিরে এল যবে বাঘ,
একেবারে কমে গেল রাগ।
পড়ায় দারুণ অনুরাগ,
প্রবেশিকা—প্রথম বিভাগ।
মাথায় জড়িয়ে রাঙা পাগ,
সেই বাঘ দোলে খেলে ফাগ।
মুখে হাসি, গলায় সোহাগ।
গান ধরে ঝিঝিটবেহাগ॥



সুখ

লীলা মজুমদার

মেঘ কেটে যায়, রোদ্দুর ওঠে;
আঁধার রাতে জোছনা ফোটে।
সুখ রহে না পথে পড়ে,
সুখ নিতে হয় হাতে গড়ে।
বিলিয়ে দিবি যাকে তাকে,
ভরলে মুঠোয় নাহি থাকে।
তাইরে নারে নাইরে না,
ধূলোর মতো উড়িয়ে দেনা।
ভরে যাবে বুক,
তাকেই বলে সুখ।

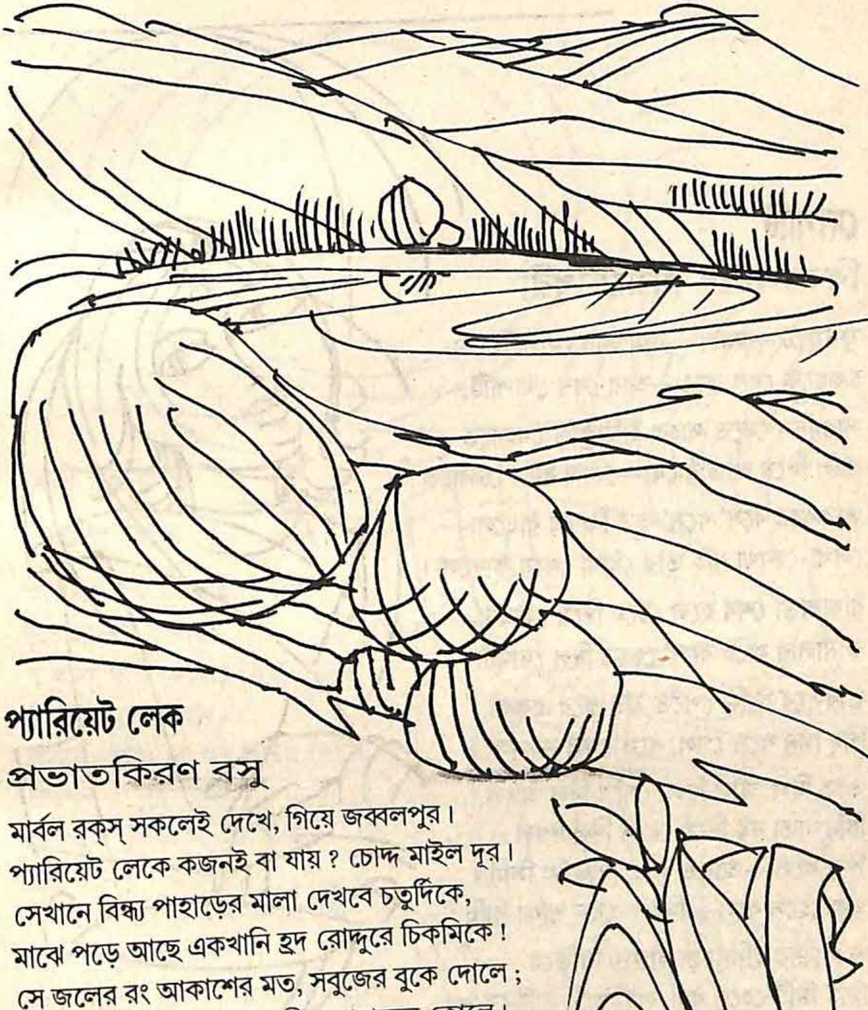
চম্পাবরণ কন্যা

বুদ্ধদেব বসু



রংমশালের সম্পাদকের চম্পাবরণ কন্যা
ঘর করেছেন আলো,
          সমস্ত তাঁর ভালো।
দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।
রাত্তিরে ঘুমোন না ;
          পূর্ণচাঁদের তাড়ার মত
          প্রথম-ফোটা তারার মত

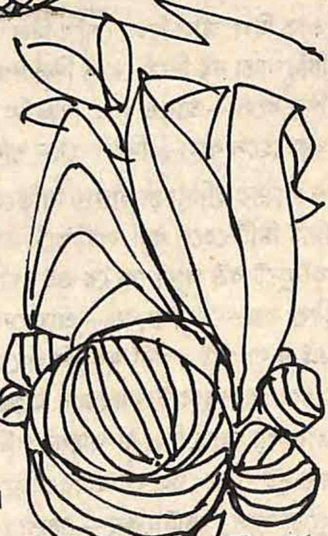
সন্ধ্যা হলেই তন্দ্রাভাঙা চম্পাবরণ কন্যা।
চম্পাবরণ কন্যা ;
          চোখ দুটি তাঁর কালো,
          ঘর করেছেন আলো,
দোষের মধ্যে সমস্ত রাত একটুও ঘুমোন না।
একটুও ঘুমোন না ;
          কাঁদেন এবং কাঁদান তিনি,
          হাত-পা ধরে সাধান তিনি,
রাতজাগাদের রাজকুমারী হবেন তিনি কোন না।
হবেন তিনি কোন না ;
          ঘুমপাড়ানি বঙ্গে
          ঘুমকাড়ানি সঙ্ঘে
বক্তৃতাতে তর্কাঘাতে আপন নামে ধন্যা।
নাম-না-হতেই ধন্যা,
          যত ইচ্ছে শতছিদ্র
          কোরো তুমি মূঢ়নিদ্র
ভবিষ্যতের বঙ্গভূমে-লক্ষ্মী তো, এখন না।
লক্ষ্মী তো, এখন না !
          সম্পাদকের মুখ খসালে
          কেমন করে রংমশালে
পদ্য বেঁধে তোমার পায়ে, বলো তো, দিই ধন্যা !

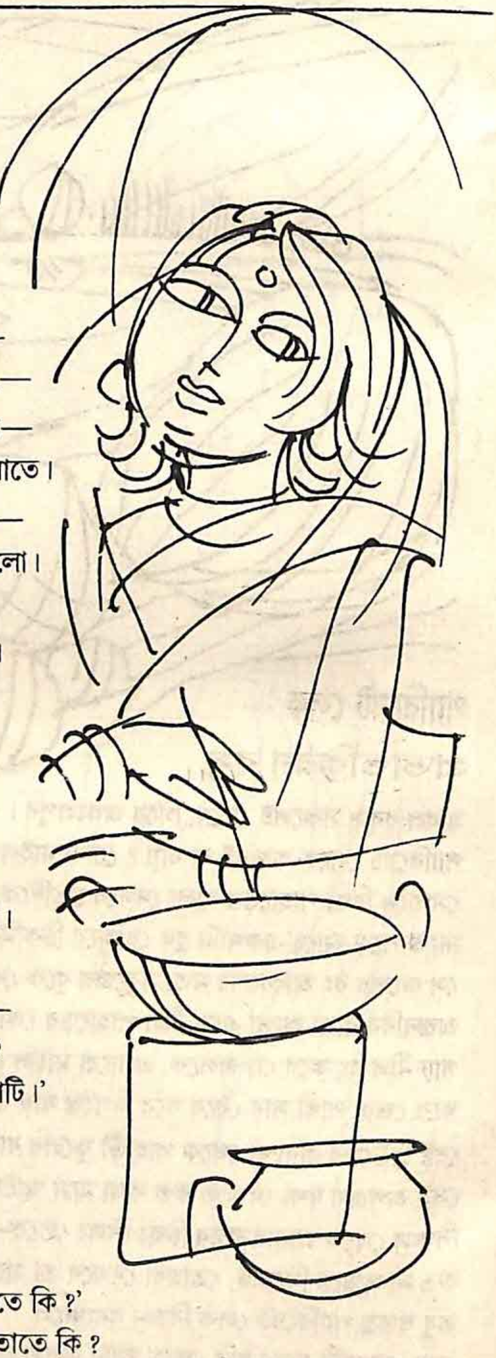


প্যারিয়েট লেক

প্রভাতকিরণ বসু

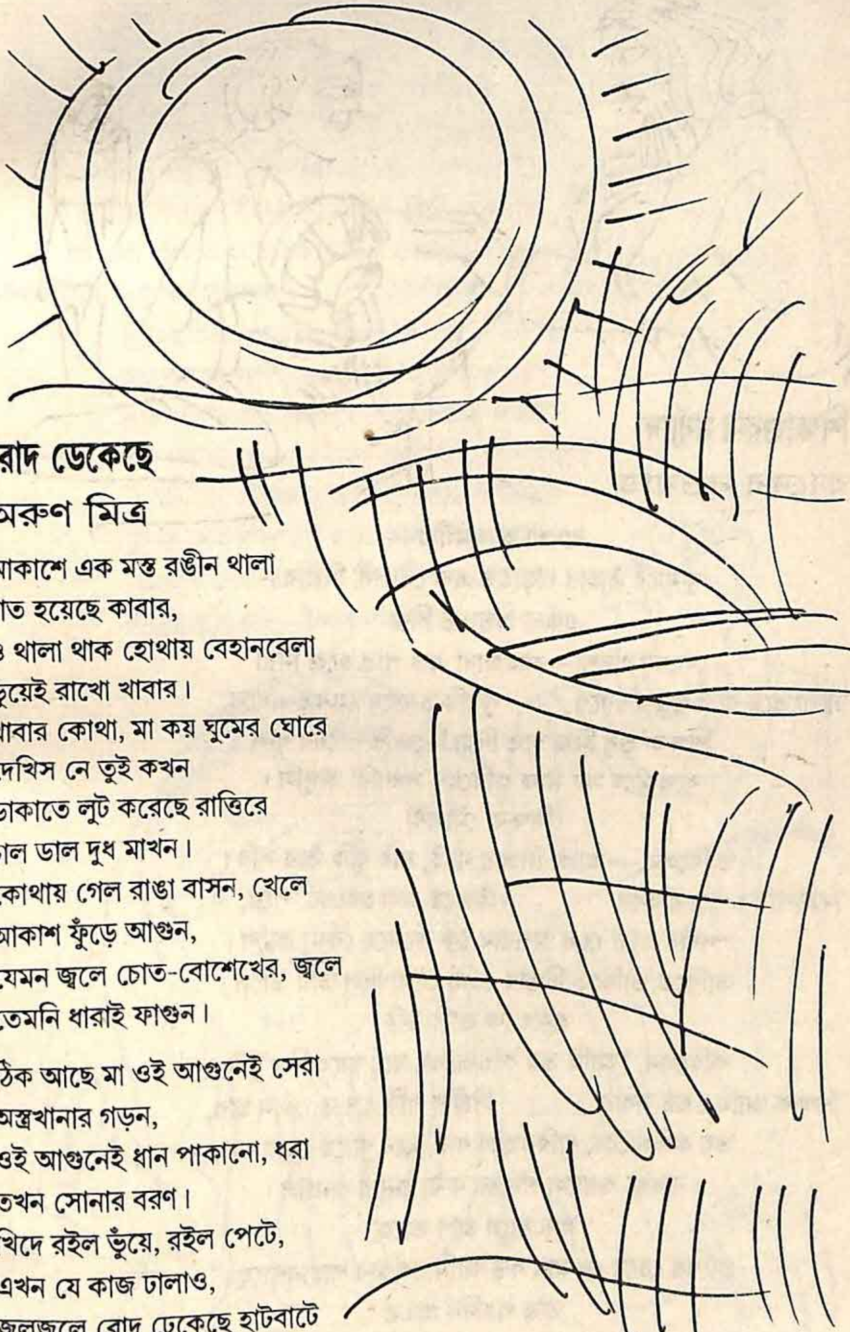
মার্বল রক্স্ সকলেই দেখে, গিয়ে জব্বলপুর।
প্যারিয়েট লেকে কজনই বা যায় ? চোদ্দ মাইল দূর।
সেখানে বিন্ধ্য পাহাড়ের মালা দেখবে চতুর্দিকে,
মাঝে পড়ে আছে একখানি হ্রদ রোদ্দুরে চিকমিকে !
সে জলের রং আকাশের মত, সবুজের বুকে দোলে ;
অস্তরবির রাঙা আভা এসে নীল পাহাড়ের কোলে।
গাঢ় নীল রং করে সে জলকে, এগারো মাইল জুড়ে ;
ঘরে ফেরা পাখী সার বেঁধে যবে দিগন্তে যায় উড়ে,
রেষ্ট হাউসের বারান্দা থেকে পাহাড়ী ফুলের বাসে
সেই অপরূপ দৃশ্য দেখলে কত কথা মনে আসে !
সিঞ্চল থেকে আনারসাগর চিল্কা শিলং লেকে—
কত না সায়রে গিয়েছি, তোমরা দেখবে তা প্রত্যেকে।
তবু স্বতন্ত্র প্যারিয়েট লেক বিজন বনাঞ্চলে,
যেন একখানি সুন্দর ছবি ফ্রেমে আঁটা ঝলমলে।





দোপাটি
বিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী

ফুটফুটে খুকুমণি—নাম তার দোপাটি,—
চক্‌চকে বেশ তার—আর বেশ খোঁপাটি,—
সারাদিন মেতে থাকে হাঁড়িকুঁড়ি খেলাতে—
বালি দিয়ে ভাত রাঁধে—ঝোল রাঁধে ঢেলাতে।
তারপরে বসে' বসে' কত কি যে রাঁধ্‌লো—
লেখা-জোখা নাই তার ধোঁয়া খেয়ে কাঁদ্‌লো।
রাঁধাবাড়া শেষ হলে টেনে দিয়ে ঘোমটা,
জানালার ধারে বসে' ছেড়ে দিল দোম্‌টা।
তারপরে পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে এক্‌লা,
গিনু মিনু বসে গেল, বসে গেল ন্যাপ্‌লা।
ভাত দিল, ডাল দিল, শেষে দিল অম্বল,
চিনিপাতা দই দিয়ে রেখে দিল দম্বল।
গিনু বলে—আরও দাও, দিচ্ছ কি সিন্নী ?
খুকু হেসে বলে—দিই—যেন পাকা গিন্নি।
ও পাড়ার হরিখুড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে
মিটি মিটি হেসে কন, লাঠিখানি নাড়িয়ে—
ফুটফুটে বউ পানা কে রে ওই গোপা কি ?
বিশু কয়—'গোপা নয়—আমাদের দোপাটি।'
এই কথা যেই শোনা খুকুমণি লাজেতে,
'ধ্যেৎ' বলে লুকাইল দরজার মাঝেতে।
তার পর দোড় দিল বাঁ-পাশের গলিতে,
বার দুই পড়ে গেল ঘোমটায় চলিতে।
খুড়ো বলে, 'ছোট কেন—লেগে গেল হাতে কি ?'
খুকু লাজে কয়,—'না—না, তাতে কি—তাতে কি ?



রোদ ডেকেছে

অরুণ মিত্র

আকাশে এক মস্ত রঙীন থালা
রাত হয়েছে কাবার,
ও থালা থাক হোথায় বেহানবেলা
ভুঁয়েই রাখো খাবার।
খাবার কোথা, মা কয় ঘুমের ঘোরে
দেখিস নে তুই কখন
ডাকাতে লুট করেছে রাত্তিরে
চাল ডাল দুধ মাখন।
কোথায় গেল রাঙা বাসন, খেলে
আকাশ ফুঁড়ে আগুন,
যেমন জ্বলে চোত-বোশেখের, জ্বলে
তেমনি ধারাই ফাগুন।

ঠিক আছে মা ওই আগুনেই সেরা
অস্ত্রখানার গড়ন,
ওই আগুনেই ধান পাকানো, ধরা
তখন সোনার বরণ।
খিদে রইল ভুঁয়ে, রইল পেটে,
এখন যে কাজ ঢালাও,
জ্বলজ্বলে রোদ ঢেকেছে হাটবাটে
ডাকাতবাবু পালাও।

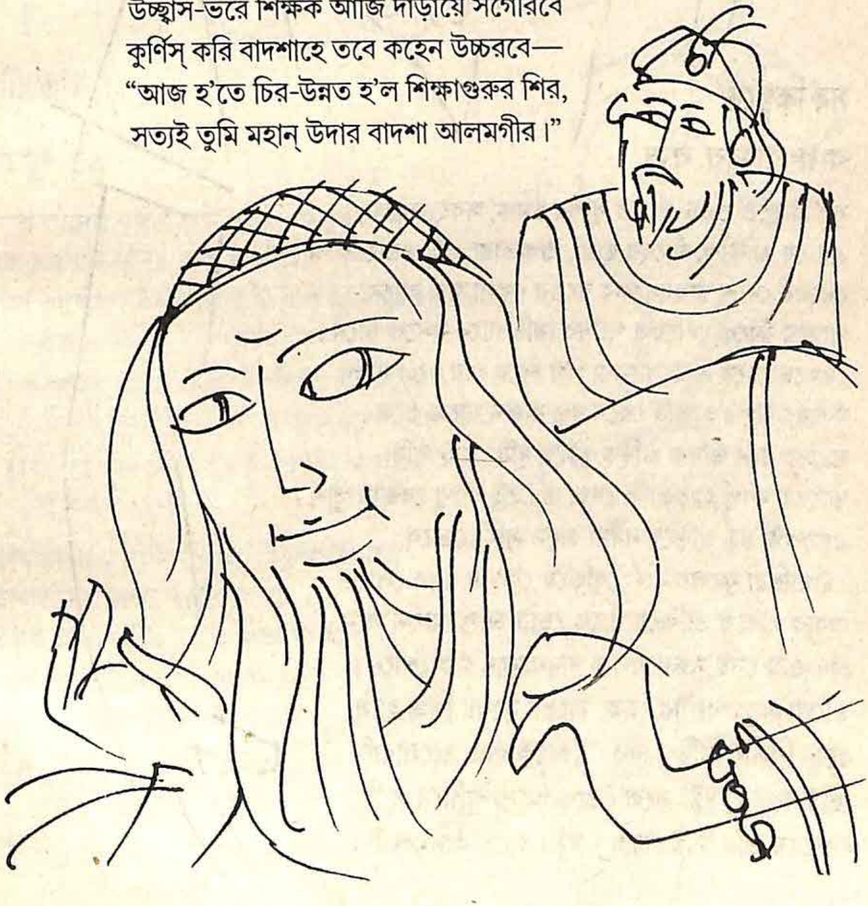


শিক্ষাগুরুর মর্য্যাদা

কাদের নওয়াজ

বাদশা আলমগীর—
কুমারে তাঁহার পড়াইত এক মৌলবী দিল্লীর।
একদা প্রভাতে গিয়া
দেখেন বাদশা—শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া
ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে পুলকিত-হৃদে আনত-নয়নে,
শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরি পায়ের ধূলি
ধুয়ে মুছে সব সাফ করিছেন সঞ্চারি' অঙ্গুলি।
শিক্ষক মৌলবী
ভাবিলেন,—আজি নিস্তার নাহি, যায় বুঝি তাঁর সবি।
দিল্লীপতির পুত্রের করে লইয়াছে জল চরণের 'পরে,
স্পর্ধার কাজ হেন অপরাধ কে করেছে কোন্ কালে।
ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিল তাঁর ভালে।
হঠাৎ কি ভাবি উঠি
কহিলেন, "আমি ভয় করিনাকো, যায় যাবে শির টুটি,
শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার দিল্লীর পতি সে ত কোন্ ছার,
ভয় করিনাকো, ধারিনাকো ধার, মনে আছে মোর বল,
বাদশা শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব অনর্গল।
যায় যাবে প্রাণ তাহে,
প্রাণের চেয়ে যে মান বড় আমি বোঝাব শাহানশাহে।"
তার পরদিন প্রাতে
বাদশার দূত শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে।

খাসকামরাতে যবে
শিক্ষকে ডাকি বাদশা কহেন, "শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে ?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকালবেলা"—
শিক্ষক কন—"জাঁহাপনা, আমি বুঝিতে পারিনে হায়,
কি কথা বলিতে আজিকে আমায় ডেকেছেন নিরালায় ?"
বাদশা কহেন, "সেদিন প্রভাতে দেখিলাম আমি দাঁড়ায়ে তফাতে
নিজ হাতে যবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন,
পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ।
নিজ হাতখানি আপনার পায়ে বুলাইয়া সযতনে
ধুয়ে দিলনাকো কেন সে চরণ, স্মরি ব্যথা পাই মনে।"
উচ্ছ্বাস-ভরে শিক্ষক আজি দাঁড়ায়ে সগৌরবে
কুর্ণিস্ করি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চরবে—
"আজ হ'তে চির-উন্নত হ'ল শিক্ষাগুরুর শির,
সত্যই তুমি মহান্ উদার বাদশা আলমগীর।"

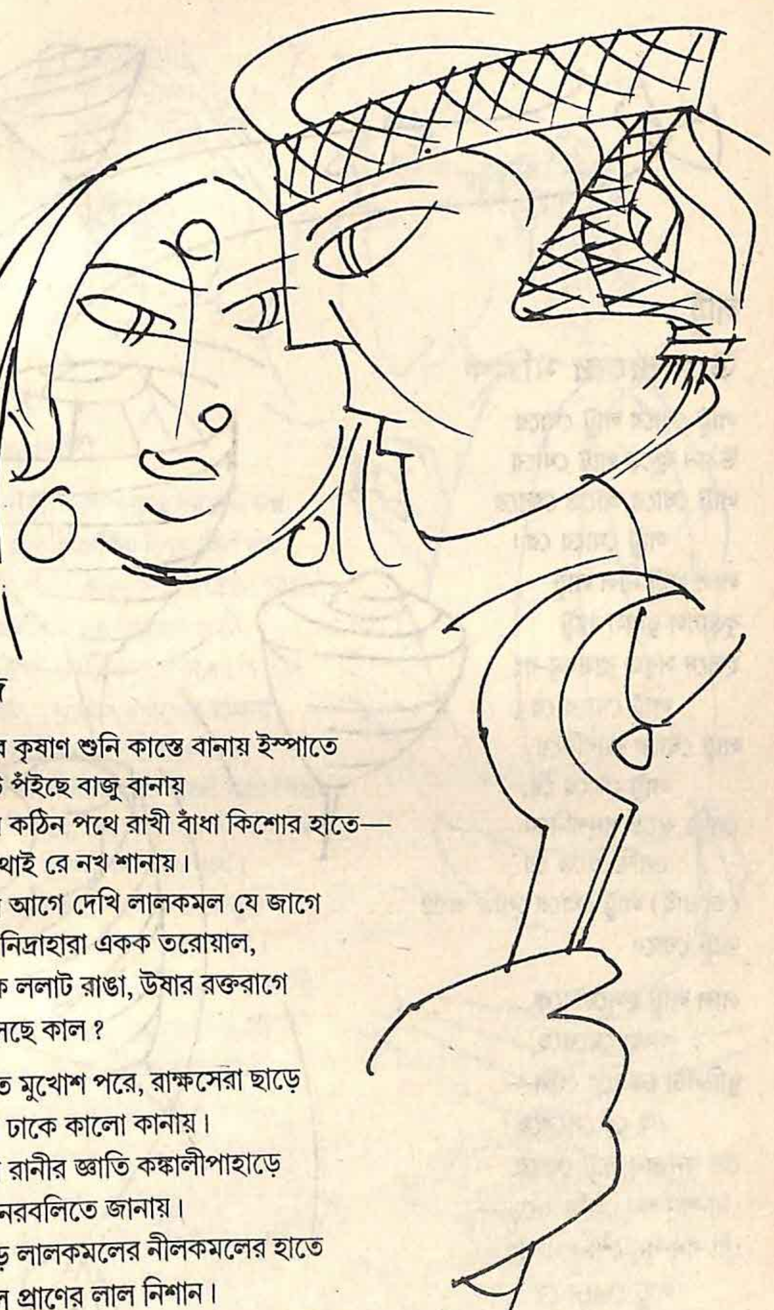




সব কিছুতে

করুণাময় বসু

সব কিছুতে ছোট্ট জাপুর খুশির চমক, সবই ভালো,
এই যে আকাশ, গাছের ছায়া, শুকতারা ওই, ভোরের আলো।
মেঘের দেশে রামধনুকের রঙের খেলা স্বপ্ন আনে,
পাতার ফাঁকে দোয়েল পাখির মিষ্টি গানে মনকে টানে।
দেখছে চেয়ে ভাইবোনেরা পথ দিয়ে যায় দলে দলে,
কাঁধের উপর হাতটি রেখে বন্ধু কজন যাচ্ছে চলে ;
ঘাসের বনে এদিক ওদিক ছুটছে দুটি ছোট্ট পুষি,
তাতেই জাপু হাততালি দেয়, তাতেই জাপু বেজায় খুশি।
ময়ূরকণ্ঠী রঙ ছড়িয়ে নদীর জলে সূয্যি ডোবে,
মৌমাছিরা ফুলের বনে বেড়িয়ে বেড়ায় মধুর লোভে
অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে ছোট্ট জাপু আপন মনে ;
চাঁদ ওঠা সেই সন্ধ্যাবেলায় দাদুর মুখে গল্প শোনে।
ভালো লাগে বাপীর স্নেহ, মায়ের মুখের স্নিগ্ধ হাসি,
বড়ো পিসীর মিষ্টি আদর, "তোকে বড্ড ভালোবাসি।"
ছোট কাকুর "দুষ্টু" বলে তেড়ে আসা বাগিয়ে লাঠি,
সবচেয়ে তার মিষ্টি লাগে জেঠুর হাতে কানমলাটি।

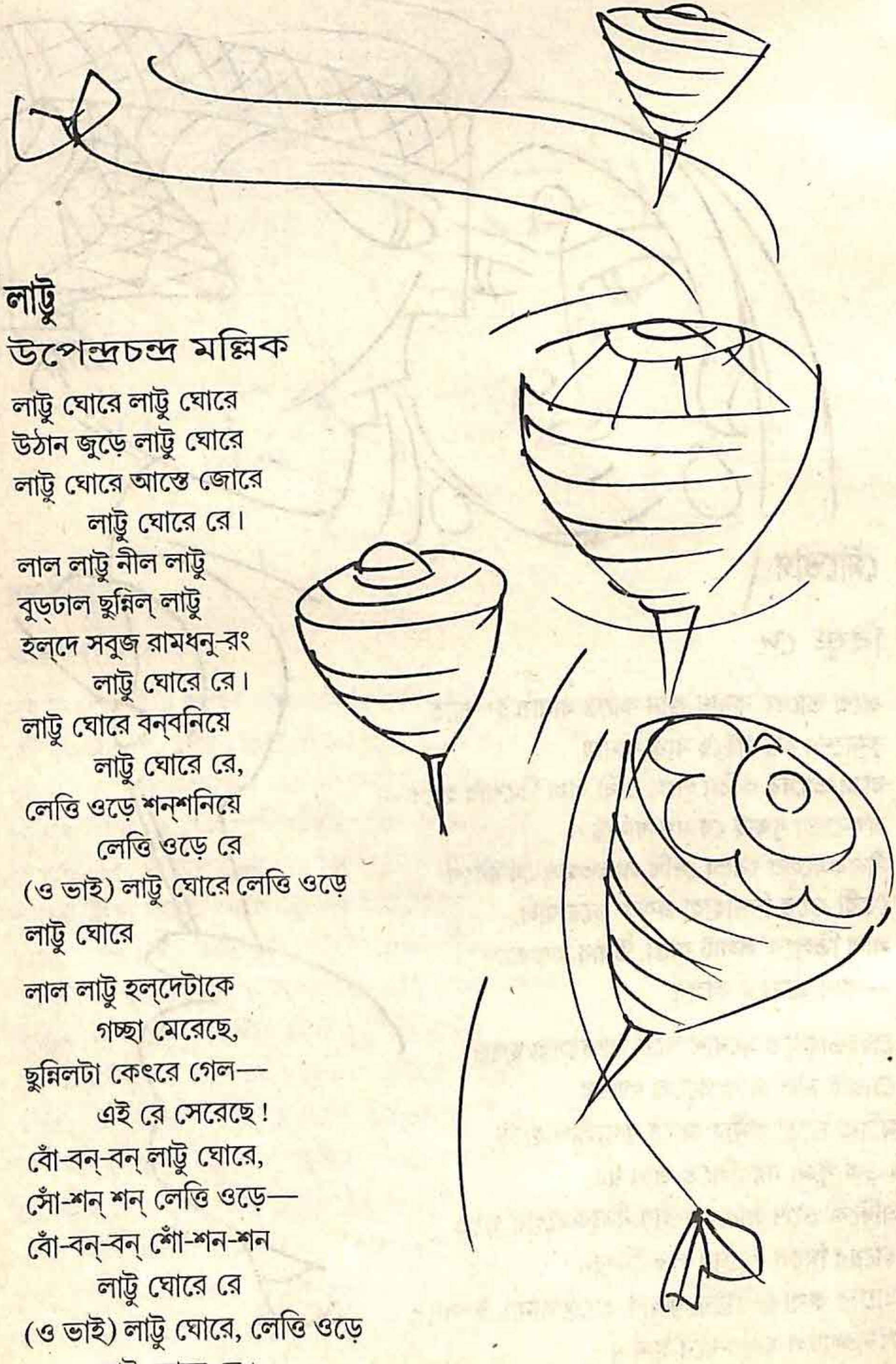


মৌভোগ

বিষ্ণু দে

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখী বাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।
নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরী হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, উষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?

চোরডাকাতে মুখোশ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল ঢাকে কালো কানায়।
মরিয়া যতো রানীর জ্ঞাতি কঙ্কালীপাহাড়ে
মড়ক পূজা নরবলিতে জানায়।
এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান॥



লাট্টু

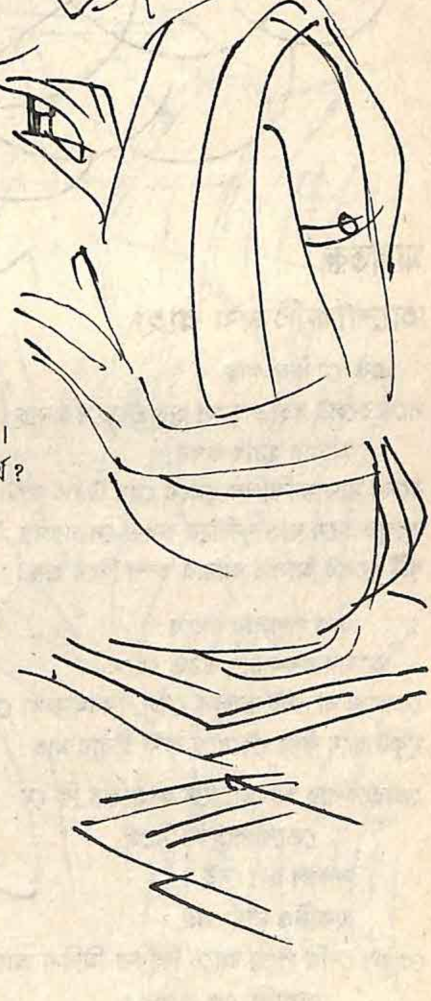
উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

লাট্টু ঘোরে লাট্টু ঘোরে
উঠান জুড়ে লাট্টু ঘোরে
লাট্টু ঘোরে আস্তে জোরে
লাট্টু ঘোরে রে।
লাল লাট্টু নীল লাট্টু
বুড়্‌ঢাল ছুন্নিল্ লাট্টু
হল্‌দে সবুজ রামধনু-রং
লাট্টু ঘোরে রে।
লাট্টু ঘোরে বন্‌বনিয়ে
লাট্টু ঘোরে রে,
লেত্তি ওড়ে শন্‌শনিয়ে
লেত্তি ওড়ে রে
(ও ভাই) লাট্টু ঘোরে লেত্তি ওড়ে
লাট্টু ঘোরে

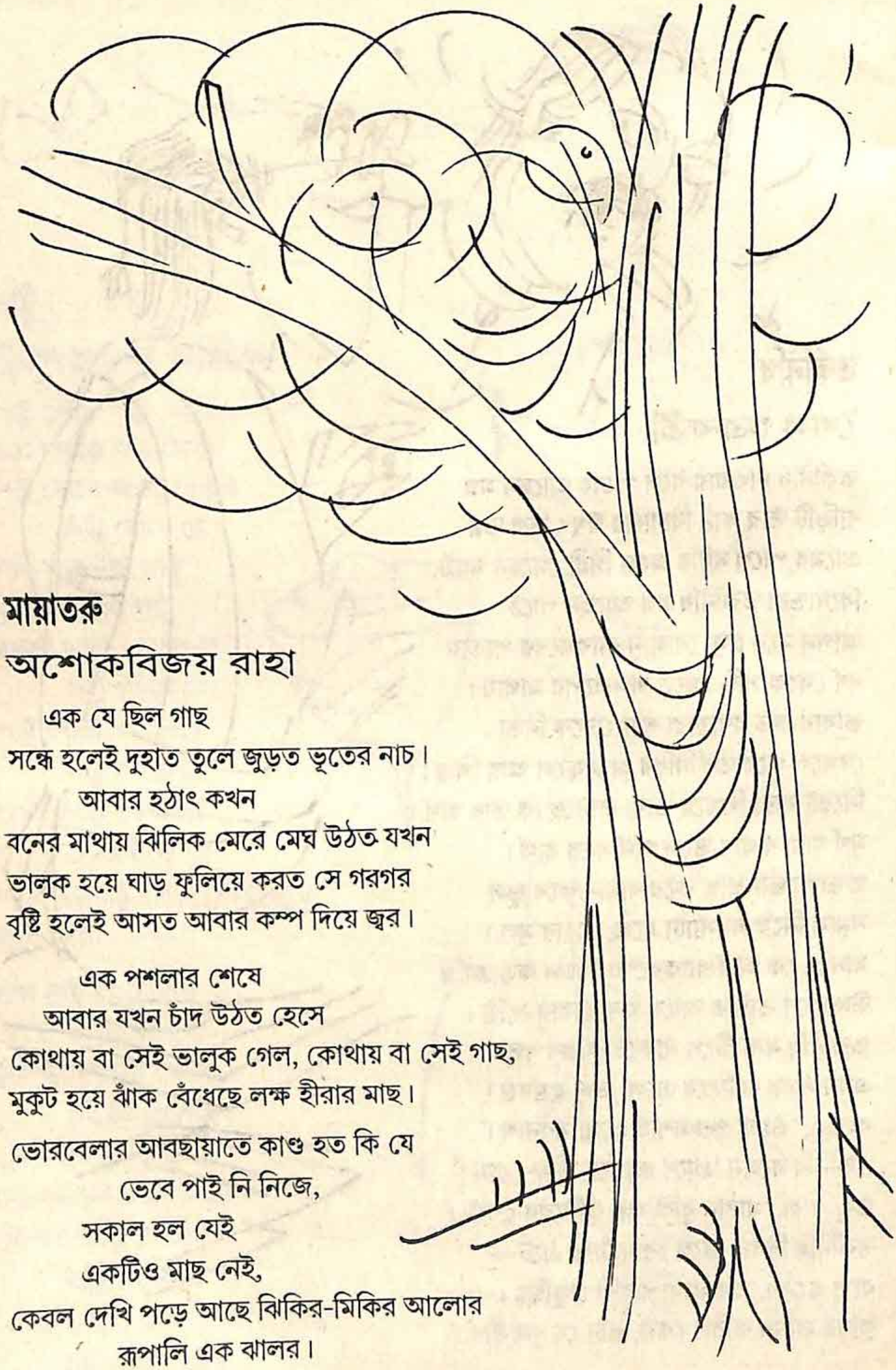
লাল লাট্টু হল্‌দেটাকে
গচ্ছা মেরেছে,
ছুন্নিলটা কেৎরে গেল—
এই রে সেরেছে!
বোঁ-বন্-বন্ লাট্টু ঘোরে,
সোঁ-শন্ শন্ লেত্তি ওড়ে—
বোঁ-বন্-বন্ শোঁ-শন-শন
লাট্টু ঘোরে রে
(ও ভাই) লাট্টু ঘোরে, লেত্তি ওড়ে
লাট্টু ঘোরে রে।



৮
তর্কনিধি
শৈল চক্রবর্তী



তর্কনিধি দাওয়ায় বসে পড়ায় আছেন মগ্ন
বাড়িটি তাঁর কাঠ বিচালির ঈষৎ ছিল ভগ্ন
গ্রামের পাশে নদীর জলে গিন্নী গেছেন ঘাটে,
বিদ্যেভরা তর্কনিধি মগ্ন আছেন পাঠে
আপন মনে চক্ষু বোলান ব্যাকরণের পাতায়
বর্ণ থেকে সন্ধি ছেড়ে শব্দরূপের মাথায়।
ভাষায় কত বর্ণচোরা শব্দ ঢোকে নিত্য
দেখলে পরে তর্কনিধির হাড় জ্বলে আর পিত্ত।
নিরেট যারা লিখছে তারা জানছে কি তার অর্থ?
মূর্খ যারা কথার ভুলে অর্থ করে ব্যর্থ।
শুদ্ধাশুদ্ধের শ্রাদ্ধ করে বানান করে ভুল
সমাস নিয়ে সমস্যাটা হচ্ছে তাহার মূল।
মানছে কে আর ব্যাকরণের বিধান কড়াক্রান্তি
উচ্চারণে তাই ত আসে শুদ্ধভাষার ভ্রান্তি।
তর্কনিধি নস্য টিপে নাকটে করেন বন্ধ
এমন সময় লাফিয়ে এলো ভজু হন্তদন্ত।
বললে, 'ওগো গুরুমশাই হলো সর্বনাশ।'
তর্কনিধি বলেন 'প্রাণে জাগছে ভীষণ ত্রাস।'
ভজু বলে, 'মাঠান বুঝি যায় কুমীরের পেটে।'
তর্কনিধি বিষম রেগে চশমাটারে এঁটে—
বলে ওঠেন, 'হতভাগা করলি চক্ষুস্থির।
কুমির কুমির করিস কেন, ওটা যে কুম্ভীর!'



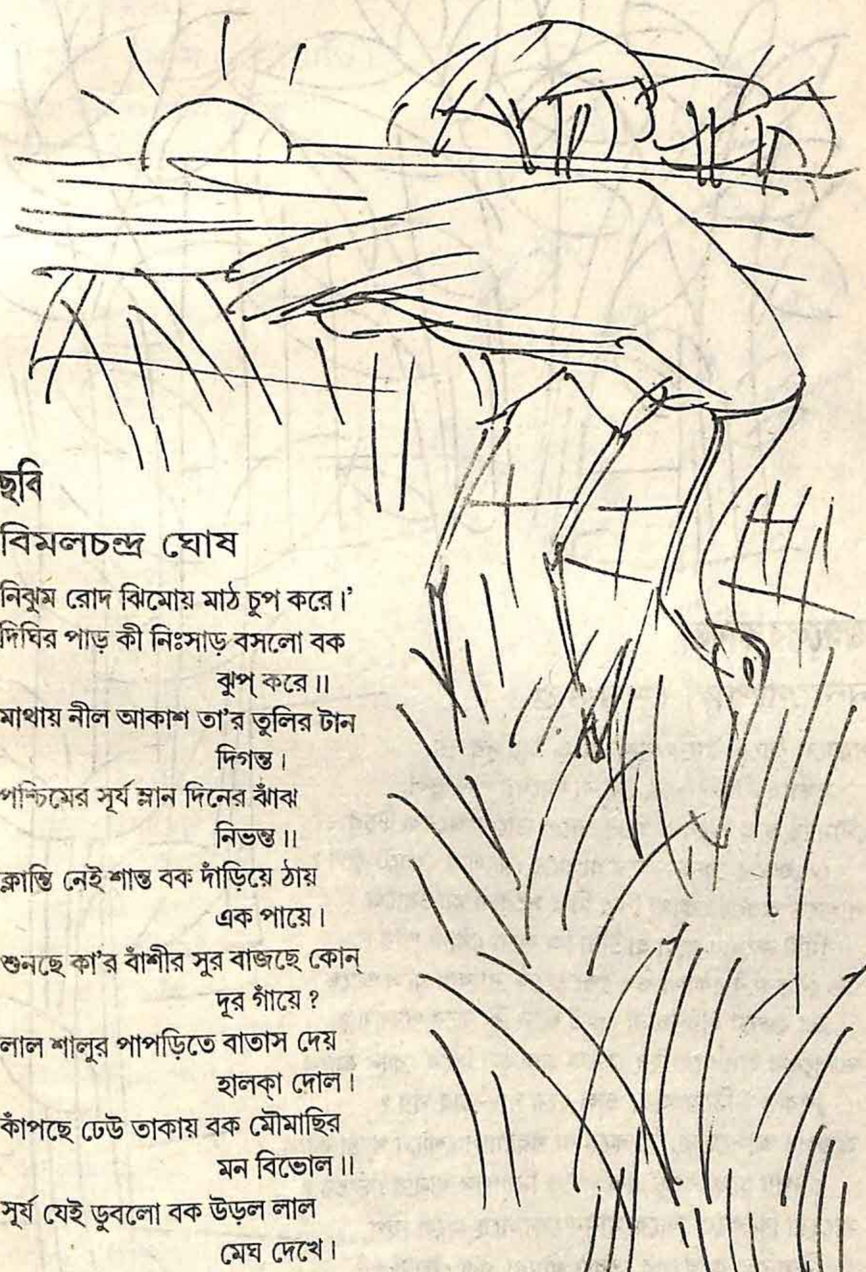
মায়াতরু

অশোকবিজয় রাহা

এক যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দুহাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গরগর
বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।

এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।

ভোরবেলার আবছায়াতে কাণ্ড হত কি যে
ভেবে পাই নি নিজে,
সকাল হল যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।



ছবি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

নিঝুম রোদ ঝিমোয় মাঠ চুপ করে।'
দিঘির পাড় কী নিঃসাড় বসলো বক
ঝুপ্ করে।।
মাথায় নীল আকাশ তা'র তুলির টান
দিগন্ত।
পশ্চিমের সূর্য ম্লান দিনের ঝাঁঝ
নিভন্ত।।
ক্লান্তি নেই শান্ত বক দাঁড়িয়ে ঠায়
এক পায়ে।
শুনছে কা'র বাঁশীর সুর বাজছে কোন্
দূর গাঁয়ে?
লাল শালুর পাপড়িতে বাতাস দেয়
হালকা দোল।
কাঁপছে ঢেউ তাকায় বক মৌমাছির
মন বিভোল।।
সূর্য যেই ডুবলো বক উড়ল লাল
মেঘ দেখে।
হাজার বক ফুল ফোটায় শূন্যে তা'র
পথ এঁকে।।



জঙ্গলের কবিতা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সক্কালে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে যায় দূর দূর,
সন্ধ্যায় নীড় ফেরে, হয় না তাদের পথ ভুল,
মৌমাছি চাক বাঁধে জঙ্গলে ডালে ডালে অনেক উঁচুর...
সে জানে কেমন করে বাগানে কোথায় ফোটে ফুল ?
পাহাড়ে ঝরছে কোথা ঝির ঝির সুরেলা আওয়াজে
মিষ্টি জলের ধারা হাতীরা কি করে খোঁজ পায় ?
ঘন বেতবনে কোথা ওঁৎ পেতে কেঁদো বাঘ বসে আছে
তা জেনে হরিণছানা কেউ জান কি করে পালায় ?
ভালুকের জ্বর হলে হ্রদ থেকে এক ডুব দিয়ে কোন জ্ঞানে
শিকড় উঠিয়ে খায়, ভাল হয়ে যায় তার পর ?
অজগর আসছে তা কি করে বা খরগোস শোনে খাড়া কানে,
চটপট ঢুকে পড়ে এক লাফে নিরাপদ খানার ভেতর ?
মাছেরা কি করে বোঝে মানুষ ফেলেছে জলে ছিপ,
কিলবিল করে চার, তবুও খায়না এক ফোঁটা ?
এসব ভাবলে পরে বুকের ভেতরটা করে ঢিপ ঢিপ,
মনে হয় কি চালাক প্রাণীদের দুনিয়াটা গোটা !

কোন্ বাহনে

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

নীল নীল নীল সারা আকাশ
ভোরের শিশির ঘাসে,
সাদা কাশের টোপর মাথায়
মাঠ-ময়দান হাসে!
হলুদ সোনা রোদ মাখানো।
শিউলি ফুলের বাসে,
পুজোর খবর এসে গেল
শেষ আশ্বিন মাসে।

দেবী দুর্গা কোনও বছর
আসেন চেপে দোলায়,
কোনও বছর চাপেন নৌকো
হাতি কিংবা ঘোড়ায়।
জানতে তো হয় এবার দেবী
কোন বাহনে আসে,
দাদু ওলটান পাঁজির পাতা
দিদুন থাকেন পাশে।

চশমা এঁটে নাকের ডগায়
পাঁজির পাতা পড়ে,
দাদু জানান—"মার আগমন
এবার গজে চড়ে।"
জর্দা-ঠাসা তিন খিলি পান
ফোকলা মুখে ভরে
দিদুন বলেন, "কক্ষনো না
আসবে নৌকো করে।"

বাইরে থেকে তর্ক শুনে
তুতুল মুনু হাসে,
গোল মেটাতে ঘরের ভেতর
দৌড়ে চলে আসে।
চেঁচিয়ে বলে, "মা দুগ্গা
আসবে এবার বাসে,
প্যান্ডেল তাই হচ্ছে বাঁধা
বাস-গুমটির পাশে।



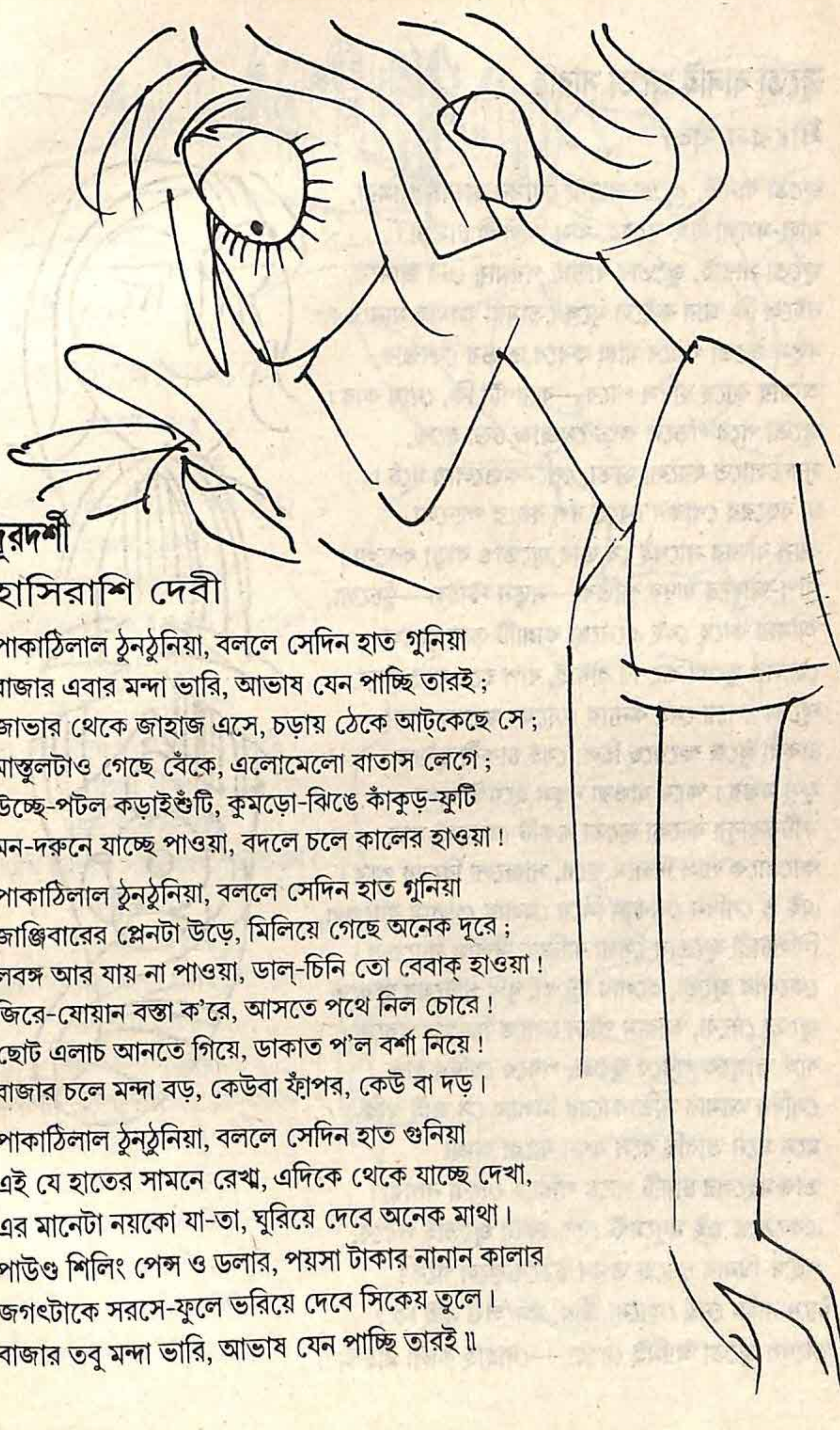


আমরা ঘাসের ছোটো ছোটো ফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
ছিঁড়ো না নরম পাতা।
শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।।

ধরার বুকের স্নেহকণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা-নীল আকাশের বাঁশি
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।।



দূরদর্শী

হাসিরাশি দেবী

পাকাঠিলাল ঠুনঠুনিয়া, বললে সেদিন হাত গুনিয়া
বাজার এবার মন্দা ভারি, আভাষ যেন পাচ্ছি তারই ;
জাভার থেকে জাহাজ এসে, চড়ায় ঠেকে আট্‌কেছে সে ;
মাস্তুলটাও গেছে বেঁকে, এলোমেলো বাতাস লেগে ;
উচ্ছে-পটল কড়াইশুঁটি, কুমড়ো-ঝিঙে কাঁকুড়-ফুটি
মন-দরুনে যাচ্ছে পাওয়া, বদলে চলে কালের হাওয়া !

পাকাঠিলাল ঠুনঠুনিয়া, বললে সেদিন হাত গুনিয়া
জাঞ্জিবারের প্লেনটা উড়ে, মিলিয়ে গেছে অনেক দূরে ;
লবঙ্গ আর যায় না পাওয়া, ডাল্‌-চিনি তো বেবাক্ হাওয়া !
জিরে-যোয়ান বস্তা ক'রে, আসতে পথে নিল চোরে !
ছোট এলাচ আনতে গিয়ে, ডাকাত প'ল বর্শা নিয়ে !
বাজার চলে মন্দা বড়, কেউবা ফাঁপর, কেউ বা দড়।

পাকাঠিলাল ঠুনঠুনিয়া, বললে সেদিন হাত গুনিয়া
এই যে হাতের সামনে রেখা, এদিকে থেকে যাচ্ছে দেখা,
এর মানেটা নয়কো যা-তা, ঘুরিয়ে দেবে অনেক মাথা।
পাউণ্ড শিলিং পেন্স ও ডলার, পয়সা টাকার নানান কালার
জগৎটাকে সরসে-ফুলে ভরিয়ে দেবে সিকেয় তুলে।
বাজার তবু মন্দা ভারি, আভাষ যেন পাচ্ছি তারই ॥

জুতো বানাই জুতো সারাই

ধীরেন বল

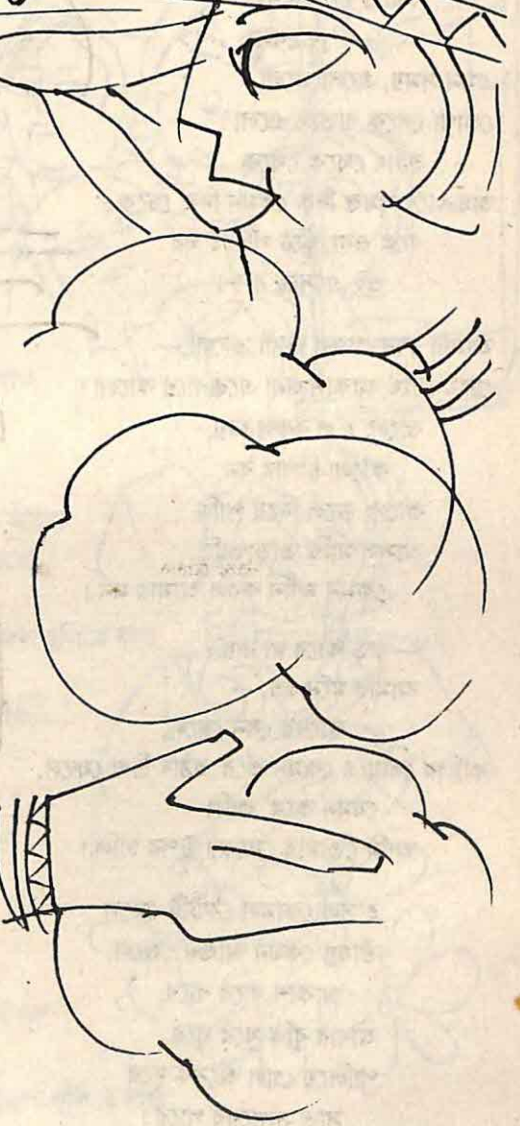


জুতো বানাই, জুতো সারাই মেসিন ছাড়াই আমরা,
মাল-মসলা উচ্চ দরের, খাস বিলিতী চামড়া।
জুতো সারাই, জুতোর বাড়াই পরমায়ু ঢের জানবে,
নইলে কি আর কইলে মুখে তোমরা আমায় মানবে?
নতুন জুতো পরবে যারা করবে ত ভয় ফোস্কার,
আমার কাছে হদিস পাবে—কারণটা কি, দোষ কার।
জুতো পরে পড়লে কড়া মেজাজ চড়া হচ্ছে,
সুকতলাতে ধরলো ছাতা, পেরেকগুলোয় মর্চে।
ছ' বছরের খোকন বেড়ে দশ বছরে পড়লো,
বয়স বাড়ার সাথেই যে তার জুতোও বাড়া ধরলো।
বাপ-আদুরে যাদুর বাতিক—নতুন স্টাইল—ছুঁচ্‌লো,
আমার কাছে যেই এনেছো কান্নাটি তার ঘুচলো।
ছেলের জুতো বাপের বানাই, বাপ হয়ে যায় কন্যা,
জুতো পেয়ে নেই কন্যার চোখের জলের বন্যা।
চাকরী খুঁজে ক্ষয়েছে হিল, যেই চাকরী জুটলো
ফুস্ মন্তর! ক্ষয়ে যাওয়া নতুন হয়ে উঠলো!
ফটিকবাবুর কালো জুতো একটি জোড়াই মাত্র,
কালোকে লাল দিলাম করে, সাজলো বিয়ের পাত্র।
এই ত সেদিন দোকান নিয়ে মেলায় গেলাম ব্যাণ্ডেল,
মিলিটারী জুতোয় সেথা বানিয়ে দিলাম স্যাণ্ডেল!
কেলোর জুতো, হুলোর জুতো, বুধি গাইয়ের ক্ষুরতে
জুতো দেবো, আরাম পাবে চলতে ফিরতে ঘুরতে!
বাঘ-ভালুকে পরবে জুতো, পরবে যেদিন হস্তি
সেদিন আমার সত্যিকারের মিলবে সে ভাই স্বস্তি!
মনে মনে ভাবছি বসে যখন যাবো আগ্রা
তাজমহলের চারটি পায়ে পরিয়ে দেবো নাগরা!
একঠেঙে ওই মনুমেন্ট তো একটা জুতোই পরবে,
শহীদ-মিনার সেজে তখন উঠবে ফুলে গর্বে!
চাঁদে নাকি নেই কোনো জীব, মঙ্গলেও নাই কি?
তাদের জুতো আমিই দেবো,—দোহাই কালী মাইকী!!



নৈনীতালে

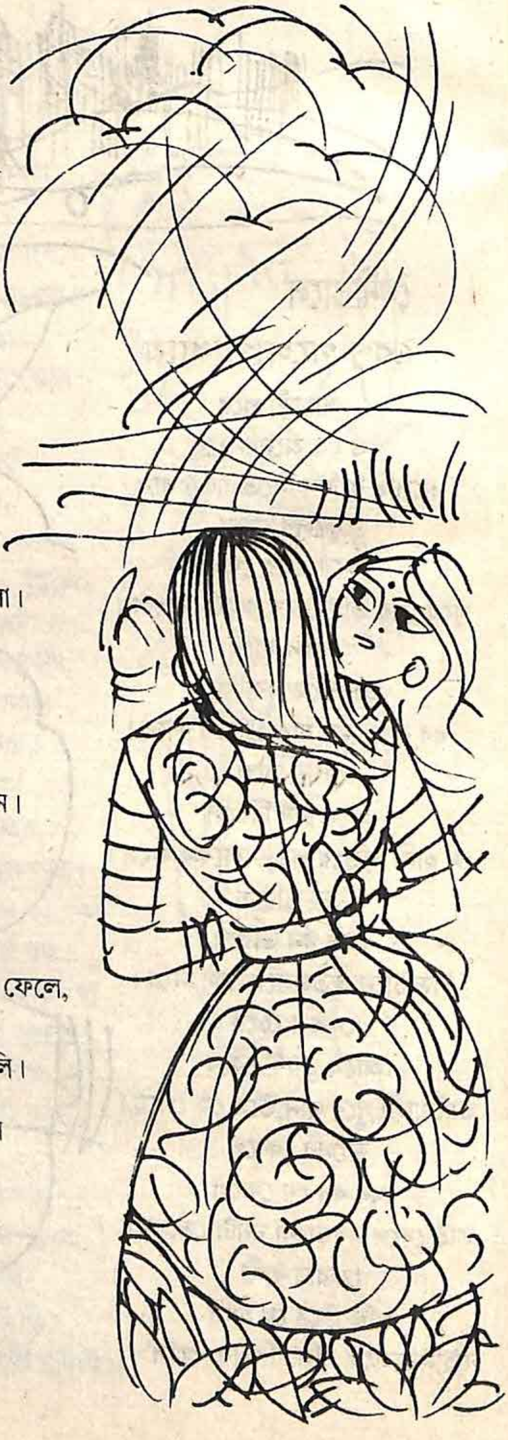
বেণু গঙ্গোপাধ্যায়



পাহাড়ী পুরে
ও সে অনেক দূরে
এসেছি ক'দিন নিতে একটু ঘুরে।
ফুলের মেলা
করে ভ্রমর খেলা
ঘুরে ঘুরে তাই দেখে কাটে যে বেলা।
পাইন গাছে
আসি মেঘেরা নাচে
ধর কত মেঘ চাও হাতের কাছে।
গগন তলে
হাসে চাঁদ বিরলে
সে হাসি ছড়িয়ে পড়ে লেকের জলে।
তর তরিয়ে
ওরে মন ভরিয়ে
দাঁড় টানে কতজনা নৌকা নিয়ে।
দেখ্‌না চেয়ে
আসে তরণী বেয়ে
ভাটিয়ালী সুরে গান উঠে কে গেয়ে।
জলের কোলে
ঘন বন যে দোলে
তাই দেখে মুষড়ানো মনটা ভোলে।
ফেরার বাঁশী
বাজি উঠে যে হাসি
নাইনিতালকে বলি, 'বিদায়, আসি'।

ঝড়

মৈত্রেয়ী দেবী



ওমা, সেদিন হাটের ধারে, মাঠের ধারে—
করতে গেছি খেলা
—দুপুর বেলা,
এমন সময়, এলোমেলো
কোথা থেকে বাতাস এলো!
হঠাৎ থেকে থেকে
অন্ধকারে সমস্ত দিক কেমন দিল ঢেকে!
বল্লে ওরা, ছুটে পালাই ঘর
ওই এসেছে ঝড়।

আমার যেন লাগ্‌ল ভারী ভালো,—
চেয়ে দেখি আকাশখানা এক্কেবারে কালো।
কালো হ'ল বকুলতলা,
কালো চাঁপার বন,
কালো জলে দিয়ে পাড়ি
আস্‌ল মাঝি তাড়াতাড়ি,
কেমন জানি করল আমার মন।

—ঝড় কারে মা কয়?
আমার মনে হয়,—
কাদের যেন ছেলে,
কালির দোয়াত কেমন করে' হঠাৎ দিল ফেলে,
যেমন করে' কালি—
আমি তোমার মেঝের উপর ঢালি।

হাসল কোমল ঠোঁটটি মেলে
ভীষণ কেমন আগুন জ্বেলে
আকাশ বারে বারে,
আবার বুঝি ঘুরে ঘুরে
পালিয়ে গেল অনেক দূরে
সাত সাগরের পারে।





দোল্‌না

দিনেশ দাশ

আজকে ছোট দোল্‌নাখানি ঝুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

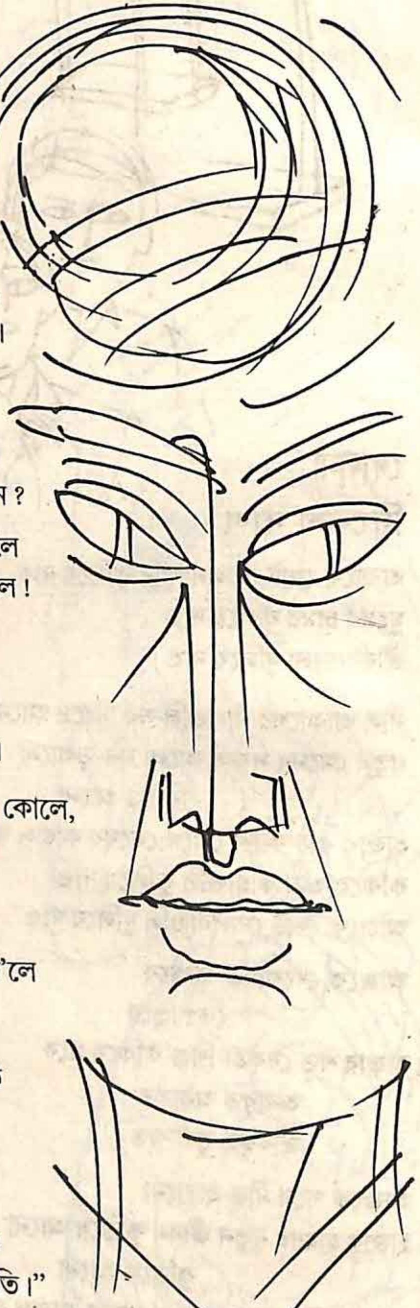
নীল আকাশের নীলগুলি সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মন-ভুলানো
নিংড়ে আনো
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে-ওঠা কান্নাগুলি ভুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোল্‌নাগুলি দুলিয়ে দাও

আজকে দেশের এ-প্রান্তরে
তেপান্তরে
হাজার শত দেব্‌তা-শিশু ককিয়ে মরে
অনাবৃত অনাদৃত
জীবন্মৃত স্তুপীকৃত।

আজকে পথে নীড়-হারানো
হাজার হাজার নতুন জীবন কুড়িয়ে আনো
কুড়িয়ে আনো
হাজার কচি শুকনো চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
কান্নাহাসির দোল্‌নাখানি দুলিয়ে দাও ॥

চাঁদ ও আমি

সুশীল রায়



নাম রেখেছি পরমজ্যোতি, কী যে নামের মানে,
যে রেখেছে নামটি, কেবল সেই বুঝি তা জানে।
কখনো সে মায়ের কোলে,
কখনো-বা দোলায় দোলে,
কে জানে সে এতটা কাল ছিল যে কোন্‌খানে!
নামের কোনো মানে থাকে? থাকে নামের মানে?

আকাশ থেকে অমন করে জ্যোৎস্না যে ওই ঢালে
তার নামটি চাঁদ রেখেছে কে-যে সে কোন্ কালে!
নামের মানে কেউ কি খোঁজে?
চাঁদ বলতে চাঁদই বোঝে,
যায় যদি সে কখনো দু-চোখের আড়ালে
তাকে ছোঁয়ার জন্যে উঁচু আকাশপিদিম জ্বালে।

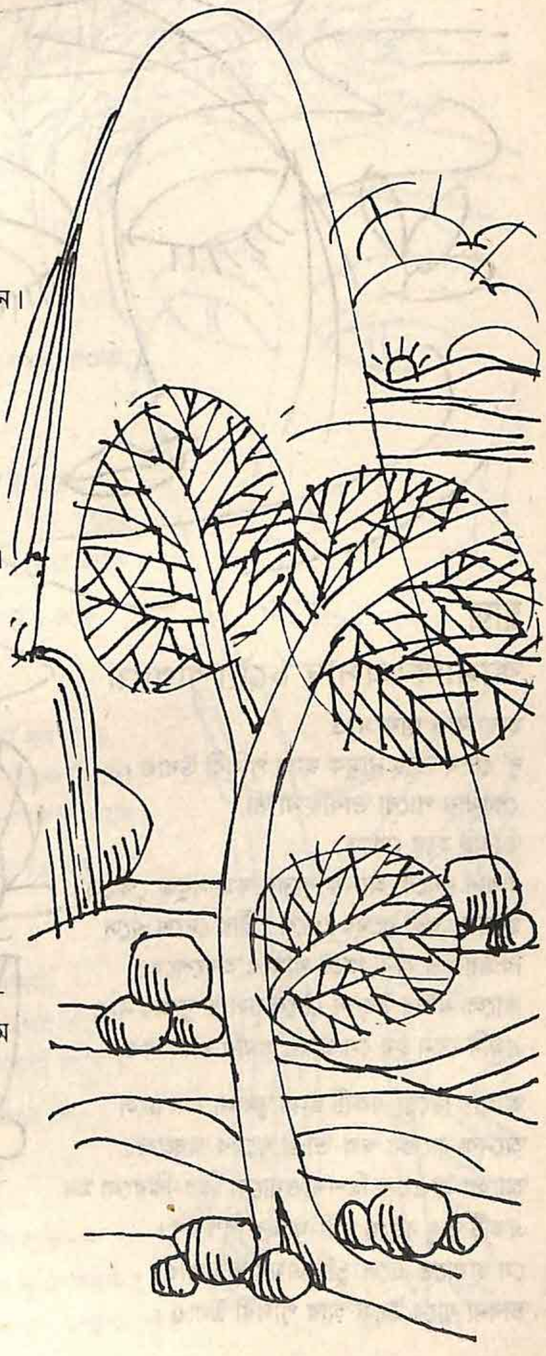
আজকে যে ওই দুলছে দোলায়, ঢুলছে মায়ের কোলে,
জাগবে যখন, তখন তাকে থামাবে কী ব'লে?
বলবে সে, "আর ছোটটি নই,
আরও অনেক বড় হবই,
দোলনা সরাও, কোলের থেকে নামিয়ে যাও চ'লে
বেঁধে রাখলে বড় হতে পারব কি তা হলে?"

আজকে যাকে দেখছি এমন ছোটর ছোট অতি
সব সময়ই দৃষ্টি রাখা চলেছে যার প্রতি
একদা সেই অবাক ক'রে
হয়তো যাবে দেশান্তরে
ফিরে আসবে, ভাবব, আহা যে ছিল এক-রতি
এটা কি সেই? জবাব পাব, "আমি পরমজ্যোতি।"

অমাবস্যার দেশ পেরিয়ে ফিরে আপন দেশে
কলায়-কলায় চন্দ্র বাড়ে এই ভাবে অক্লেশে।

মুনিয়ার জন্যে দুনিয়ার গল্প

হরপ্রসাদ মিত্র



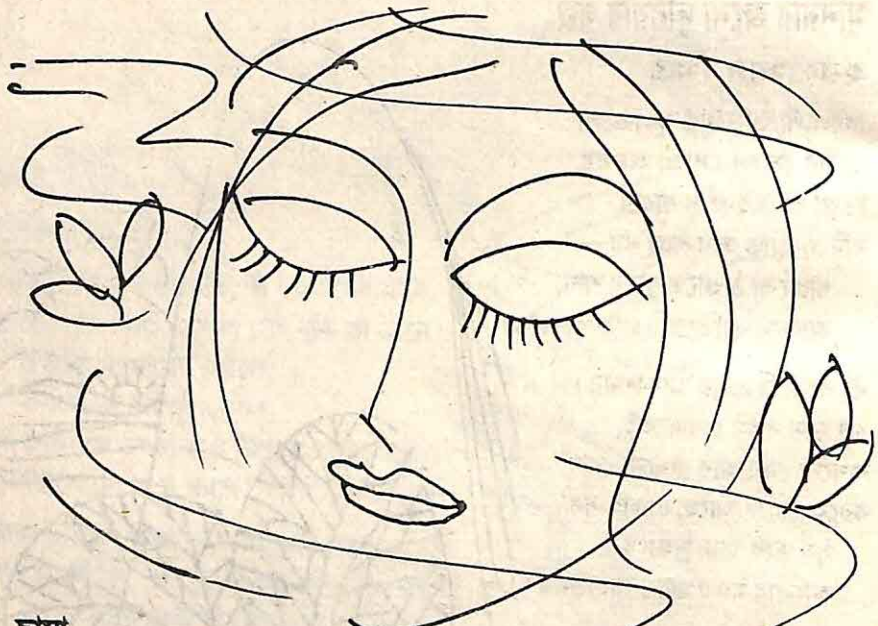
গোলাপী গুঁড়িগুঁড়ি ফুলগুলো
চেরীর সোজা-সোজা অঙ্গময়,
তিস্তা বইছেই ক্ষীণ ধারায়
যদিও স্রোত তার শান্ত নয়—
ধারালো ঠাণ্ডাতে ছুরির শাণ,
আগুনে তাতিয়েছি হাত-পা-কান।

কী বড়ো হিমালয় আকাশময়!
সে যেন বল্লম চারদিকেই,
কখনো মেঘ আর কখনো রোদ,
বরফে ঢেকে আছে, ঢাকাই সব।
সূর্য ডুবে যায়, সন্ধ্যা হয়,
আলোর মালা জ্বলে পাহাড়ময়।

গভীর রাত্তির ঠাণ্ডা চুপ,
কখনো জ্যোৎস্নায় কী ঝিম্‌ঝিম্‌!
দু'চোখ বুজলেই অন্য রূপ—
এবং প্রজাপতি ফুলগুলো
ফুটবে আজেলিয়া অনর্গল,
শাদা বা বেগ্‌নি বা চুনেহলুদ!

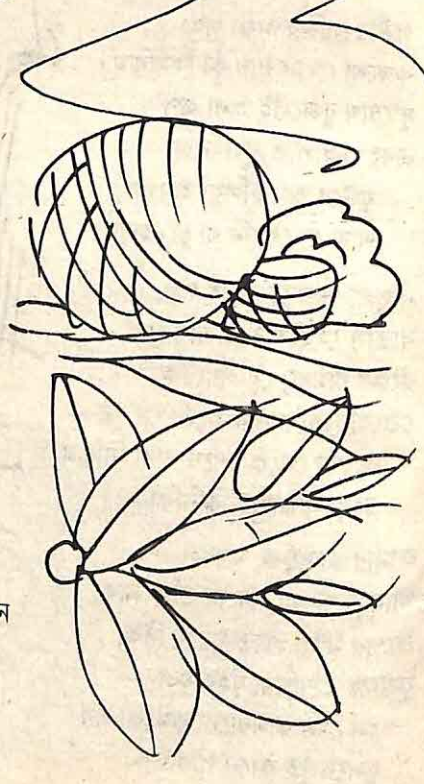
নাথুলা-সংকটে চড়াই পথ,
বাতাস সেইদিকে বাজায় সুর;
রঙের রামধনু যে-গ্যাংটক
ভেবেছি কতোবার কতো সে দূর—
রংপো থেকে শেষে সারা সিকিম
রক্তে বাজছেই ঝিনিকিঝিন্‌।

লামার ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রবল—
থ্যাব্‌ড়া কারো, কারো তীক্ষ্ণ নাক,
জপের মালা হাতে ঘুরছে ঠিক,
ফুটেছে ডোম্বিয়া বৃহৎ ফুল—
সে যেন ঝাম্‌রানো ঝুমকো সব
দুল্‌বে দুই কানে পার্বতীর।



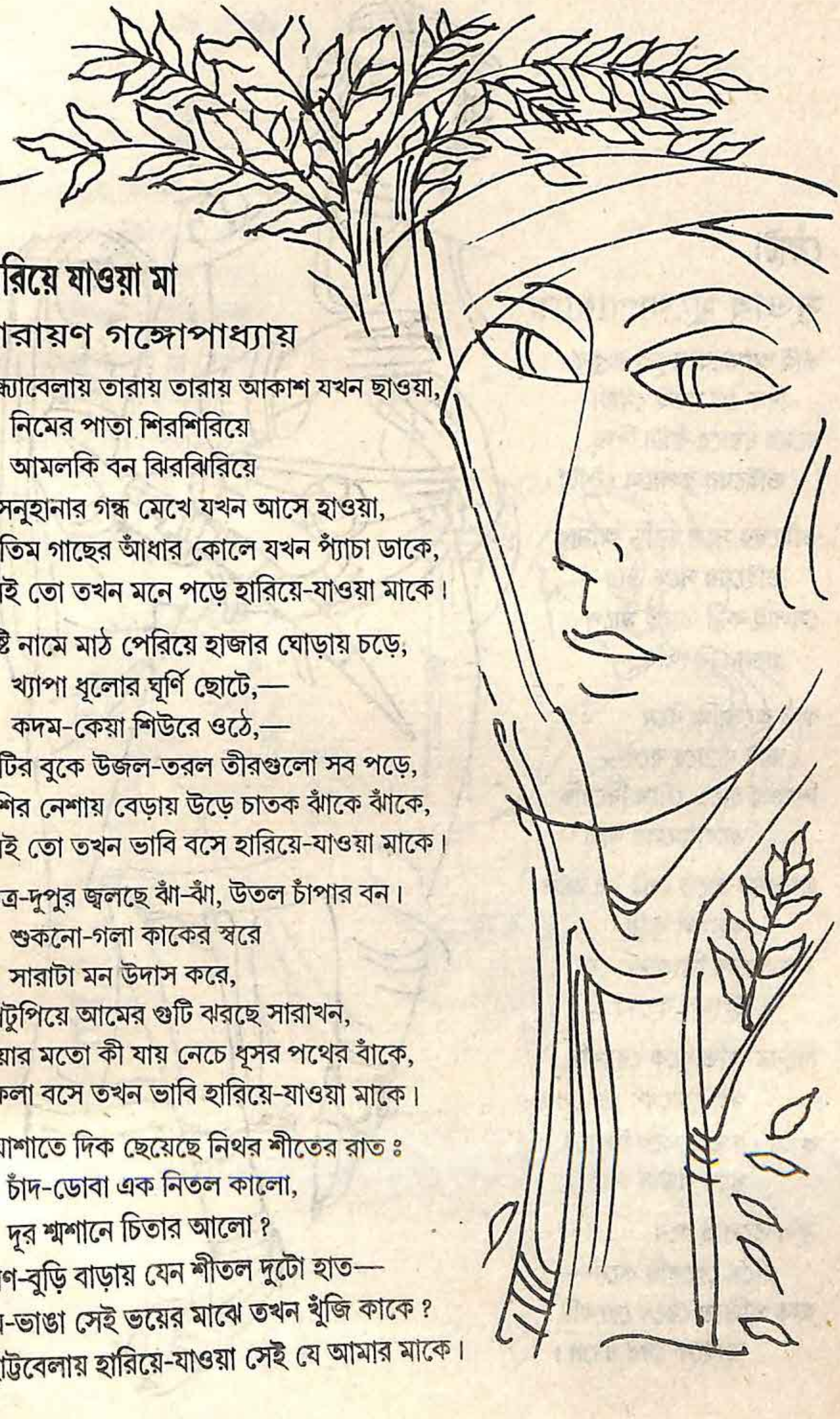
ছায়া

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



ছায়া দাও ছায়া দাও
দু' চোখ ভরে নামুক ছায়া পৃথিবী উধাও।
কোথায় পাবো ভাবছি না তা
ভাবছি হবে পেতে,
এখান থেকে অনেক দূরের স্বপ্ন-সবুজ ক্ষেতে।
ছায়ায় ঘেরা ঘুমের দেশে পরীর দেশে এসে
বিস্মরণের অন্য ঘাটে থামবে অবশেষে।
কালো নদীর উজান ঠেলে চলছে ঘুমের নাও
এম্‌নি যেন হয় সে ছায়া, এমনি ছায়া দাও।

আমায় দিয়ো একটি ছায়া তুলনা যার চলে
অনেক রাতের স্বপ্ন-ভাঙা ঘুমের অঞ্চলে।
আলো-হাওয়ার মিশখাওয়ানো ঝির-ঝিরনো মন
একটি শুধু বইছে নদী-ঘুমের বিস্মরণ।
সে ছায়াতে এলে তুমি এমন দৃষ্টি পাও
ভাবনা যাবে উড়ে আর পৃথিবী উধাও।



হারিয়ে যাওয়া মা

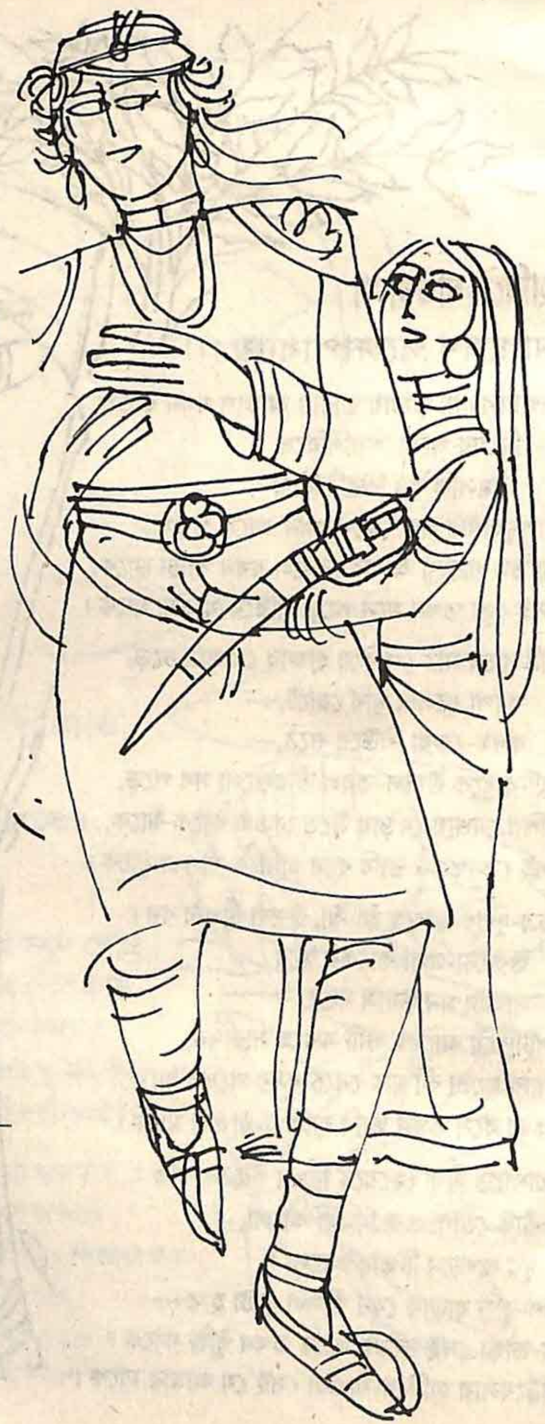
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলায় তারায় তারায় আকাশ যখন ছাওয়া,
    নিমের পাতা শিরশিরিয়ে
    আমলকি বন ঝিরঝিরিয়ে
হাসনুহানার গন্ধ মেখে যখন আসে হাওয়া,
ছাতিম গাছের আঁধার কোলে যখন প্যাঁচা ডাকে,
সেই তো তখন মনে পড়ে হারিয়ে-যাওয়া মাকে।

বৃষ্টি নামে মাঠ পেরিয়ে হাজার ঘোড়ায় চড়ে,
    খ্যাপা ধূলোর ঘূর্ণি ছোটে,—
    কদম-কেয়া শিউরে ওঠে,—
মাটির বুকে উজল-তরল তীরগুলো সব পড়ে,
খুশির নেশায় বেড়ায় উড়ে চাতক ঝাঁকে ঝাঁকে,
সেই তো তখন ভাবি বসে হারিয়ে-যাওয়া মাকে।

চৈত্র-দুপুর জ্বলছে ঝাঁ-ঝাঁ, উতল চাঁপার বন।
    শুকনো-গলা কাকের স্বরে
    সারাটা মন উদাস করে,
টুপটুপিয়ে আমের গুটি ঝরছে সারাখন,
ছায়ার মতো কী যায় নেচে ধূসর পথের বাঁকে,
একলা বসে তখন ভাবি হারিয়ে-যাওয়া মাকে।

কুয়াশাতে দিক ছেয়েছে নিথর শীতের রাত ঃ
    চাঁদ-ডোবা এক নিতল কালো,
    দূর শ্মশানে চিতার আলো ?
মরণ-বুড়ি বাড়ায় যেন শীতল দুটো হাত—
ঘুম-ভাঙা সেই ভয়ের মাঝে তখন খুঁজি কাকে ?
ছোট্টবেলায় হারিয়ে-যাওয়া সেই যে আমার মাকে।



ফোঁটা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভাই আমাকে বকুক ঝকুক
দিক গে যতই খোঁটা—
যমের দুয়ারে কাঁটা দিচ্ছ
ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।

ভাইয়ের সঙ্গে আড়ি আমার
ভাইয়ের সঙ্গে ভাব—
সেলাই করি তারই মাপে
রাজার কিংখাব।

কাঠ কুড়োচ্ছি বনে
ভাই রয়েছে রণে—
নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছি
তরোয়ালের খাপ।

ভাইয়ের হাতে সেই যে অসি
ঝলমল করে।
অন্ধকারের সিংহাসন যে
টলমল করে।

দিনের স্মৃতি বুকে রেখেছি,
স্বপ্ন চোখের কোলে—
কখন যে ভাই ঘরে ফিরবে
ঘুমে পড়ছি ঢ'লে।

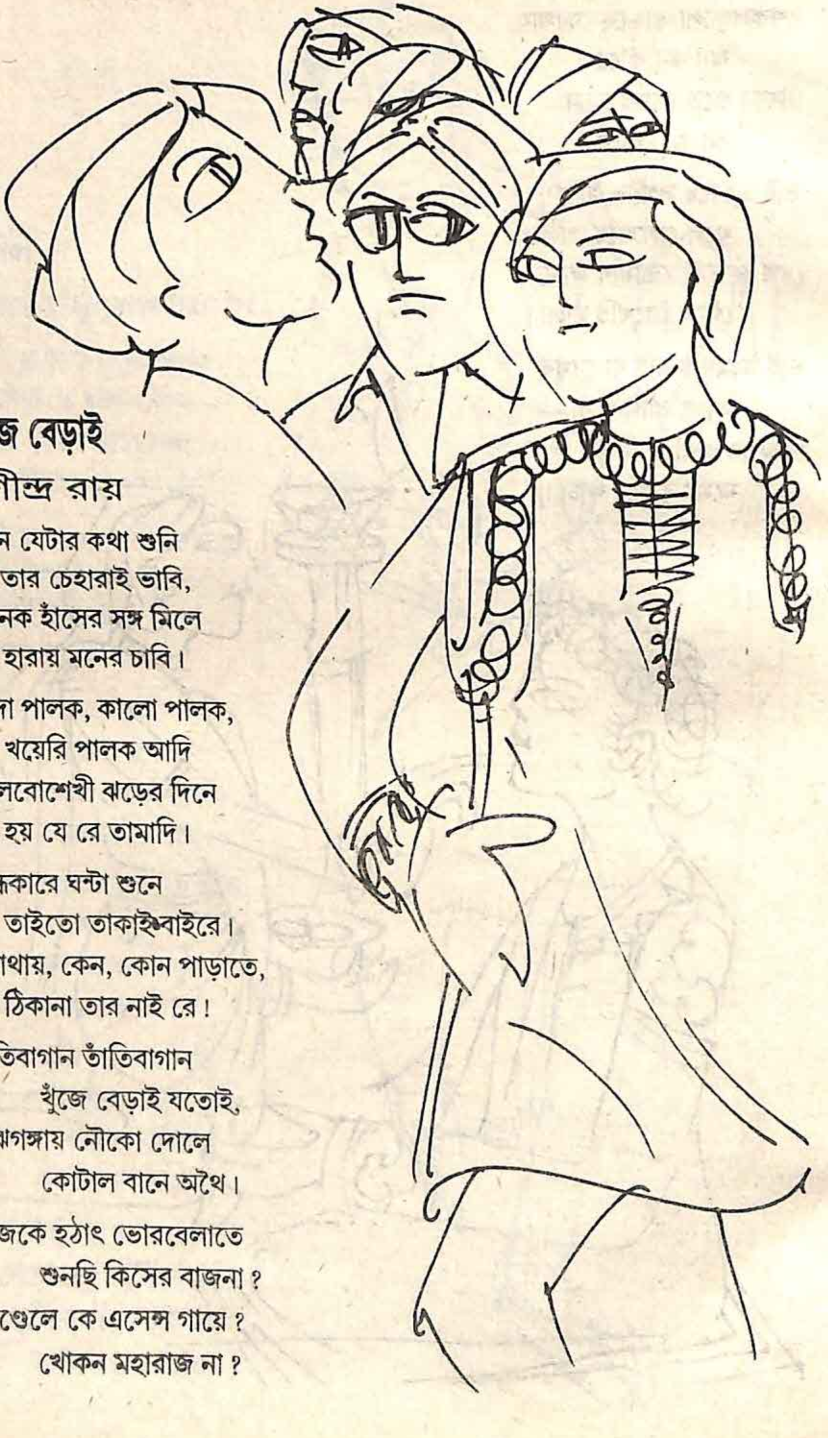
ফুল তুলেছি বনে
দেখে রেখেছি কনে—
হাত পুড়িয়ে রেঁধে রেখেছি
ভাইকে দেব ব'লে।

শেকলগুলো ভাঙছে কোথায়
ঝন্ ঝন্ ক'রে
নিশান ওড়ে রথের চাকা
বন্ বন্ ঘোরে।

ভাই এনেছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি
খুলে ফেলেছে তালা
দেখ ও ভাই, তোমার জন্যে
গেঁথে রেখেছি মালা।

ভাই আমাকে নাই বা দেখুক
মারুক লাথি ঝাঁটা—
ভাইয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা
যমের দুয়ারে কাঁটা ॥





খুঁজে বেড়াই

মণীন্দ্র রায়

যখন যেটার কথা শুনি
তার চেহারাই ভাবি,
অনেক হাঁসের সঙ্গ মিলে
হারায় মনের চাবি।

শাদা পালক, কালো পালক,
খয়েরি পালক আদি
কালবোশেখী ঝড়ের দিনে
হয় যে রে তামাদি।

অন্ধকারে ঘন্টা শুনে
তাইতো তাকাই বাইরে।
কোথায়, কেন, কোন পাড়াতে,
ঠিকানা তার নাই রে!

হাতিবাগান তাঁতিবাগান
খুঁজে বেড়াই যতোই,
মাঝগঙ্গায় নৌকো দোলে
কোটাল বানে অথৈ।

আজকে হঠাৎ ভোরবেলাতে
শুনছি কিসের বাজনা?
প্যাণ্ডেলে কে এসেন্স গায়ে?
খোকন মহারাজ না?



ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘর ফুটপাথ
আহার বাতাস,
ন্যাংটো ছেলেটা
দেখছে আকাশ।

সেখানে এখন
টেক্কা সাহেব
বিবি ও গোলাম—
রাজ্যের তাস

সবাই ব্যস্ত ;
সবাই করছে
চাঁদ সূর্য ও
তারাদের চাষ ;

সবাই চাইছে
রাজত্ব,আর
সবাই লিখছে
দারুণ গল্প।

সেই শুধু ফুট-
পাথের ন্যাংটো
ছেলে, তাই তার
বুদ্ধি অল্প—

দূর থেকে তাই
দেখছে দৃশ্য।
দেখছে এবং
দিচ্ছে সাবাস!



সাপ বাঘের সঙ্গে

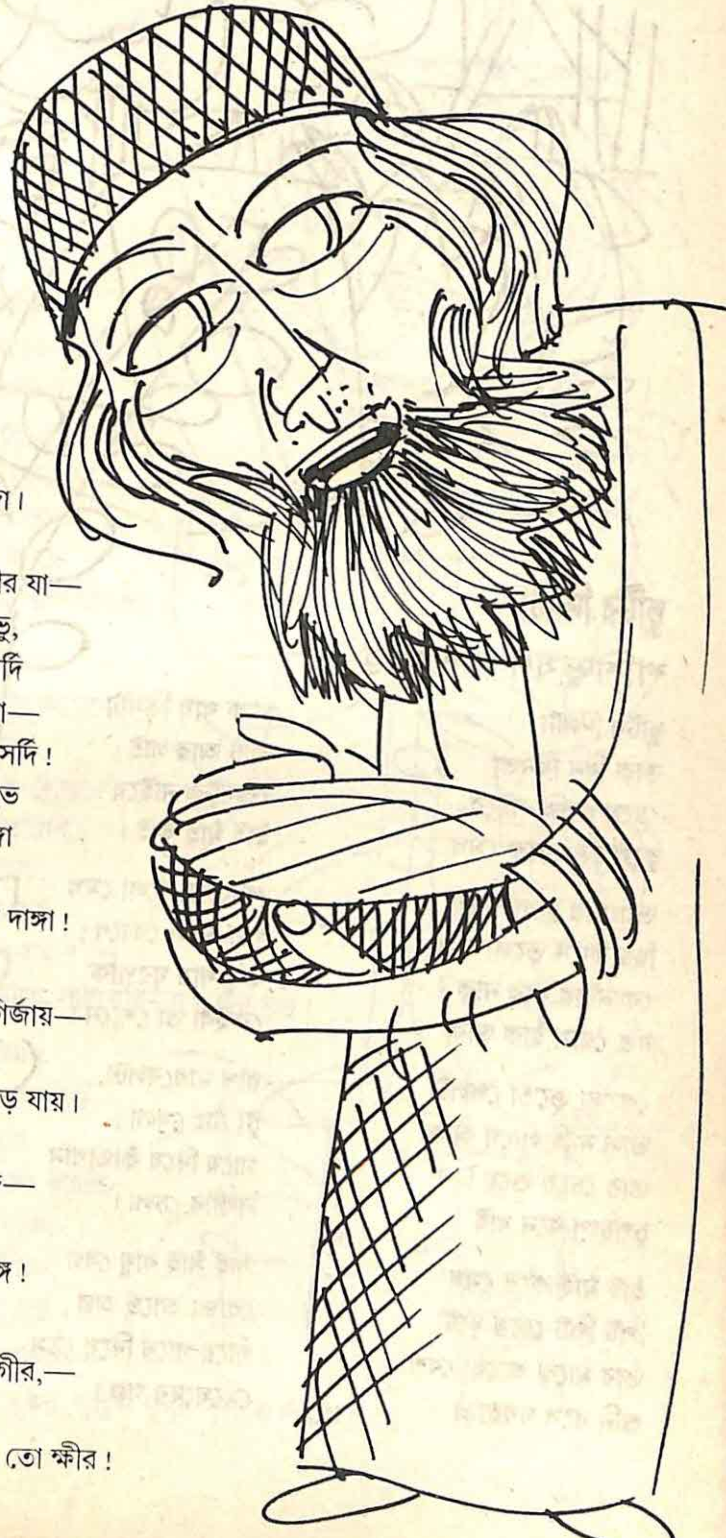
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বাঘের সঙ্গে কেই বা আপোস করে ?
হালুম হুলুম মানুষখেকো যে বাঘ ?
চাকা চাকা দাগ গায়ে, ঝোপঝাড়ে চরে,
সবার ভাগেই বসাতে চায় যে ভাগ ?
আমরা সভ্য মানুষ—তাই না ? তাই
আমরা বাঘশিকারীরা শিকারে যাই।

গোখরো সাপের সঙ্গে কে ঘর করে ?
ভাঙা ঘরের পোড়ো ভিটেয় গর্ত থেকে
যে-সাপ রাতবিরেতে উঠে ফণা ধরে
হিসহিসে, কিলবিল করে এঁকেবেঁকে ?
আমরা সভ্য মানুষ—তাই না ? তাই
বিষদাঁত ভাঙি আমরা সাপুড়ে ভাই।

তবু যদি, ধরো, আজ কেউ এসে বলে :
মনের দুঃখে বাঘ সে ভালমানুষ
সব ছেড়েছুড়ে হিমালয়ে যাবে চলে।
কিংবা ঃ মনুর বিধানে গজালো হুঁশ
সাপের মগজে, তাই কাশী তাকে ডাকে !
এমন যে লোক, কী জবাব দেবো তাকে !

আমরা সভ্য মানুষ—তাই না ? তাই
বলবো ঃ গোখরো সাপের চোখ প্রবাল
বশীকরণের, ও চোখে চেয়ো না ভাই,
টলটল বিষে সর্বনাশ আড়াল,
সবুর, হাতের আড়ালে যে বাঘ-নখ।
সবুর, সবুর, আমরা মারতে পারি
সাপকে, বাঘকে—যত সে চতুর হোক ;
আমরা সাপুড়ে, আমরা বাঘশিকারী।



ক্ষীর

মনোজিৎ বসু

কান্দাহারের বান্দা ছিল
ইস্কান্দার মির্জা।
ইস্পাহানী গোরুর দুধে
সে বানাত ক্ষীর যা—
তেমন ক্ষীরের স্বাদটি কভু,
পাননি আলিবর্দি
কেমন ক'রে পাবেন বলো—
তাঁর যে খালি সর্দি!
কিন্তু সে-ক্ষীর খেয়ে ক্লাইভ
হয়ে ভীষণ চাঙ্গা
পলাশিতে দৌড়ে গিয়ে
লাগিয়ে দিলেন দাঙ্গা!

দাঙ্গা জিতে ক্ষীরের হাঁড়ি
নিয়ে গেলেন গির্জায়—
একটুখানি ক্ষীরের লোভে
পিছন পিছন ভিড় যায়।
তেমন ভিড়ও হয়নি পরে
অখণ্ড সেই বঙ্গে—
মীরজাফরও ক্ষীরের চাঁছি
খেয়েছিলেন রঙ্গে!

সে-ক্ষীর এখন বানায় শুনি
মানিকলাল খাস্তগীর,—
তার কাছে যা, গাইবাঁধাতে
খানিক লাল চাস তো ক্ষীর!



ছুটির দিনটা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

ছুটির দিনটা
তাক ধিন্ ধিন্তা
চেয়ে দেখি বাইরে
হুল্লোড়ে ডাকে মেঘ

ভ্যাংচায় হুলো মেঘ
ছিচ কাঁদে ভুলো মেঘ
কোনটার ধরে নাক
যত রোস হাঁক ডাক

কেলো ভূতো পেলটা
ভাল নাহি লাগে আজ
তার চেয়ে শুয়ে টান
চুপচাপ বনে যাই

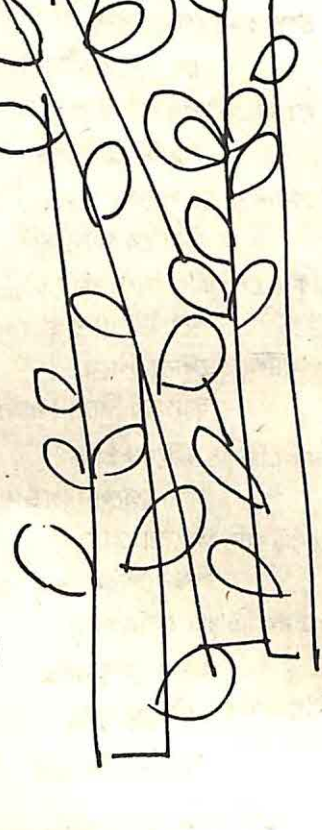
হাঁই মাঁই করে মেঘ
পিট্ পিট্ চোখ দুটো
তার মাঝে আছো বেশ
শুনি বসে ঘরছাড়া

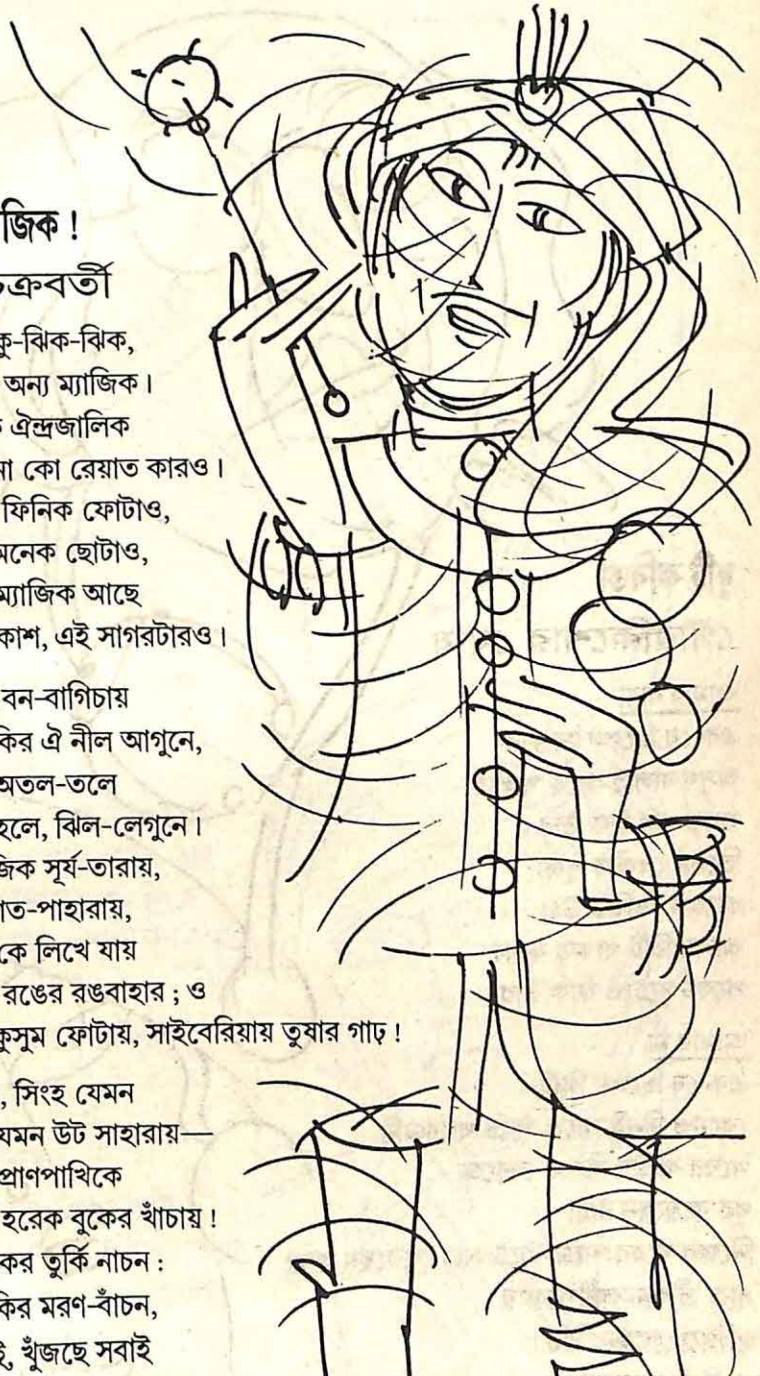
পাক খায় তিনটা
নাচি আর গাই ;
রোদটুকু নাইরে
হাঁই মাঁই কাঁই।

ল্যাংচায় নুলো মেঘ
পথ ভুলে কোণে ;
বায়ু খায় ঘুরপাক
কেইবা তা শোনে !

রাখ মারবেলটা,
টুং টাং খেলা ;
গায়ে দিয়ে কাঁথাখান
লক্ষ্মীর চেলা।

সাঁই সাঁই বায়ু বেগ
বোজা আছে অল্প ;
গায়ে গায়ে দিয়ে ঠেস
মেঘেদের গল্প।





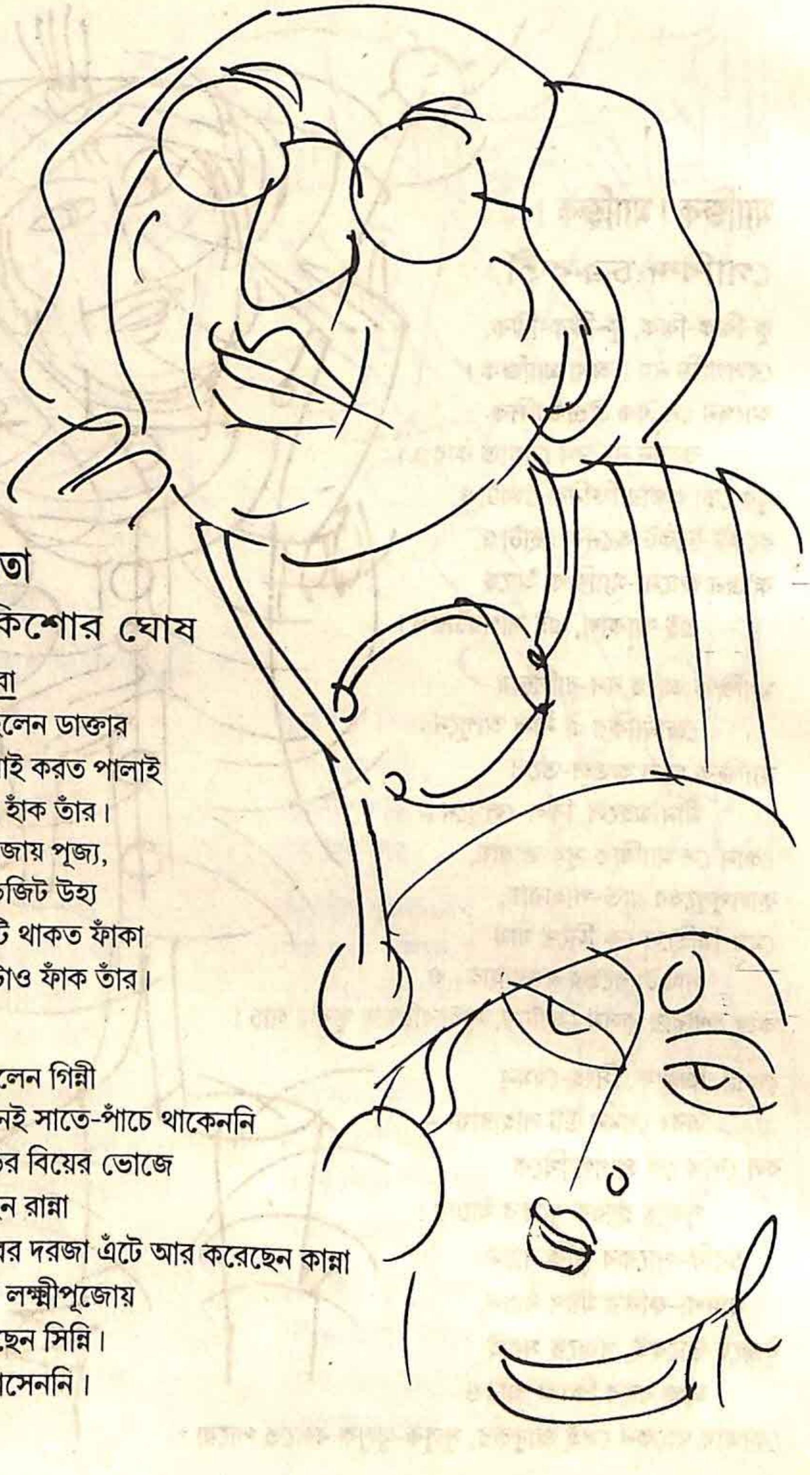
ম্যাজিক ! ম্যাজিক !

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কু-ঝিক-ঝিক, কু-ঝিক-ঝিক,
রেলগাড়ি নয়। অন্য ম্যাজিক।
আছেন সে এক ঐন্দ্রজালিক
করেন না কো রেয়াত কারও।
খুব তো কথার ফিনিক ফোটাও,
রকেট-টকেট অনেক ছোটাও,
ক'জন জানো-ম্যাজিক আছে
এই আকাশ, এই সাগরটারও।

ম্যাজিক আছে বন-বাগিচায়
জোনাকির ঐ নীল আগুনে,
ম্যাজিক চলে অতল-তলে
মীন-মহলে, ঝিল-লেগুনে।
কোন সে ম্যাজিক সূর্য-তারায়,
কালপুরুষের রাত-পাহারায়,
মেঘ-মিছিলে কে লিখে যায়
সাতটা রঙের রঙবাহার ; ও
কার ইশারায় কুসুম ফোটায়, সাইবেরিয়ায় তুষার গাঢ় !

জেব্রা, জিরাফ, সিংহ যেমন
এবং যেমন উট সাহারায়—
বল্ দেখি কে প্রাণপাখিকে
পুষছে হরেক বুকের খাঁচায় !
চরকি-পাকের তুর্কি নাচন :
বাদশা-ফকির মরণ-বাঁচন,
খুঁজছে তাকেই, খুঁজছে সবাই
লক্ষ বছর কিংবা আরও—
কোথায় থাকেন সেই জাদুকর, সুলুক-মুলুক বলতে পারো ?



দুটি কবিতা

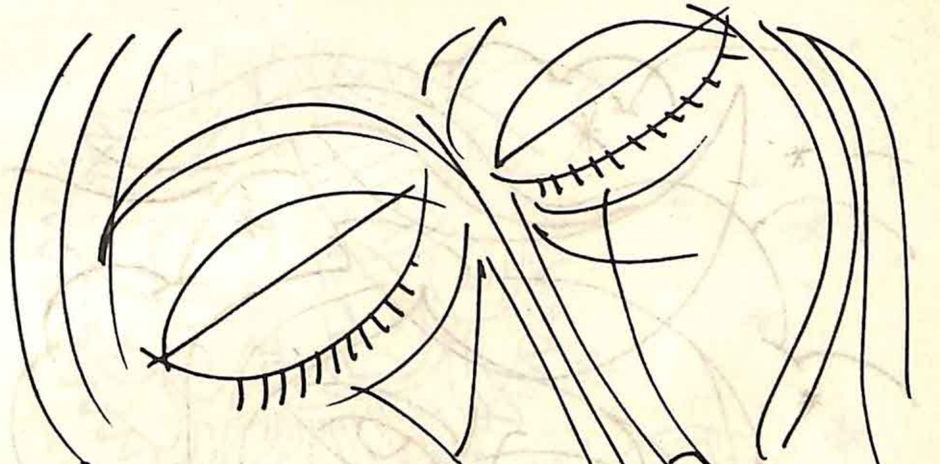
গৌরকিশোর ঘোষ

আমার বাবা

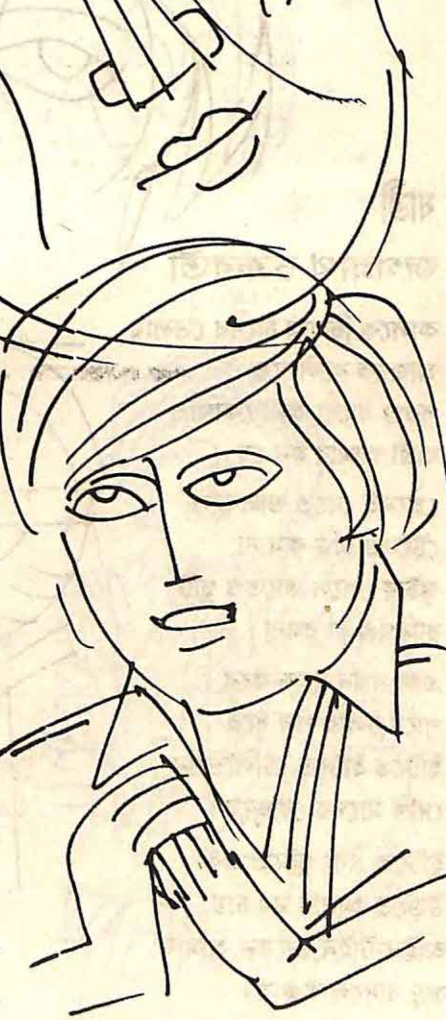
এক যে ছিলেন ডাক্তার
অসুখ বালাই করত পালাই
শুনত যদি হাঁক তাঁর।
ছিলেন বেজায় পূজ্য,
কাজেই ভিজিট উহ্য
আলমারিটি থাকত ফাঁকা
পকেট দুটোও ফাঁক তাঁর।

আমার মা

এক যে ছিলেন গিন্নী
কোনও দিনই সাতে-পাঁচে থাকেননি
পরের বাড়ির বিয়ের ভোজে
খুব করেছেন রান্না
নিজের ঘরের দরজা এঁটে আর করেছেন কান্না
সারা জীবন লক্ষ্মীপুজোয়
জুগিয়ে গেছেন সিন্নি।
না, তিনি আসেননি।

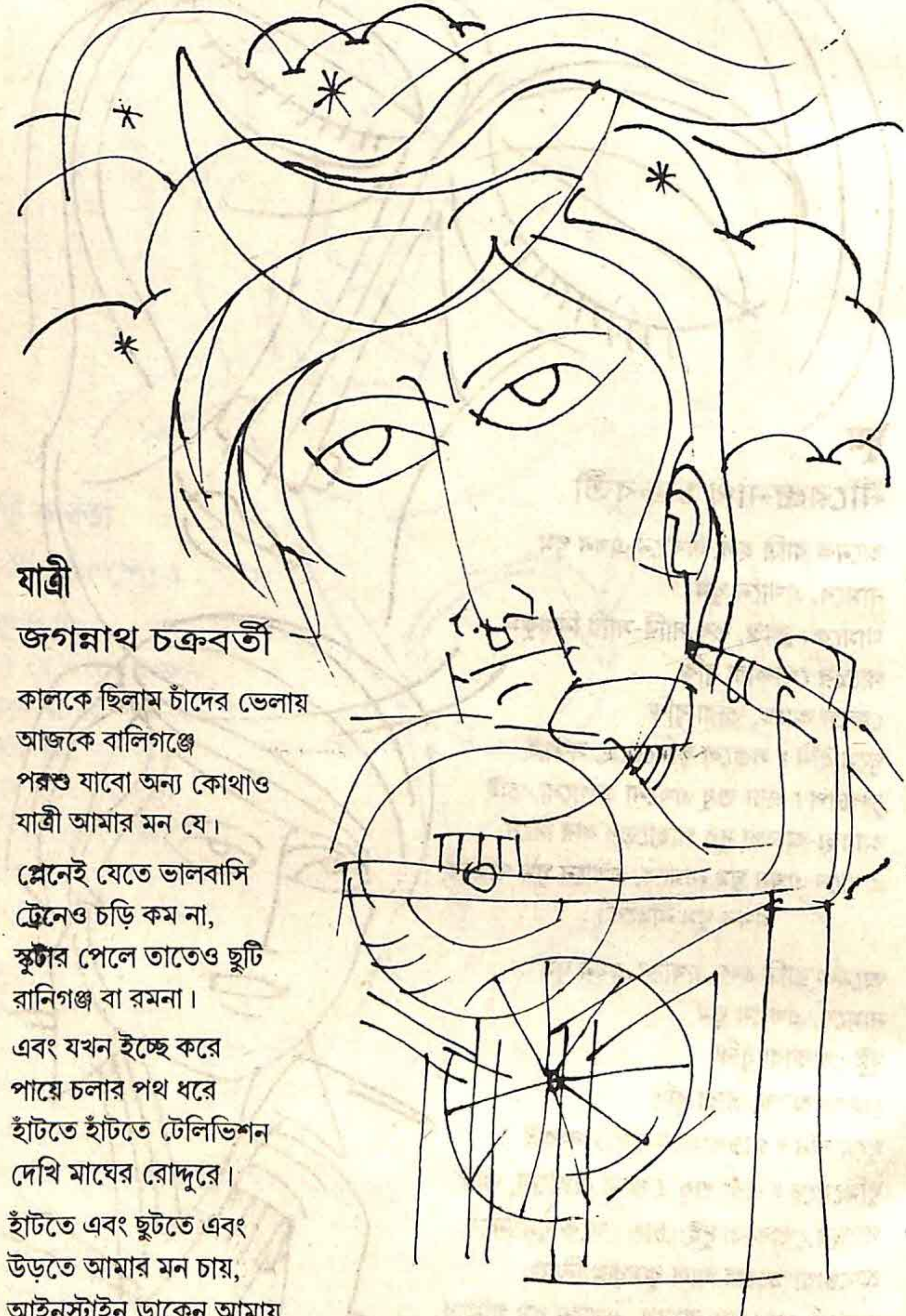


ঘুম
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



অনেক রাত্রি হল, এখানে এখন ঘুম
নামবে, এখানে ঘুম
থামবে। ক্লান্ত, তবু সারি-সারি নিঝ্‌ঝুম
গাছের খোকারা বুঝি
জেগে আছে, তারা বুঝি
ঘুমোইনি ? সক্কলে ঘুমিয়েছে, সব্বাই
চুপচাপ। এরা শুধু এখনো জাগ্‌নো, তাই
আবছা-আবছা দূর পাহাড়ের ধার দিয়ে
এখানে এখন ঘুম নামবে, এখানে ঘুম থামবে,
এখন ঘুম নামবে।

অনেক রাত্রি হল, এখানে এখন ঘুম
নামবে, এখানে ঘুম
দুষ্টু খোকারা বুঝি
জেগে আছে, তারা বুঝি
ঘুমোয়নি ? গাছপালা মাঠঘাট সব্বাই
ঘুমিয়েছে ? এরা শুধু এখনো জাগ্‌নো, তাই
গাছের খোকারা দুই চোখ থেকে ঘুম নিয়ে
আবছায়া স্বপ্নের লাল কুমকুম নিয়ে
এখানে এখন ঘুম নামবে, এখানে ঘুম থামবে,
এখন ঘুম নামবে।



যাত্রী

জগন্নাথ চক্রবর্তী

কালকে ছিলাম চাঁদের ভেলায়
আজকে বালিগঞ্জে
পরশু যাবো অন্য কোথাও
যাত্রী আমার মন যে।

প্লেনেই যেতে ভালবাসি
ট্রেনেও চড়ি কম না,
স্কুটার পেলে তাতেও ছুটি
রানিগঞ্জ বা রমনা।

এবং যখন ইচ্ছে করে
পায়ে চলার পথ ধরে
হাঁটতে হাঁটতে টেলিভিশন
দেখি মাঘের রোদ্দুরে।

হাঁটতে এবং ছুটতে এবং
উড়তে আমার মন চায়,
আইনস্টাইন ডাকেন আমায়
ঝড় বাদলে ঝঞ্ঝায়।



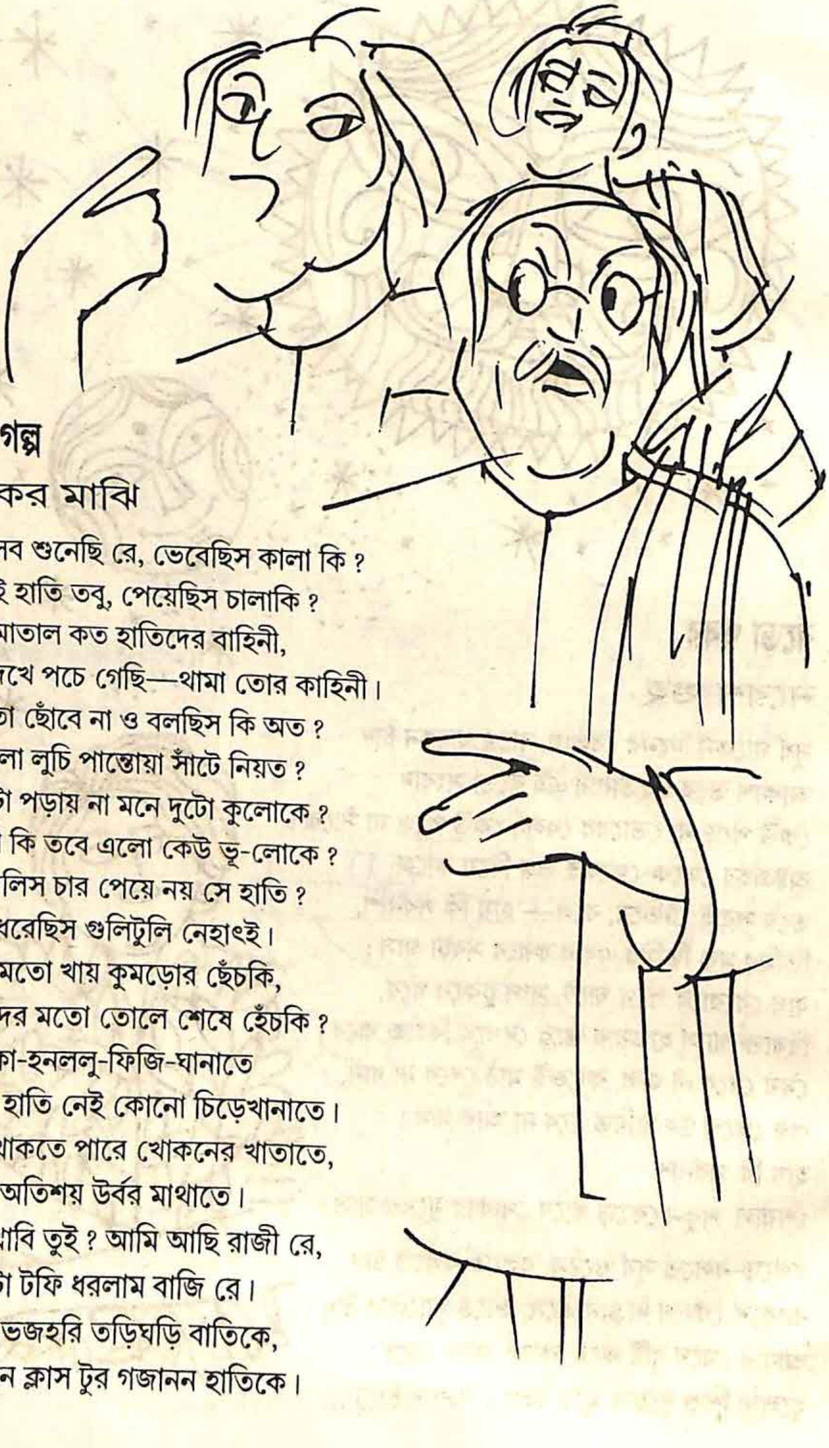
বড়ো খবর

নরেশ গুহ



সূর্য থাকেন দিনের বেলায়, রাত্রে থাকেন চাঁদ
আকাশ ভরে গ্রহতারায় এই বড়ো সংবাদ
কেউ পড়ে না ভোরের বেলা, কেউ পড়ে না সাঁঝে।
অষ্টপ্রহর থেকে-থেকেই ভঙ্গ দিয়ে কাজে
ভয়ে সবাই চেঁচিয়ে, বলে—'হায় কি সর্বনাশ,
তিমির মত তিমির এবার করবে সবটা গ্রাস ;
বাঘ বেরোবে পথে ঘাটে, সাপ ঢুকবে ঘরে,
বিষাক্ত গ্যাস হাওয়ার স্তরে দেখবে বিরাজ করে।
মেঘ দেবে না জল, কাজেই মাঠ দেবে না ধান,
কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হবে না আর গান !
হায় কি সর্বনাশ
শেয়াল শকুন কেড়ে খাবে খোকার মুখের গ্রাস।

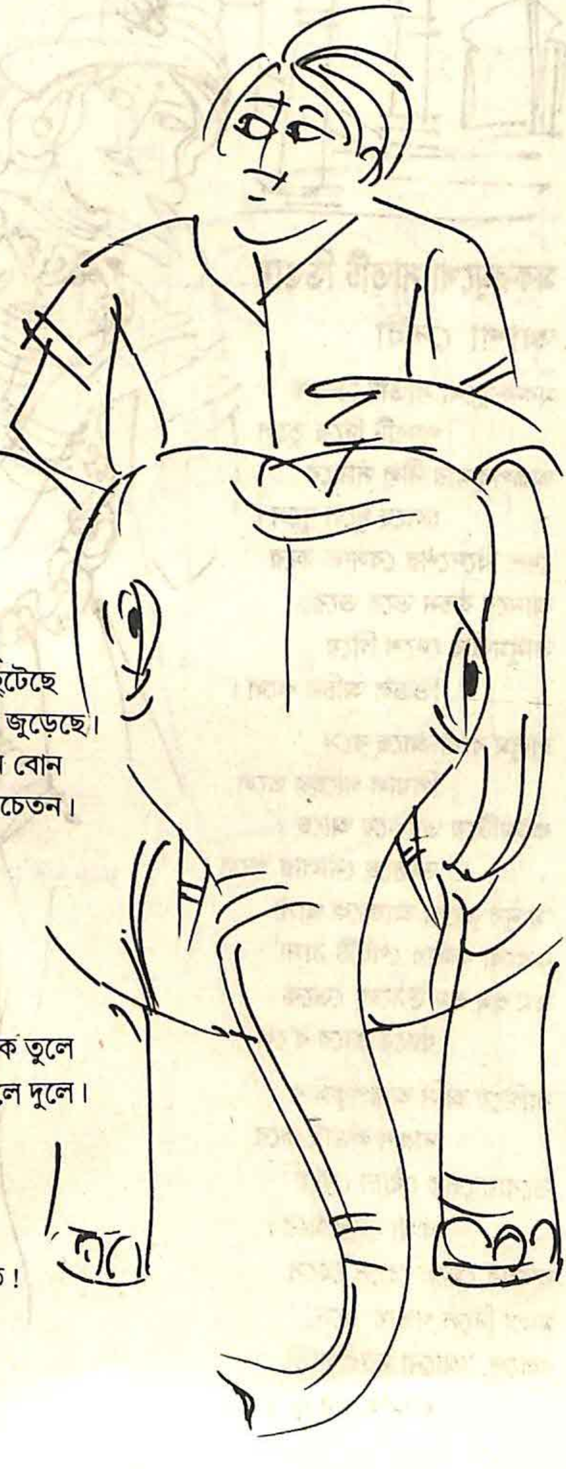
বলতে-বলতে সূর্য ওঠেন, বলতে-বলতে চাঁদ
আকাশ কোণে দাঁড়ান এসে, ভাঙে আলোর বাঁধ।
আবার মেঘে বৃষ্টি ঝরে, ফসল ফলে মাঠে ঃ
ধুলোর শিশু দুচোখ মুছে টলতে টলতে হাঁটে॥



হাতির গল্প

প্রভাকর মাঝি

হ্যাঁ হ্যাঁ সব শুনেছি রে, ভেবেছিস কালা কি ?
শুঁড় নেই হাতি তবু, পেয়েছিস চালাকি ?
দাঁতাল মাতাল কত হাতিদের বাহিনী,
দেখে দেখে পচে গেছি—থামা তোর কাহিনী।
কলাপাতা ছোঁবে না ও বলছিস কি অত ?
থালা থালা লুচি পান্তোয়া সাঁটে নিয়ত ?
কান দুটো পড়ায় না মনে দুটো কুলোকে ?
ছদ্মবেশে কি তবে এলো কেউ ভূ-লোকে ?
আবার বলিস চার পেয়ে নয় সে হাতি ?
বুঝলাম ধরেছিস গুলিটুলি নেহাৎই।
মানুষের মতো খায় কুমড়োর ছেঁচকি,
এবং তাদের মতো তোলে শেষে হেঁচকি ?
কামস্কাটকা-হনললু-ফিজি-ঘানাতে
এ আজব হাতি নেই কোনো চিড়েখানাতে।
হ্যাঁ, শুধু থাকতে পারে খোকনের খাতাতে,
নয় তোর অতিশয় উর্বর মাথাতে।
জ্যান্ত দেখাবি তুই ? আমি আছি রাজী রে,
আস্ত একটা টফি ধরলাম বাজি রে।
কথা শুনে ভজহরি তড়িঘড়ি বাতিকে,
ডেকে আনে ক্লাস টুর গজানন হাতিকে।



পিঙ্কের হাতি

রাম বসু

পিঙ্কে বলে, হাতি
তোর বুকের হাতি
কতো ?
হাতি বললে, নাতি
তোর, মাথায় ধরি ছাতি
র'তো !

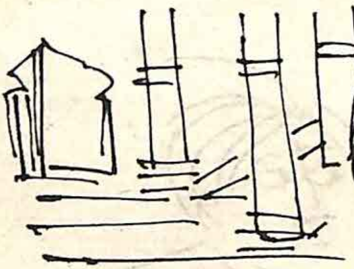
শুঁড় বাগিয়ে চিরুণী-দাঁতী যেমনি ছুটেছে
বীর পালোয়ান পিঙ্কে তখন কান্না জুড়েছে।
মা এলেন, বাবা এলেন আর এলেন বোন
কেঁদে কেঁদে পিঙ্কে তখন প্রায় অচেতন।

মা বললে, হাতি, সোনা
একটুখানি শো'না।
পিঙ্কে চড়বে তোর পিঠে
খাবে হাওয়া মিঠে।

ঢিপ্-কপালী চিরুণ-দাঁতী শুঁড়ে তাকে তুলে
ধপাস করে বসিয়ে পিঠে চলল হেলে দুলে।

হাতির পিঠে চড়ে
পিঙ্কে তড়বড়ে
বললে হেঁকে, হাতি
তোর চেয়ে ঢের বড়ো আমার ছাতি !

হেসে বললে হাতি
তা হবে, তা হবে, তাই তুমি নাতি।





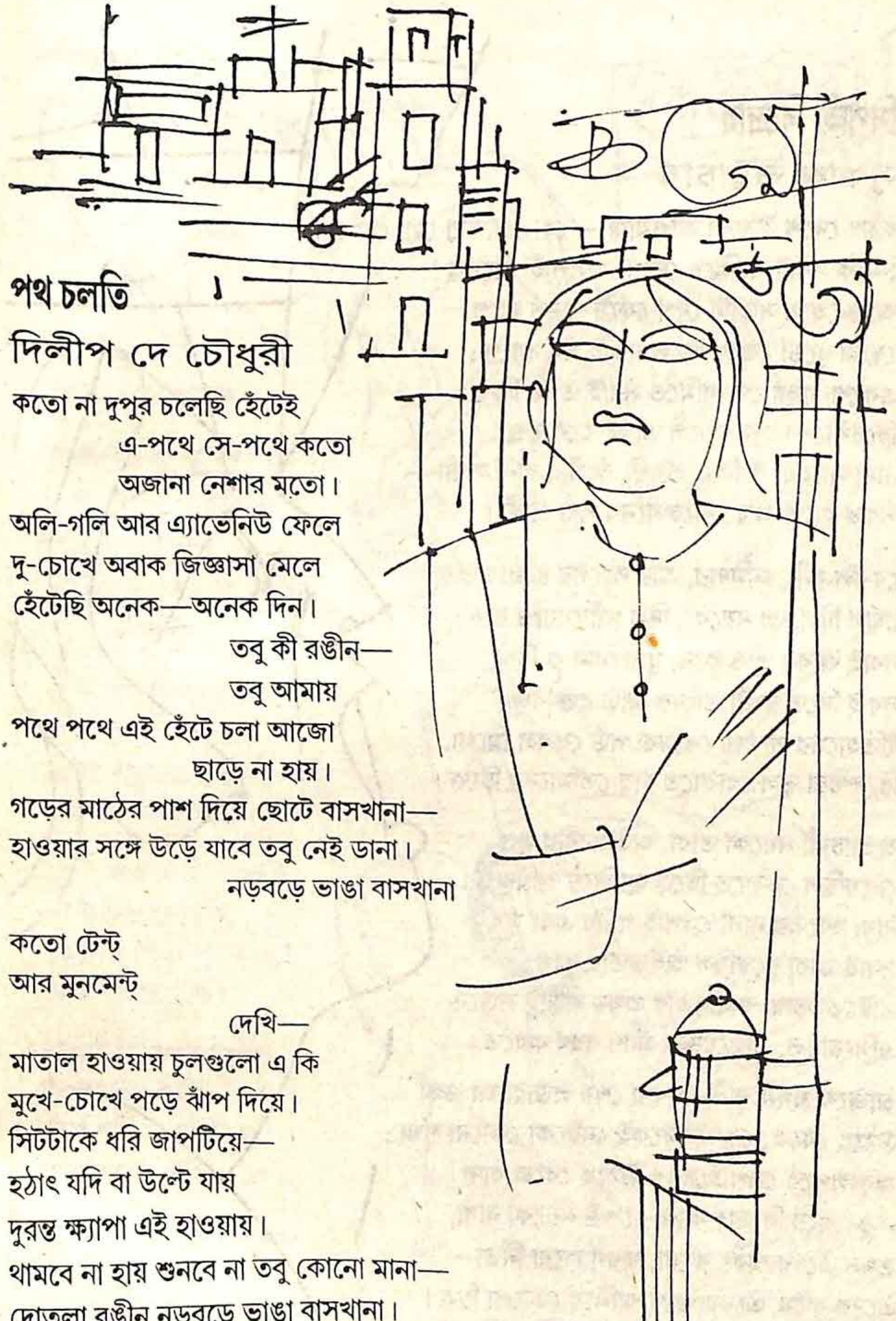
মকরমুখো সাতটি ডিঙায়

আশা দেবী

মকর-মুখো সাতটি ডিঙায়
পালটি দিয়ে তুলে
অরূপকুমার নীল সায়রে
চলছে দুলে দুলে।
দেশ বিদেশের বেসাত করে
আনবে রতন ভরে ভরে,
ভানুমতীর দেশে গিয়ে
ভিড়ল অচিন কূলে।

হালুম বাঘা আছে বসে
পিয়াল গাছের তলে,
কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে
ভাসছে নোলার জলে।
'মানুষ এলো আজকে খাসা
করবো ফলার পেটটি ঠাসা'
হুম্ হুম্ হুম উঠলো ডেকে
ধরবে তারে ব'লে

বাগিয়ে অসি অরূপকুমার
দারুণ লড়াই করে
তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে
বাঘা গেল মরে।
রাজার মেয়ে হেসে হেসে
মালা দিলে গলায় এসে,
বললে, 'আনো মটর গাড়ী
তাইতে যাব চড়ে।'

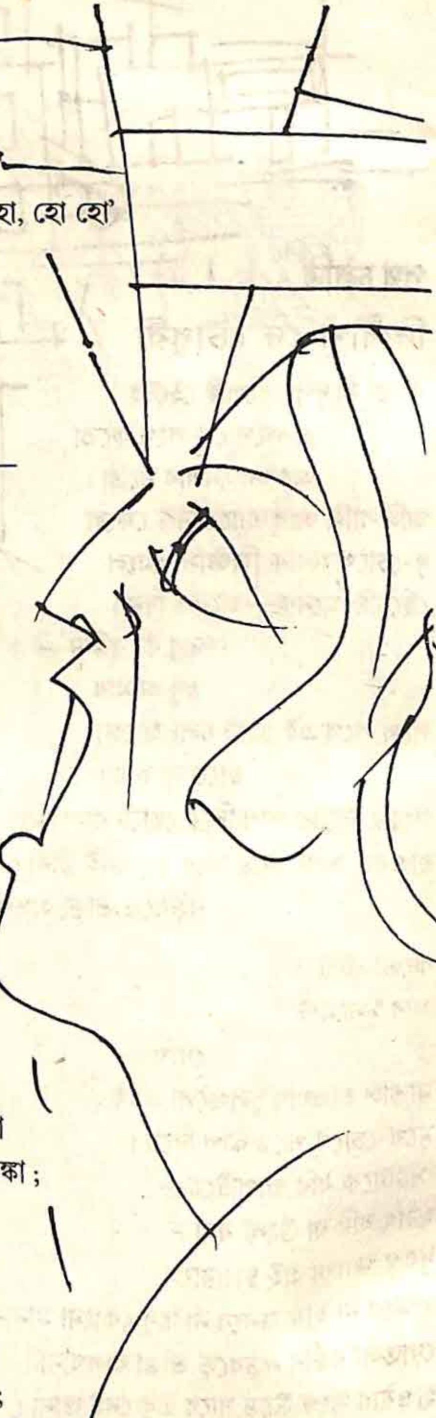


পথ চলতি

দিলীপ দে চৌধুরী

কতো না দুপুর চলেছি হেঁটেই
এ-পথে সে-পথে কতো
অজানা নেশার মতো।
অলি-গলি আর এ্যাভেনিউ ফেলে
দু-চোখে অবাক জিজ্ঞাসা মেলে
হেঁটেছি অনেক—অনেক দিন।
তবু কী রঙীন—
তবু আমায়
পথে পথে এই হেঁটে চলা আজো
ছাড়ে না হায়।
গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে ছোটে বাসখানা—
হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যাবে তবু নেই ডানা।
নড়বড়ে ভাঙা বাসখানা

কতো টেন্ট্
আর মুনমেন্ট্
দেখি—
মাতাল হাওয়ায় চুলগুলো এ কি
মুখে-চোখে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে।
সিটটাকে ধরি জাপটিয়ে—
হঠাৎ যদি বা উল্টে যায়
দুরন্ত ক্ষ্যাপা এই হাওয়ায়।
থামবে না হায় শুনবে না তবু কোনো মানা—
দোতলা রঙীন নড়বড়ে ভাঙা বাসখানা।
হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যাবে তবু নেই ডানা।



সিপাহী বিদ্রোহ

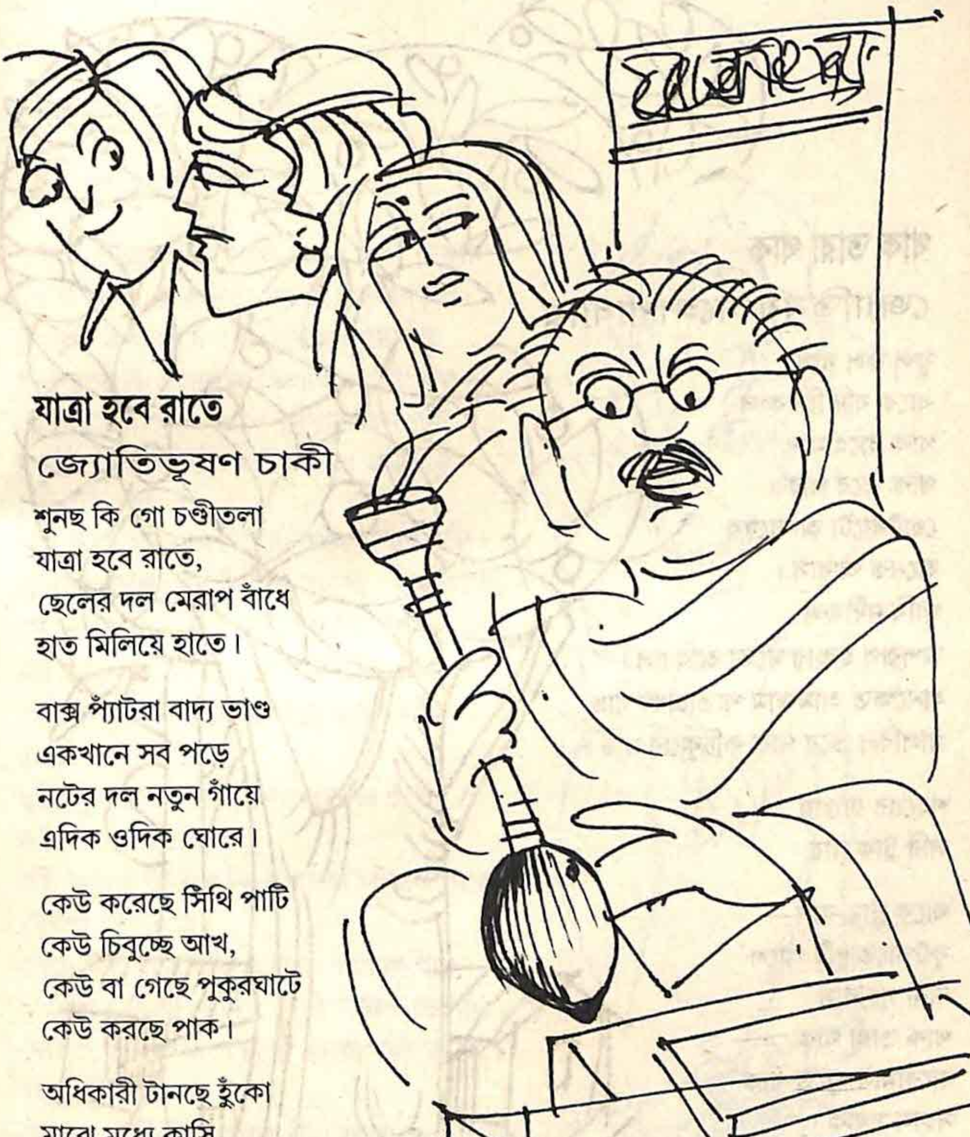
সুকান্ত ভট্টাচার্য

হঠাৎ দেশে উঠলো আওয়াজ—'হো হো, হো হো, হো হো'
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে—সিপাহী বিদ্রোহ!
আগুন হয়ে সারাটা দেশ ফেটে পড়ল রাগে,
ছেলে বুড়ো জেগে উঠল নব্বই সন আগে ;
একশো বছর গোলামিতে সবাই তখন ক্ষিপ্ত,
বিদেশীদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত!
নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মী—
সবার হাতে অস্ত্র ; নাচে বনের পশু পক্ষী।

কেবল ধনী, জমিদার, আর আগের রাজার ভক্ত
যোগ দিল, তা নয়কো, দিল গরীবেরাও রক্ত!
সবাই জীবন তুচ্ছ করে, মুসলমান ও হিন্দু,
সবাই দিতে রাজী তাদের প্রতি রক্তবিন্দু ;
ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড় কেবল মিথ্যে,
বিদেশীরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে।

অত্যাচারী নয়কো তারা, অত্যাচারীর মুণ্ড
চেয়েছিল ফেলতে ছিড়ে জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড।
নানা জাতের নানা সেপাই গরিব এবং মূর্খ
সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ ;
তাইতো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে
এগিয়েছিল, এগিয়েছিল মরণ বরণ করতে।

আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা
উঠছে বেজে, কোনোদিকেই নেইকো কোনো শঙ্কা ;
জব্বলপুরে সেপাইদেরও উঠছে বেজে বাদ্য
নতুন করে বিদ্রোহ আজ ; কেউ নয়কো বাধ্য,
তখন এঁদের স্মরণ করো, স্মরণ করো নিত্য—
এঁদের নামে, এঁদের গুণে শানিয়ে তোলো চিত্ত।
নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মী ;
এঁদের নামে, দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি ?



যাত্রা হবে রাতে

জ্যোতিভূষণ চাকী

শুনছ কি গো চণ্ডীতলা
যাত্রা হবে রাতে,
ছেলের দল মেরাপ বাঁধে
হাত মিলিয়ে হাতে।

বাক্স প্যাঁটরা বাদ্য ভাণ্ড
একখানে সব পড়ে
নটের দল নতুন গাঁয়ে
এদিক ওদিক ঘোরে।

কেউ করেছে সিঁথি পাটি
কেউ চিবুচ্ছে আখ,
কেউ বা গেছে পুকুরঘাটে
কেউ করছে পাক।

অধিকারী টানছে হুঁকো
মাঝে মধ্যে কাসি,
হঠাৎ শুনি হা-হা-হা-হা
মহিষাসুরের হাসি।

মাচার ওপর ছোট্ট দোকান
চলছে বিকিকিনি,
রাতের বেলা যাত্রা হবে
মহিষমর্দিনী।



থাক তারা থাক

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

ফুল ফল ঘাস
থাকে যদি চিরকাল
থাক বারোমাস।
থাক ভরে থাক।
ছোটখাটো আমাদের
অনেক আবাস।
পাখি নদীজল
অপরূপ ইচ্ছার মতো অবিকল।
ধানক্ষেত আমজাম পাতাঢাকা গাছ
খালবিল ভরে থাক কচিকুচো মাছ।

শহরের রাস্তায়
লরি ট্রাক্ যায়

থাকে ট্রাম-বাস—
ফুটপাতে দুটি পাশে
নানা গৃহাবাস
থাক তারা থাক
বারোমাস জুড়ে থাক
সহাস সবাক।
মানুষের সংসার জুড়ে হাঁকডাক
শহরেও থাক তারা গ্রামেতেও থাক

শহরের থেকে গ্রামে নিয়ে যাবে ডাক।
আর থাক মাঝখানে মানুষের মন
পৃথিবীর মতো বড় হয়তো অমন
চিরকাল বারোমাস থাক অকৃপণ॥

বেদের মেয়ে

সুশীলকুমার গুপ্ত



বেদের মেয়ে গলির পথে আসে যখন পাড়ায়
চমকে ওঠে ছেলেবুড়ো সকলে তার সাড়ায়।
ডুগডুগিটা বাজিয়ে নাচে ঘুর্ণি হাওয়ার মত,
শূন্য দুপুর ভরে গানের ভেলকি দেখায় কত।
রঙবেরঙের সাজে তাকে দেখায় যেন পরী,
হালকা মেঘের রূপে এসে মিলায় তড়িঘড়ি।
চুপি চুপি বলি,—
ভাব করে তার নাম দিয়েছি কনকচাঁপার কলি।
লুকিয়ে তাকে এনে দি'চাল, পয়সা, ছেঁড়া কাপড় ;
সে দেয় আমায় কত রকম কাঠের মালা, পাথর।
মন্ত্র পড়ে শূন্যলোকে পাঠায় কত কি যে,
প্রজাপতির মূর্তি হয়ে হাওয়ায় ওড়ে নিজে।
এমনি করে কাটে
ছুটির দুপুরবেলা তারি খেয়ালখুশির হাটে।
ক'দিন পরে তারে—
বলি আমায় উড়িয়ে নিতে পারো আকাশ পারে,
যেথায় আমার মা
গেছে ছায়াপথে দিদির খোঁজে আকাশ গাঁ ?
ছাড়বো না আর তোমায়, তুমি অনেক ভেলকি জানো,
দোহাই, আমায় নিয়ে চলো কিংবা খবর আনো।
বলে দুষ্টু হেসে—
তোমায় আমি নিয়ে যাবো নীল আকাশের দেশে।
পরের দিনের থেকে পাড়ায় আর তো আসেনি সে ;
জানি নাকো আমার উপর রাগ করেছে কিসে !
তবে কি সে দিদিমায়ের স্নেহের সুধা পেয়ে
ভুলে গেছে,—আমি যে তার রয়েছি পথ চেয়ে।
হঠাৎ হলে দেখা—
বোলো, খোকন তার আশাতে কাটায় ছুটি একা।



ঘুম পাড়ানি

রাজলক্ষ্মী দেবী



রাত ঝুম্ ঝুম্, স্তব্ধ নিঝুম্, হাওয়ায় ফাঁদ
জানালার পাশে মিটিমিটি হাসে হলদে চাঁদ।
ঘুমোও খুকুন, য্যাত্তটুকুন গল্প বাকি ?
তারাগুলো সব নিথর, নীরব দেখছ তা কি ?
আইভিলতায় রাত ঘুম যায়, ঘুমোয় লতা,
ঘুমে অচেতন সবাই, এখন কিসের কথা ?
চাঁদ ডুবে যায়, আঁধার ঘনায়, ঝিমোয় হাওয়া
খুকুন ঘুমোয়, লক্ষ চুমোয় অধর-ছাওয়া।
জানালার পাশে তারাগুলি হাসে চিক্‌চিকিয়ে
রাতের আকাশ বারবার ওঠে ঝিকমিকিয়ে।
জুজুবুড়ী যতো আজকের মতো পালাও তবে,
রাক্ষস, ডান, দাও পিঠটান এবার সবে।
খুকুর শিয়রে থাক যতো পরী হালকা পাখা,
মিষ্টি যাদের পরশ, চাঁদের জ্যোছনা-মাখা।
সারারাত তারা সজাগ পাহারা রাখবে ওকে
স্বপনের ডালি দেবে ভ'রে খালি ঘুমেল চোখে।



মিঠু

সিদ্ধেশ্বর সেন

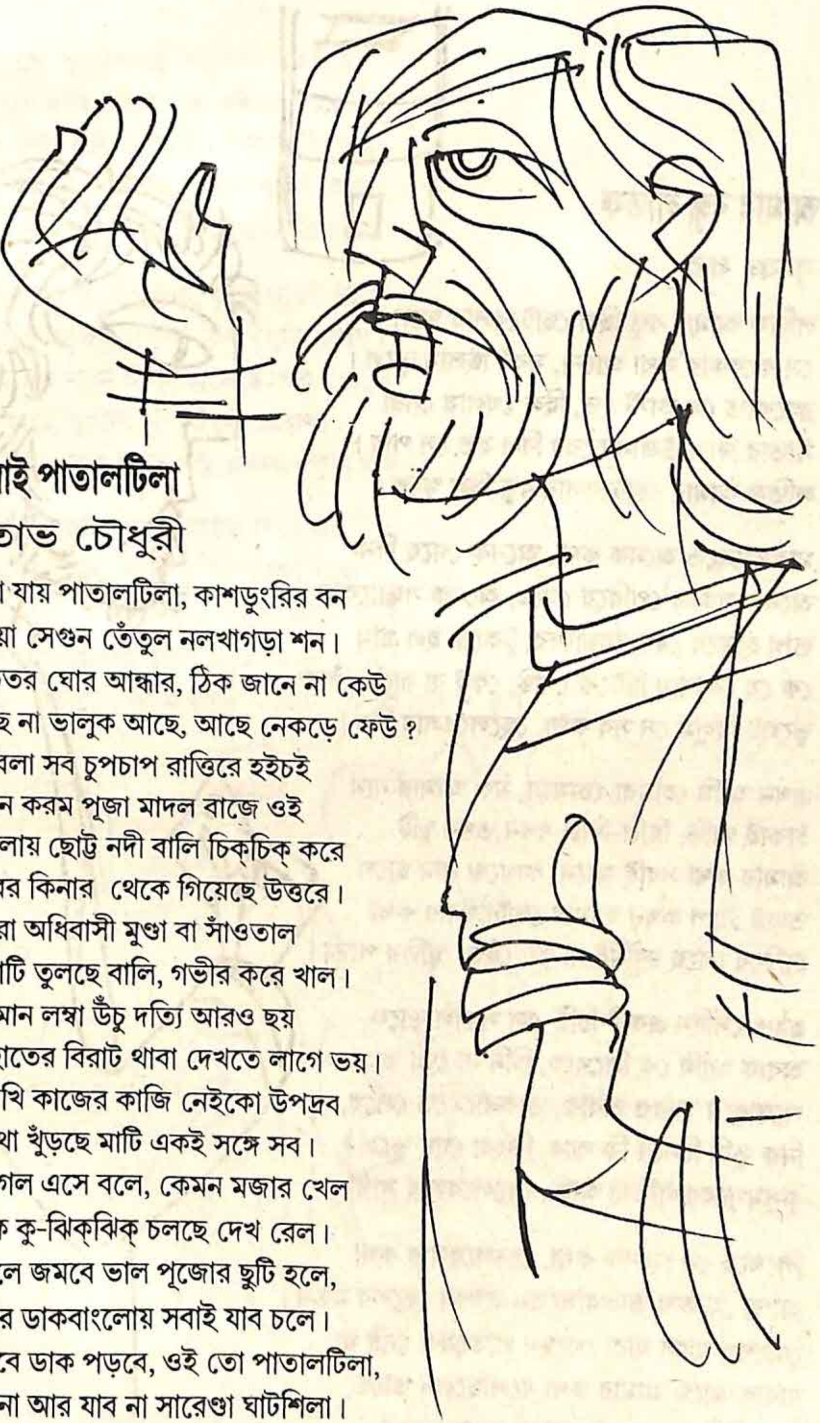
মিঠু নামে যদি হয় মিঠা
তোমায় তবে ডাকা উচিত তিতা।
দু' একদিনের আলাপেই সাব্যস্ত
করতে হল, একটা হেস্ত নেস্ত
আজকে নেহাৎ মানায় ভালো কী তা?
—জন্মদিনের মজা মিঠুর মাটি,
যেই না বলা তেতো, অমনি কান্নাকাটি।
শেষকালেতে করতে হ'ল রফা
ওরও খানিক ; আমার খানিক
দু'জনের দুই দফা
কানে কানে যেই বলেছি অমনি
খুশী খাঁটি।
উঠলো নেচে 'কী মজারে'
নতুন নামের মিতা।।



ভোর

অরবিন্দ গুহ

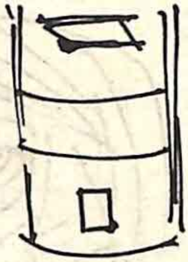
ভোর।
তোমাদের চোখে এখনো কি আছে
পুরনো রাতের ঘোর!
ভোর।
সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে
ডেকে বলে ঃ খোলো দোর,
ভোর।
চালাও তোমার সপ্ত বল্‌গা
স্বর্ণরথের জোর,
কান পেতে শোনো সূর্যের তোড়জোড় ;
কুয়াশায় ভেজা সবুজ মাঠেও
এসেছে মিঠেল ভোর।।



চলো যাই পাতালটিলা

অমিতাভ চৌধুরী

ওই দেখা যায় পাতালটিলা, কাশডুংরির বন
শাল মহুয়া সেগুন তেঁতুল নলখাগড়া শন।
বনের ভিতর ঘোর আন্ধার, ঠিক জানে না কেউ
বাঘ আছে না ভালুক আছে, আছে নেকড়ে ফেউ ?
দিনের বেলা সব চুপচাপ রাত্তিরে হইচই
ধরম থানে করম পূজা মাদল বাজে ওই
টিলার তলায় ছোট্ট নদী বালি চিক্‌চিক্ করে
তারা ঘরের কিনার থেকে গিয়েছে উত্তরে।
বনের যারা অধিবাসী মুণ্ডা বা সাঁওতাল
কাটছে মাটি তুলছে বালি, গভীর করে খাল।
টিলার সমান লম্বা উঁচু দত্যি আরও ছয়
লোহার হাতের বিরাট থাবা দেখতে লাগে ভয়।
ওরাও দেখি কাজের কাজি নেইকো উপদ্রব
টুঁড়ছে মাথা খুঁড়ছে মাটি একই সঙ্গে সব।
একটা পাগল এসে বলে, কেমন মজার খেল
নদীর বুকে কু-ঝিক্‌ঝিক্ চলছে দেখ রেল।
রেল চললে জমবে ভাল পূজোর ছুটি হলে,
কাশডুংরির ডাকবাংলোয় সবাই যাব চলে।
ঢাক বাজবে ডাক পড়বে, ওই তো পাতালটিলা,
আর যাব না আর যাব না সারেণ্ডা ঘাটশিলা।



আমার বন্ধু লতিফ

কৃষ্ণ ধর

লতিফ আমার বন্ধু ছিল ছোটবেলার স্কুলে
সে কবেকার কথা জানো, সবই ছিলাম ভুলে।
ক্লাশেতে সে ফার্স্ট হত, ছিল খেলায় সেরা
সাঁতার দিয়ে উজান চরের বিল হত সে পার।
লতিফ আমার ছোটবেলার বন্ধু ছিল স্কুলে।

মাঝখানেতে অনেক কথা, অনেক গেছে দিন
অনেক সকাল পেরিয়ে গেছে, অনেক সন্ধ্যাবেলা।
ভাগ হয়েছে দেশ আমাদের, টুকরো হল গ্রাম
কে যে কোথায় ছিটকে গেছি, কেই বা রাখে খোঁজ
ভুলেই ছিলুম সে সব কথা, ছেলেবেলার দিন।

এখন আমি হোমরা-চোমড়া, মস্ত আমার নাম
হাঁকাই গাড়ি, হিল্লি-দিল্লি যখন তখন ছুটি
আমার কথা সবাই জানে, কাগজে নাম ছাপে
তারই চাপে কখন আমার ছোটবেলার কথা
হারিয়ে গেছে জানিই না তা, ছেঁড়া স্মৃতির পাতা।

হঠাৎ সেদিন একটি চিঠি এল সকাল ডাকে
অবাক আমি কে লিখেছে, চিনি না তো তাকে ?
সম্বোধনে আরও অবাক, ডাকনামেতে লেখে,
নিরু তুমি চিনবে কি আর, কিংবা গেছ ভুলে ?
কুসুমপুরের লতিফ আমি, ছেলেবেলার সাথী।

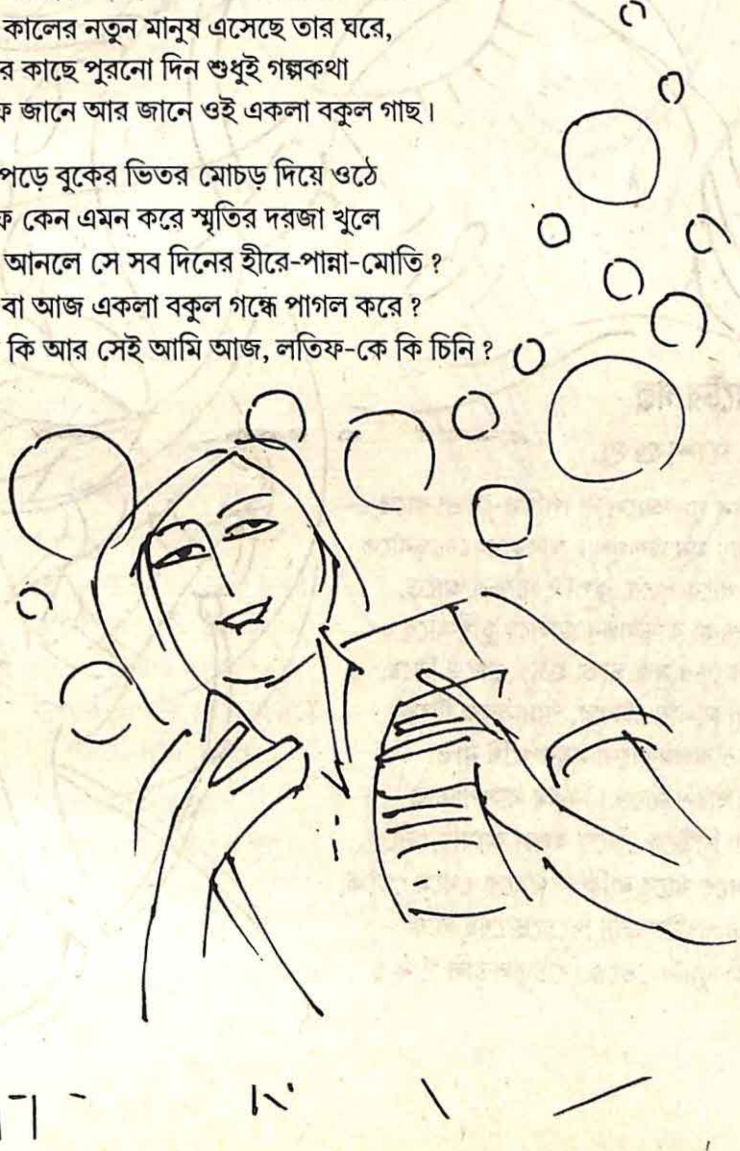


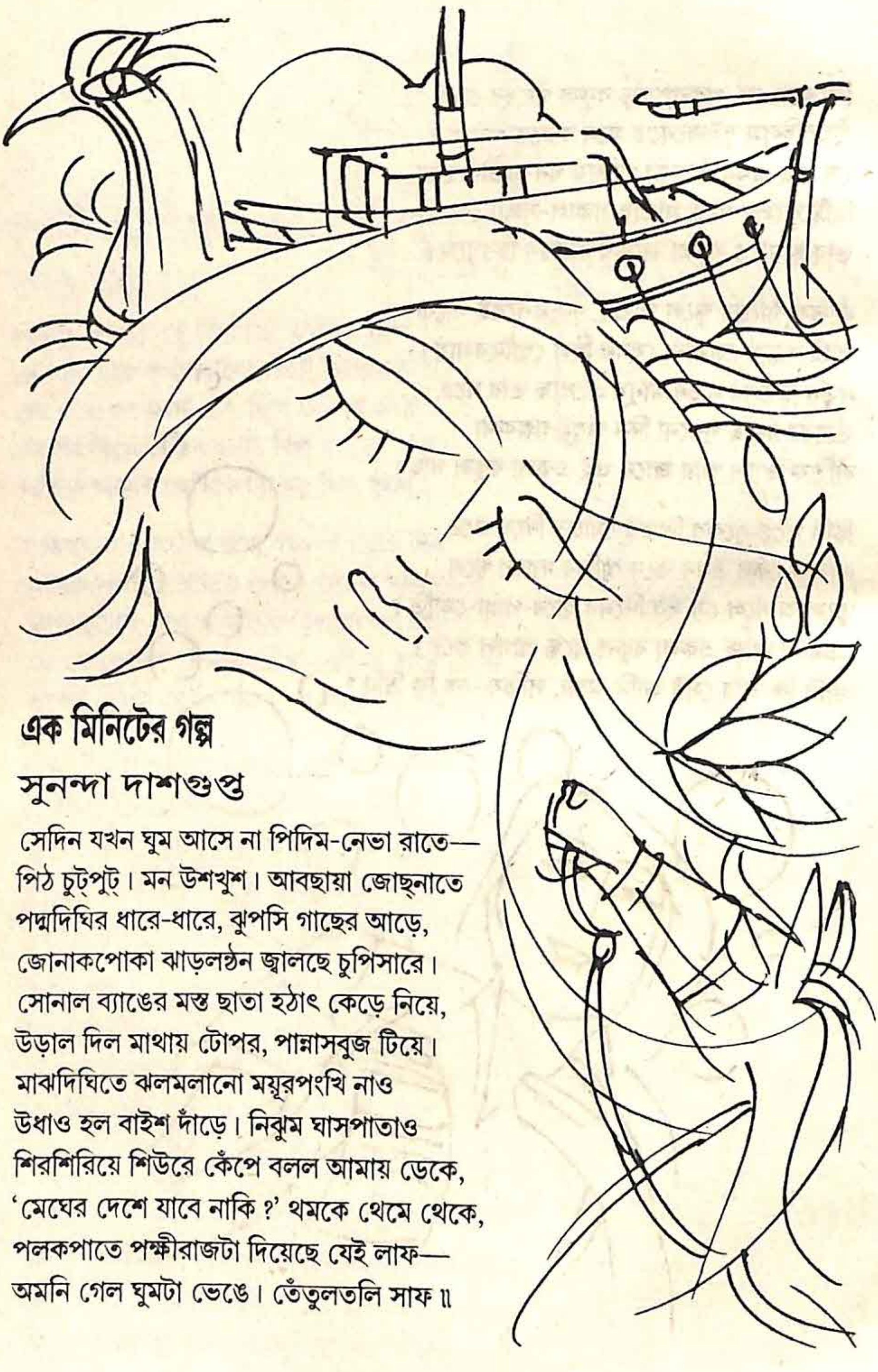
লিখেছে সে অনেক কথা, ছেলেবেলার কথা
আম্মা যে তার ভালবাসতেন আপন ছেলের মতন।
বোশেখ মাসে মারা গেছেন লতিফের সেই মা
যাবার আগে আমার কথা বলেছিলেন তাকে,
খবর দিবি ওপারেতে কেমন আছে ছেলে।

লিখেছে সে, পুকুরপাড়ে বকুল গাছের চারা
পুঁতেছিলুম দুইজনেতে মনে করতে পারো ?
সে গাছ এখন ঝাঁকড়া পাতায় ঘন-গভীর ছায়া
মিষ্টি ফুলের গন্ধে মাতায় সকাল-সন্ধ্যা বেলা।
তার ছায়াতে আম্মা আমার আছেন চিরঘুমে।

লতিফ গাঁয়ের স্কুলে পড়ায়, কুসুমপুরেই থাকে
সবই আছে তেমনি, যেমন ছিল ছোটবেলায়।
নতুন কালের নতুন মানুষ এসেছে তার ঘরে,
তাদের কাছে পুরনো দিন শুধুই গল্পকথা
লতিফ জানে আর জানে ওই একলা বকুল গাছ।

চিঠি পড়ে বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে
লতিফ কেন এমন করে স্মৃতির দরজা খুলে
তুলে আনলে সে সব দিনের হীরে-পান্না-মোতি ?
কেন বা আজ একলা বকুল গন্ধে পাগল করে ?
আমি কি আর সেই আমি আজ, লতিফ-কে কি চিনি ?

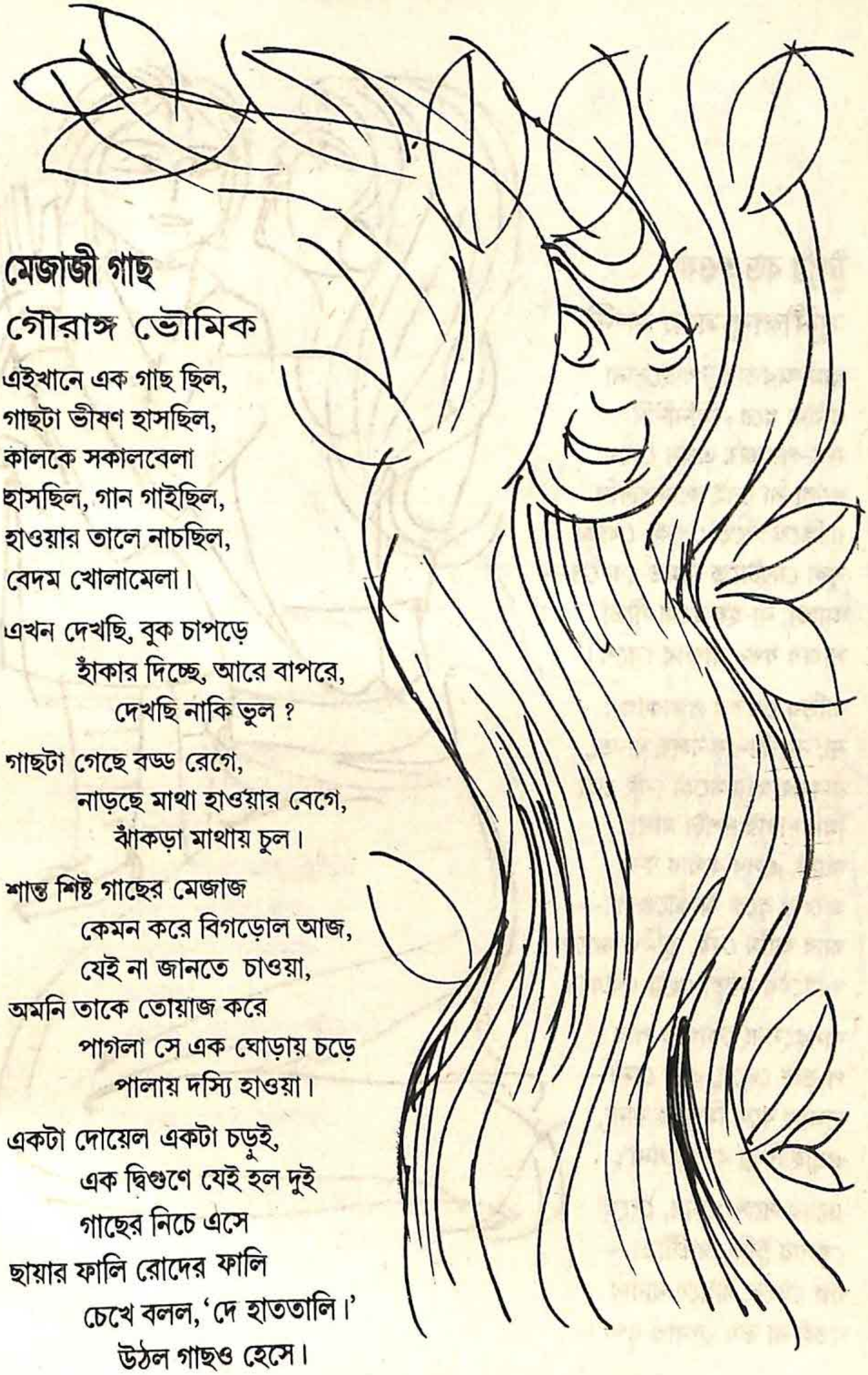




এক মিনিটের গল্প

সুনন্দা দাশগুপ্ত

সেদিন যখন ঘুম আসে না পিদিম-নেভা রাতে—
পিঠ চুট্‌পুট্‌। মন উশখুশ। আবছায়া জোছ্‌নাতে
পদ্মদিঘির ধারে-ধারে, ঝুপসি গাছের আড়ে,
জোনাকপোকা ঝাড়লণ্ঠন জ্বালছে চুপিসারে।
সোনাল ব্যাঙের মস্ত ছাতা হঠাৎ কেড়ে নিয়ে,
উড়াল দিল মাথায় টোপর, পান্নাসবুজ টিয়ে।
মাঝদিঘিতে ঝলমলানো ময়ূরপংখি নাও
উধাও হল বাইশ দাঁড়ে। নিঝুম ঘাসপাতাও
শিরশিরিয়ে শিউরে কেঁপে বলল আমায় ডেকে,
'মেঘের দেশে যাবে নাকি ?' থমকে থেমে থেকে,
পলকপাতে পক্ষীরাজটা দিয়েছে যেই লাফ—
অমনি গেল ঘুমটা ভেঙে। তেঁতুলতলি সাফ ॥



মেজাজী গাছ

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এইখানে এক গাছ ছিল,
গাছটা ভীষণ হাসছিল,
কালকে সকালবেলা
হাসছিল, গান গাইছিল,
হাওয়ার তালে নাচছিল,
বেদম খোলামেলা।

এখন দেখছি, বুক চাপড়ে
হাঁকার দিচ্ছে, আরে বাপরে,
দেখছি নাকি ভুল ?

গাছটা গেছে বড্ড রেগে,
নাড়ছে মাথা হাওয়ার বেগে,
ঝাঁকড়া মাথায় চুল।

শান্ত শিষ্ট গাছের মেজাজ
কেমন করে বিগড়োল আজ,
যেই না জানতে চাওয়া,
অমনি তাকে তোয়াজ করে
পাগলা সে এক ঘোড়ায় চড়ে
পালায় দস্যি হাওয়া।

একটা দোয়েল একটা চড়ুই,
এক দ্বিগুণে যেই হল দুই
গাছের নিচে এসে
ছায়ার ফালি রোদের ফালি
চেখে বলল, 'দে হাততালি।'
উঠল গাছও হেসে।



টুপুর বড় হওয়া
সুনীলকুমার নন্দী

রাম-অবতার টুপাইসোনা
বায়না ধরে : মিনিদিদি
জয়-পরাজয় এখন রেখে
বলো-না সেই কাজলদিঘি
রাঙিয়ে দিতে থোকা-থোকা
ফুল ফোটাতে নামত কে সে—
আচ্ছা, না-হয় হয়ো সীতা
সাজব যখন রাজার বেশে।

বাড়ির ভেতর লঙ্কাকাণ্ড!
না, না, কী-যে বলছ যা-তা,
রাবণরাজার মতো নেই তো
মিনিদাদার দশটা মাথা।
জানি, এসব কথার কথা
জলের বুকে আঁকাজোকা—
আর আমি নেই, তুমিও জানো
ভাইয়ের মতো ছোট্ট খোকা।

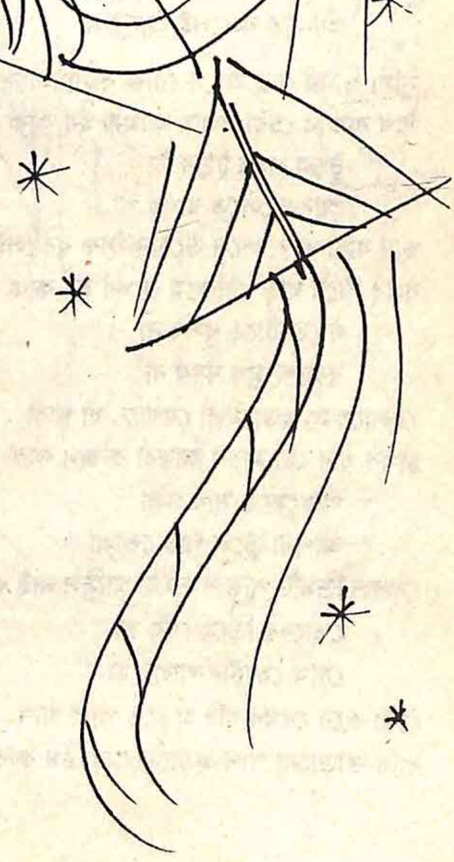
বানরসেনা কোথায় পাব?
পাড়ার ছেলে, এত চেনা—
দামাল বলে মিশতে মানা,
ওরাই কিন্তু বানরসেনা;

ওদের সঙ্গে আনব, দেখো
খেলার ট্রফি, স্বর্ণসীতা—
গল্প ফেঁদে, বাইরে যাবার
যতই-না ভয় দেখাও বৃথা।



মিনুর ইচ্ছে

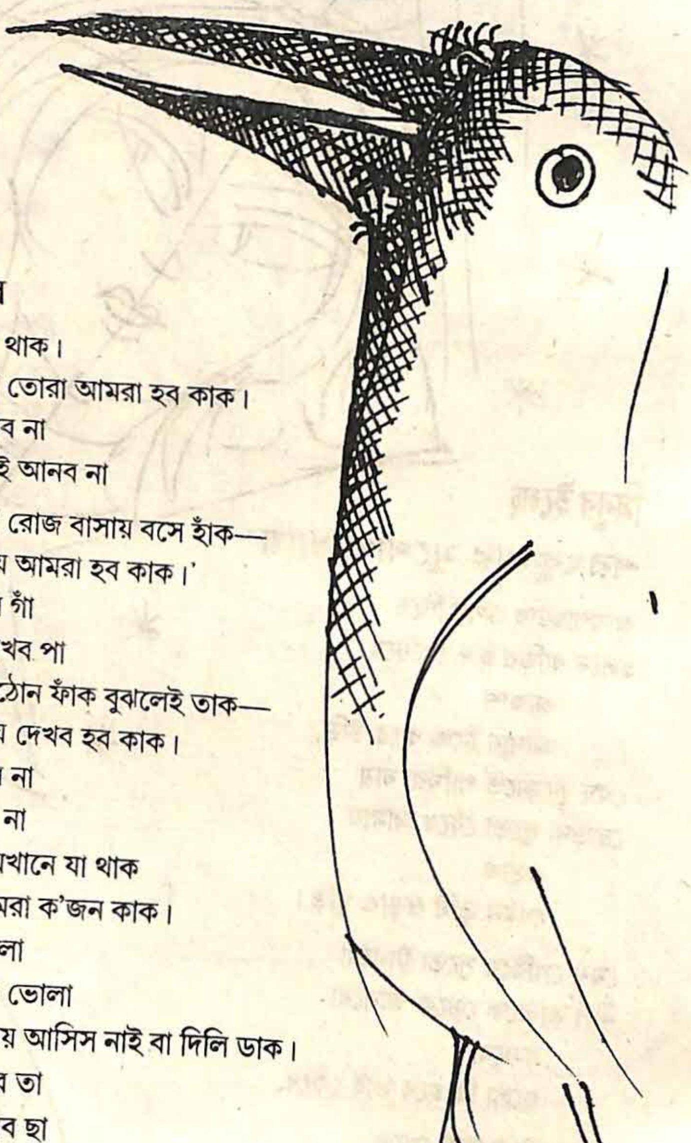
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়



আমগাছটার ওপর দিয়ে
হলদে বাড়ির ছাদ পেরিয়ে
        আকাশ
        আমার ইচ্ছে করে উড়ি,
মেঘ কুড়োতে পাখিরা যায়
ছোড়দা সুতো বেঁধে আমায়
        ওড়াও
        যেমন তুমি ওড়াও ঘুড়ি।

মেঘ পেরিয়ে সুতো-টানবো
নীল তারাকে ডেকে আনবো
        বলবো
        চলো কি হবে ভাই কেঁদে,

রবিবারটা কাটাই খেলে
পৌঁছে দেবে কাল বিকেলে
        ছোড়দা
        তোমায় রাঙা সুতোয় বেঁধে।



কাক

গৌরী ধর্মপাল

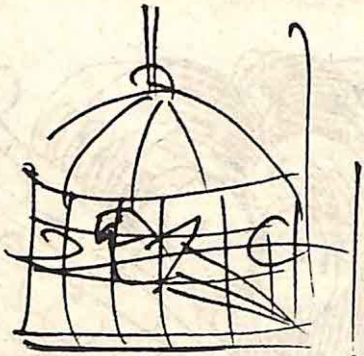
আকাশ মাথায় থাক।
যা হো'গে যা কোকিল তোরা আমরা হব কাক।
শীত বসন্ত মানব না
আনতে বললেই আনব না
সুয্যি ওঠার ঢের আগে রোজ বাসায় বসে হাঁক—
শাঁখ বাজাব চেরা গলায় আমরা হব কাক।'
টুঁড়ব শহর টুঁড়ব গাঁ
আবডালেতে রাখব পা
ছাদ বারান্দা আলসে উঠোন ফাঁক বুঝলেই তাক—
বসব গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখব হব কাক।
দাঁড়ে-টাঁড়ে বসব না
বরাদ্দে মুখ ঘষব না
হেলাফেলা ছড়ামেলা যেখানে যা থাক
চাখব খাব ছোঁ মারব আমরা ক'জন কাক।
পঞ্চমেতে সাধ গলা
আপ্না ভুলে পাঁচ ভোলা
কেবল ডিমটি পাড়ার সময় আসিস নাই বা দিলি ডাক।
তোদের ডিমে দেব তা
চোখ ফোটাব পালব ছা
চেষ্টা করে দেখব যদি গড়তে পারি লাখ
ব্যাধ-তাড়ানো পাখ-ছড়ানো অকৃত্রিম কাক।



আমার ছেলেবেলা

পূর্ণেন্দু পত্রী

ছেলেবেলা থেকে তোমরা কেমন পেয়েছ
টিভি,
আমাদের ছিল দূরের আকাশ দেখার
টিভি।
ছেলেবেলা থেকে পেয়েছ রেকর্ড, রেডিও
রীলে
আমাদের ছিল আমলকি পাড়া অনেক
ঢিলে।
তোমরা পড়ছ কমিক্‌স এবং কত ম্যাগা-
জিন,
আমাদের ছিল রূপকথা ভরা রাত্রি ও
দিন।
সুইচ টিপেই পাচ্ছ তোমরা চাঁদের
আলো,
আমাদের সব রাতগুলো ছিল ভুতুড়ে
কালো।
অদ্ভুত সব ভূতের গন্ধ পেতাম
নাকে,
শ্যাওড়া গাছেই সবচেয়ে বেশি ভূতরা
থাকে।
ছেলেবেলা থেকে তোমরা শিখেছ কত ইং-
রেজি।
আমরা শিখেছি কি বলে শালিক, বেড়াল,
বেঁজি,
জন্ম থেকেই তোমরা এখন কত আধু-
নিক,
আমরা কি ছাই জানতুম কাকে বলে স্পুট-
নিক।





সবচেয়ে ভালো

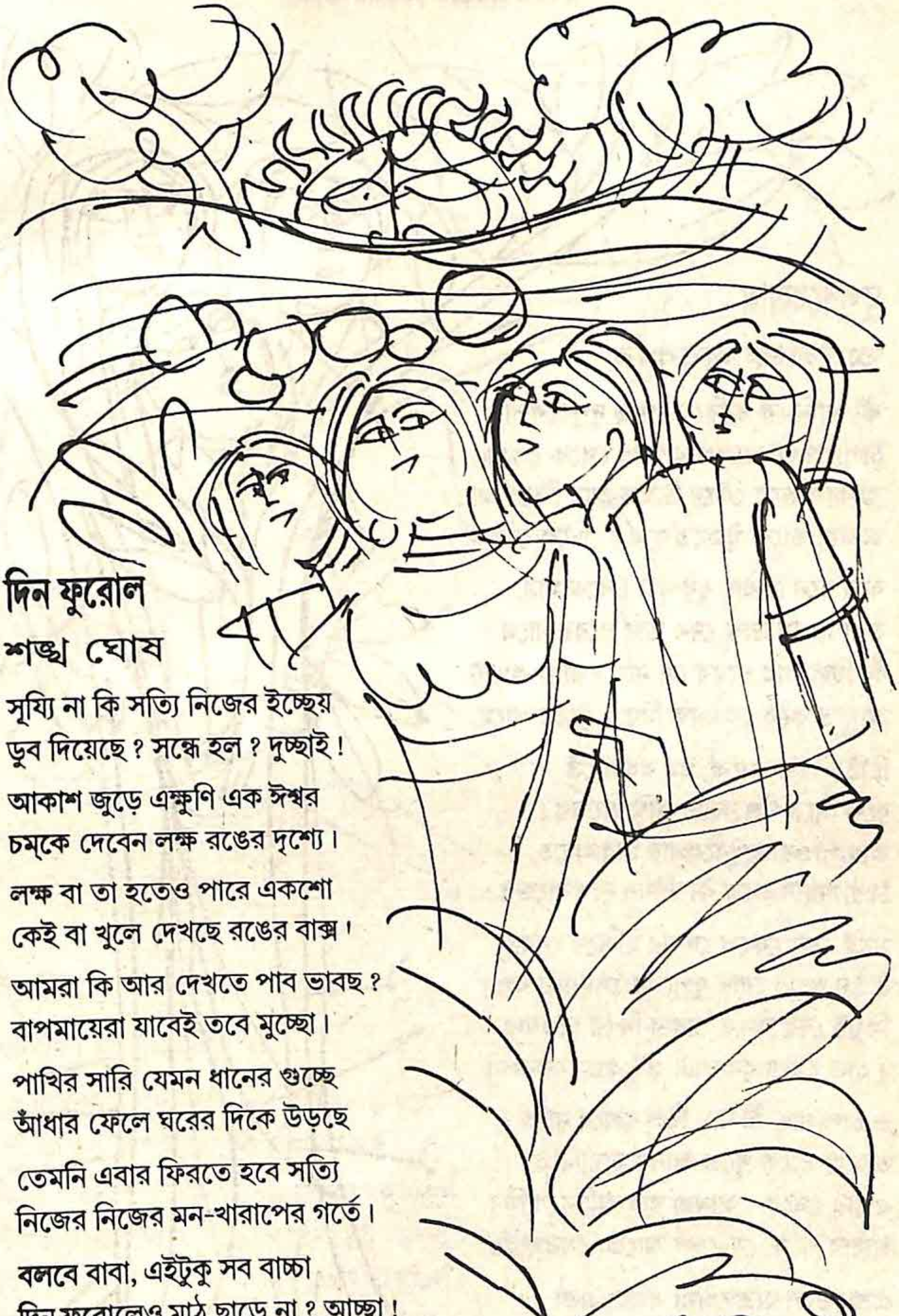
কবিতা সিংহ

সবচেয়ে কি ভালো ?
রান্নাঘরে চড়িয়ে হাঁড়ি
পরে হলুদ মাখা শাড়ি
যখন দেখেন মা—
ধরছে খোকা পড়ছে খুকি
জানলায় রোদ দিচ্ছে উঁকি
খাঁচায় টিয়ে সাধছে গলা
নিসা সারে গামা,
দু' চোখে মার জ্বলে ওঠে
হঠাৎ খুশির আলো।

সবচেয়ে তা ভালো।

সবচেয়ে কি ভালো ?
সারাদিনের কাজের পরে
যখন বাবা ফেরেন ঘরে
খুকি তাহার কোলে চড়ে
খোকা গলা জড়িয়ে ধরে,
মা এনে দেন গরম গরম
হাতে গড়া রুটির নরম,
ঠাকুমা দেন তুলসীতলায়
সন্ধ্যাদীপের আলো।

সবচেয়ে তা ভালো।



দিন ফুরোল

শঙ্খ ঘোষ

সূয্যি না কি সত্যি নিজের ইচ্ছেয়
ডুব দিয়েছে ? সন্ধে হল ? দুচ্ছাই !

আকাশ জুড়ে এক্ষুণি এক ঈশ্বর
চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।

লক্ষ বা তা হতেও পারে একশো
কেই বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স।

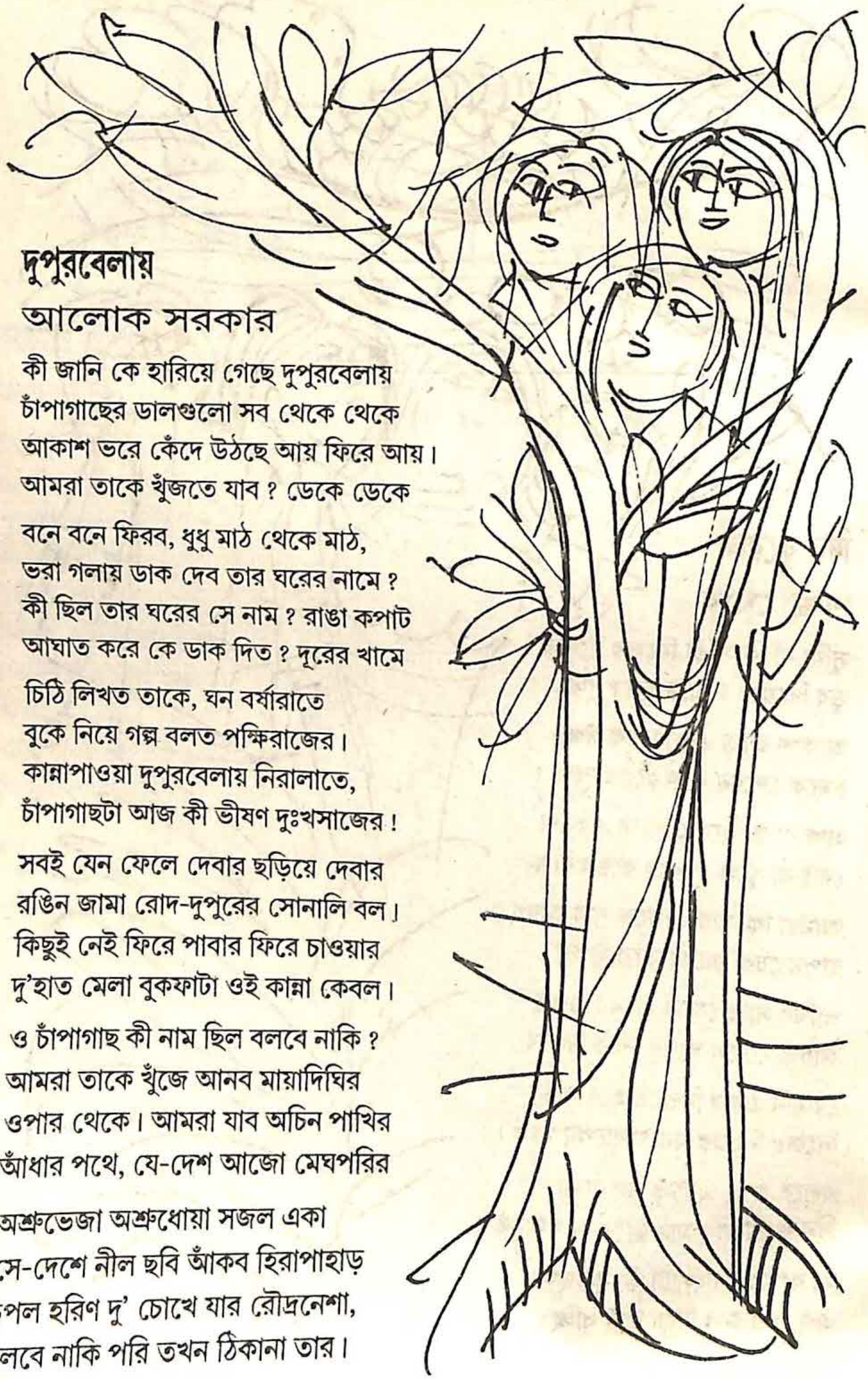
আমরা কি আর দেখতে পাব ভাবছ ?
বাপমায়েরা যাবেই তবে মুচ্ছো।

পাখির সারি যেমন ধানের গুচ্ছে
আঁধার ফেলে ঘরের দিকে উড়ছে

তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি
নিজের নিজের মন-খারাপের গর্তে।

বলবে বাবা, এইটুকু সব বাচ্চা
দিন ফুরোলেও মাঠ ছাড়ে না ? আচ্ছা !

মা বলবে, ঠ্যাংদুটো কী কুচ্ছিৎ !
এক গঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।



দুপুরবেলায়

আলোক সরকার

কী জানি কে হারিয়ে গেছে দুপুরবেলায়
চাঁপাগাছের ডালগুলো সব থেকে থেকে
আকাশ ভরে কেঁদে উঠছে আয় ফিরে আয়।
আমরা তাকে খুঁজতে যাব ? ডেকে ডেকে

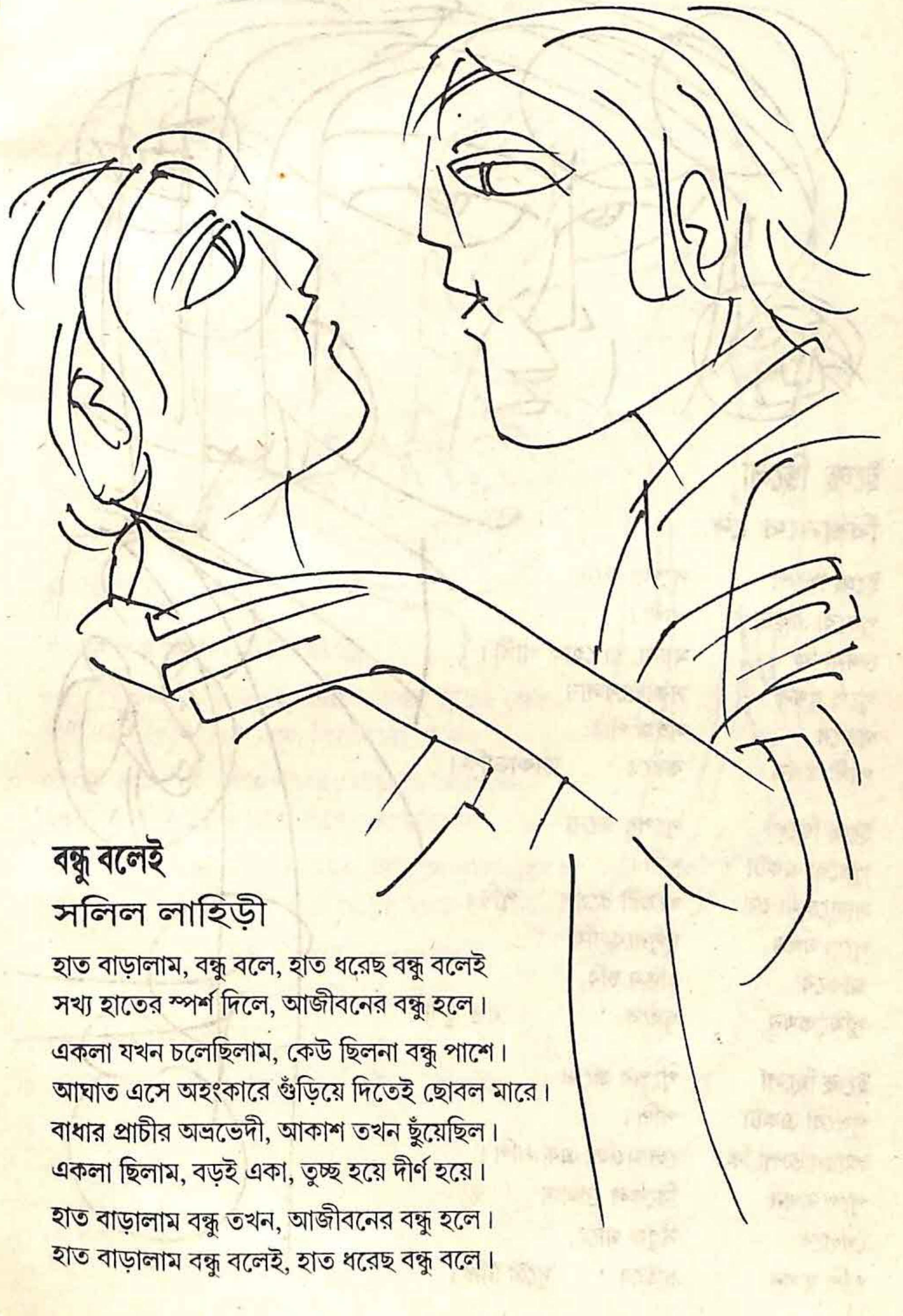
বনে বনে ফিরব, ধুধু মাঠ থেকে মাঠ,
ভরা গলায় ডাক দেব তার ঘরের নামে ?
কী ছিল তার ঘরের সে নাম ? রাঙা কপাট
আঘাত করে কে ডাক দিত ? দূরের খামে

চিঠি লিখত তাকে, ঘন বর্ষারাতে
বুকে নিয়ে গল্প বলত পক্ষিরাজের।
কান্নাপাওয়া দুপুরবেলায় নিরালাতে,
চাঁপাগাছটা আজ কী ভীষণ দুঃখসাজের!

সবই যেন ফেলে দেবার ছড়িয়ে দেবার
রঙিন জামা রোদ-দুপুরের সোনালি বল।
কিছুই নেই ফিরে পাবার ফিরে চাওয়ার
দু'হাত মেলা বুকফাটা ওই কান্না কেবল।

ও চাঁপাগাছ কী নাম ছিল বলবে নাকি ?
আমরা তাকে খুঁজে আনব মায়াদিঘির
ওপার থেকে। আমরা যাব অচিন পাখির
আঁধার পথে, যে-দেশ আজো মেঘপরির

অশ্রুভেজা অশ্রুধোয়া সজল একা
সে-দেশে নীল ছবি আঁকব হিরাপাহাড়
চপল হরিণ দু' চোখে যার রৌদ্রনেশা,
বলবে নাকি পরি তখন ঠিকানা তার।



বন্ধু বলেই

সলিল লাহিড়ী

হাত বাড়ালাম, বন্ধু বলে, হাত ধরেছ বন্ধু বলেই
সখ্য হাতের স্পর্শ দিলে, আজীবনের বন্ধু হলে।

একলা যখন চলেছিলাম, কেউ ছিলনা বন্ধু পাশে।
আঘাত এসে অহংকারে গুঁড়িয়ে দিতেই ছোবল মারে।
বাধার প্রাচীর অভ্রভেদী, আকাশ তখন ছুঁয়েছিল।
একলা ছিলাম, বড়ই একা, তুচ্ছ হয়ে দীর্ণ হয়ে।

হাত বাড়ালাম বন্ধু তখন, আজীবনের বন্ধু হলে।
হাত বাড়ালাম বন্ধু বলেই, হাত ধরেছ বন্ধু বলে।



ইচ্ছে ছিলো

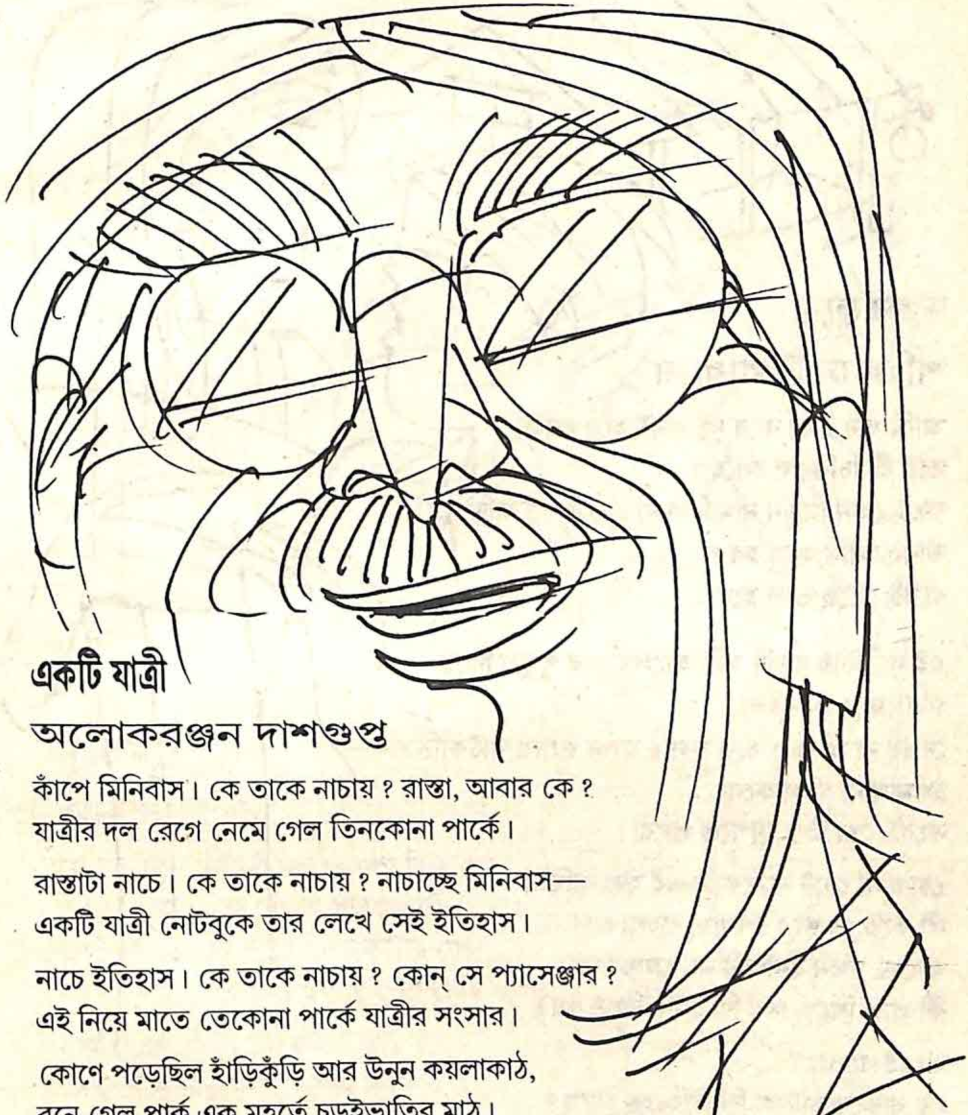
বিশ্বনাথ দে

ইচ্ছে ছিলো পুপের জন্যে
পুষবো একটা পাখী।
চন্দনা কি ময়না, যা হোক পাখী।
পুপে যখন সকালবেলায়
পড়বে সহজ পাঠ,
পাখী তখন করবে ডাকাডাকি।

ইচ্ছে ছিলো পুপের জন্যে
পুষবো একটা পুষি।
লাল্‌চে না হয় খয়েরী রঙের পুষি।
পুপে যখন দুপুরবেলায়
আঁকবে রঙিন ছবি,
পুষি তখন ঘুরবে যত খুশী।

ইচ্ছে ছিলো পুপের জন্যে
পুষবো একটা পপি।
ল্যাজতোলা কি লোমওলা এক পপি।
পুপে যখন বিকেল বেলায়
খেলবে সবুজ মাঠে,
পপি তখন চাইবে দুটো টফি।





একটি যাত্রী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কাঁপে মিনিবাস। কে তাকে নাচায় ? রাস্তা, আবার কে ?
যাত্রীর দল রেগে নেমে গেল তিনকোনা পার্কে।

রাস্তাটা নাচে। কে তাকে নাচায় ? নাচাচ্ছে মিনিবাস—
একটি যাত্রী নোটবুকে তার লেখে সেই ইতিহাস।

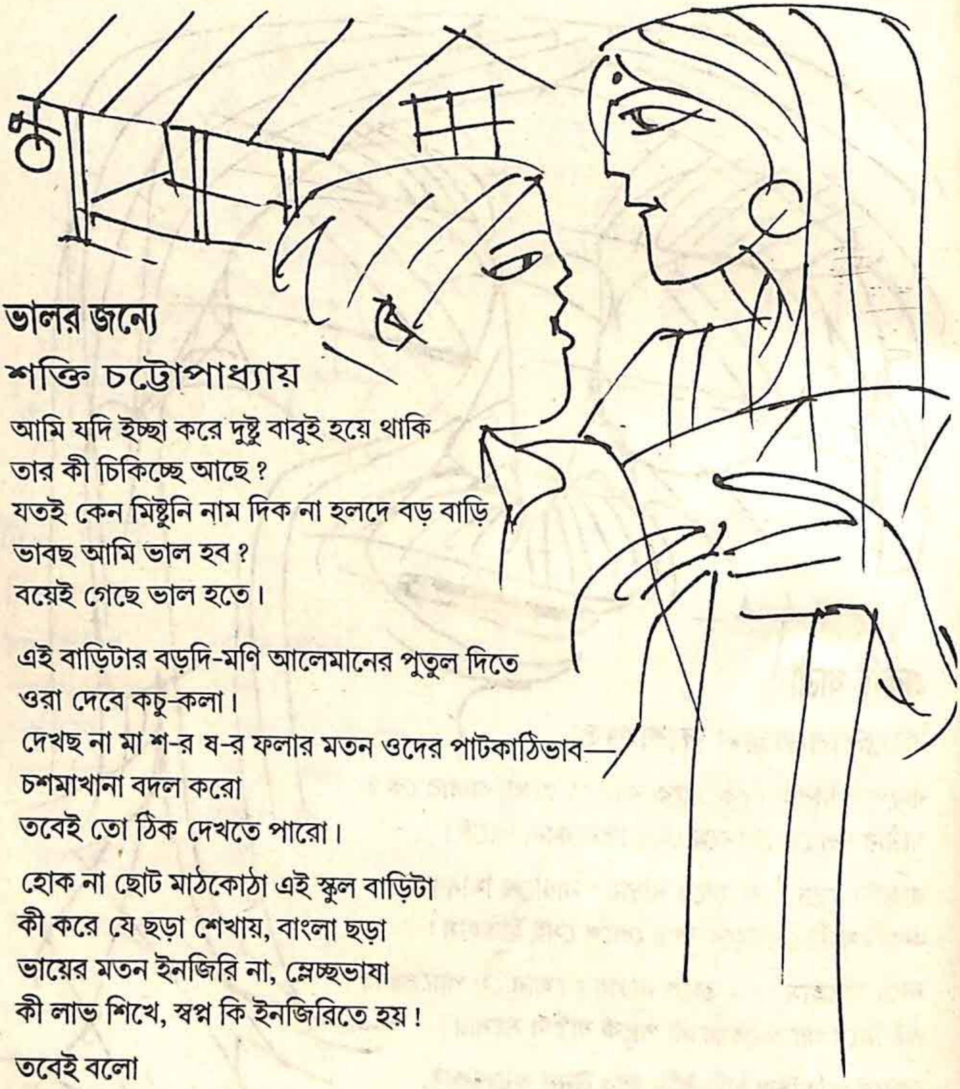
নাচে ইতিহাস। কে তাকে নাচায় ? কোন্ সে প্যাসেঞ্জার ?
এই নিয়ে মাতে তেকোনা পার্কে যাত্রীর সংসার।

কোণে পড়েছিল হাঁড়িকুঁড়ি আর উনুন কয়লাকাঠ,
বনে গেল পার্ক এক মুহূর্তে চড়ুইভাতির মাঠ।

সেইখানে নাচে সহযাত্রীরা চড়ুইভাতির নাচ,
একটি যাত্রী নাচে না, বাকিরা তাকে বলে 'ধড়িবাজ'।

তার দোষ তার মস্ত চশমা, চক্ষে কিসের ঘোর,
তার দোষ তার বয়সের নাকি নেই রে গাছপাথর।

তার দোষ সে তো নাচতে পারে না, হাতে তার বারোমাস
ছোট্ট ডায়েরি, তাতে টুকে রাখে সমস্ত ইতিহাস !



ভালর জন্যে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমি যদি ইচ্ছা করে দুষ্টু বাবুই হয়ে থাকি
তার কী চিকিচ্ছে আছে?
যতই কেন মিষ্টুনি নাম দিক না হলদে বড় বাড়ি
ভাবছ আমি ভাল হব?
বয়েই গেছে ভাল হতে।

এই বাড়িটার বড়দি-মণি আলেমানের পুতুল দিতে
ওরা দেবে কচু-কলা।
দেখছ না মা শ-র ষ-র ফলার মতন ওদের পাটকাঠিভাব—
চশমাখানা বদল করো
তবেই তো ঠিক দেখতে পারো।

হোক না ছোট মাঠকোঠা এই স্কুল বাড়িটা
কী করে যে ছড়া শেখায়, বাংলা ছড়া
ভায়ের মতন ইনজিরি না, ম্লেচ্ছভাষা
কী লাভ শিখে, স্বপ্ন কি ইনজিরিতে হয়!

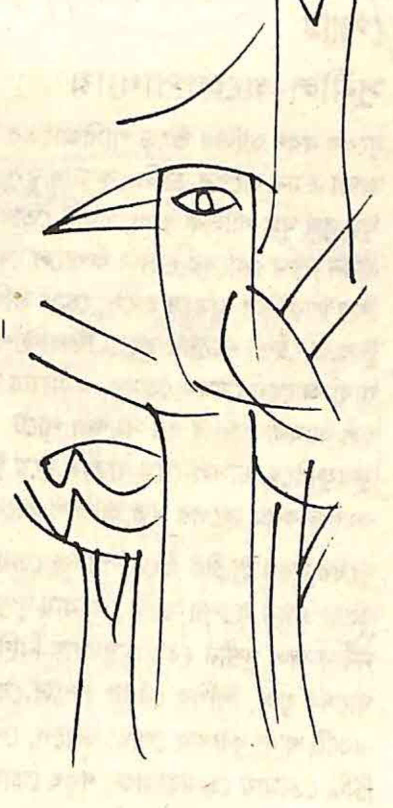
তবেই বলো
দুষ্টু থাকতে চাইলে কি চিকিচ্ছে আছে?
উপরন্তু জানাশোনা
সে-সম্পর্ক উড়িয়ে দেওয়া যায় নাকি মা এক কথাতে?
তুমিই বলো।

ঐ ছোট ইস্কুলেই চলো
দ্যাখো কী হয়
—একটি বছর, তার বেশি নয়
ভাল হব, ভাল হব, ভাল হবই!



পুতুল নাচ

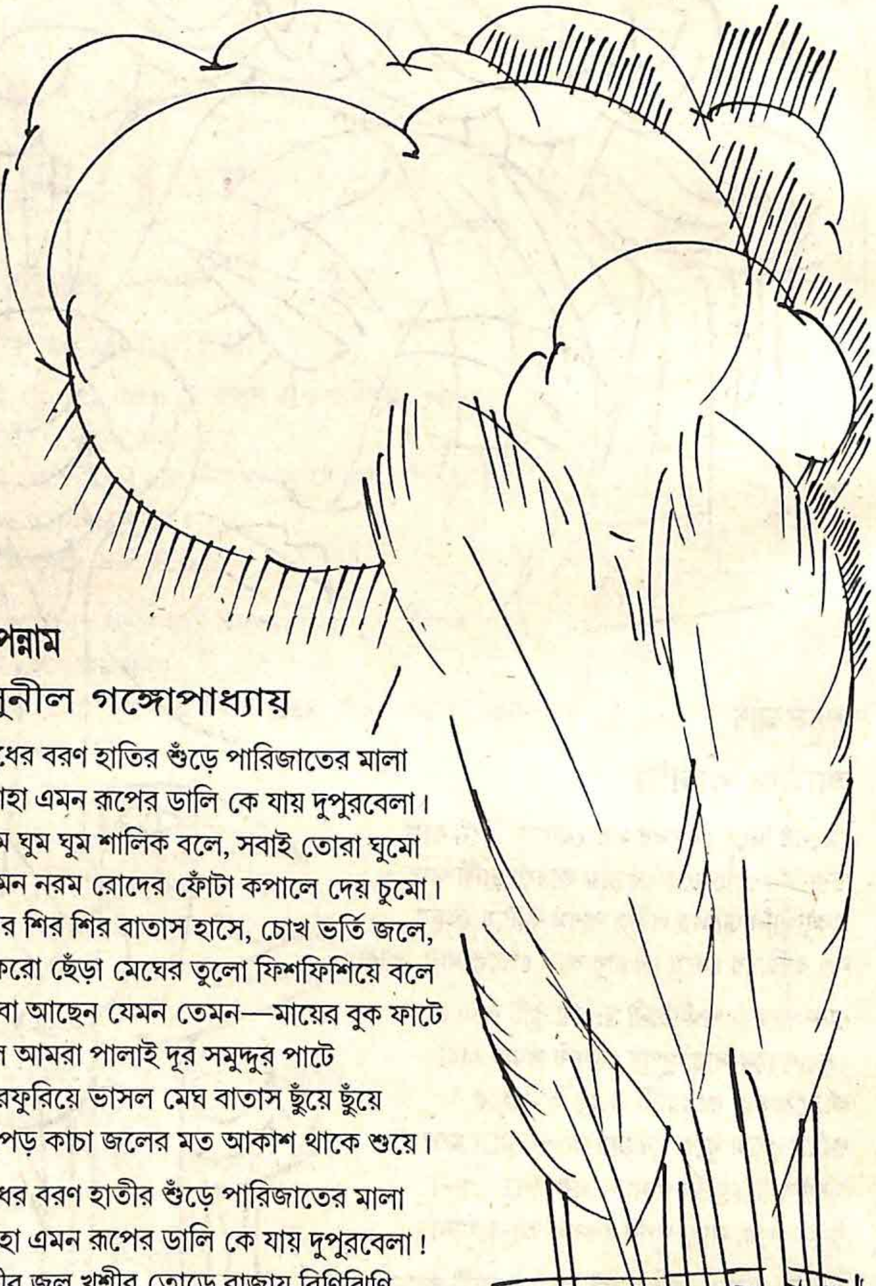
আনন্দ বাগচী



মেঘের দিনে রোদের মত রোদের দিনে ছায়া
চিকচিকিয়ে চমকে বেড়ায় কাঠবেড়ালী ভায়া।
একটুখানি উলের শরীর পশম কাঁটায় বোনা
নখ বাজিয়ে নেচে বেড়ায় কান পেতে যায় শোনা।

মেমসাহেবা পক্ষীরানী মাথায় ঝুঁটি বাঁধা।
সেগুণবনে সারা দুপুর লাগায় সবার ধাঁধা।
কাঠঠোকরা কাঠুরানী সবার বনে বনে
কাটুম কুটুম খুঁজে বেড়ায় আপন মনে মনে।
রঙবাহারী গাউন খানা পালক দিয়ে বোনা
সারা দুপুর, সারা দুপুর কেবল আনাগোনা।

আরাম চেয়ার, শুয়ে আছি, চোখের দুটি পাতে
আমের শাখা ভিড় করেছে ঘুমন্ত আয়নাতে।
চতুর্দিকে দুপুর জুড়ে চলছে পুতুল নাচ,
ছোঁয়াচ লেগে ভড়কে গেছে ঘোমটা টানা গাছ॥



পেন্নাম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা।
ঘুম ঘুম ঘুম শালিক বলে, সবাই তোরা ঘুমো
এমন নরম রোদের ফোঁটা কপালে দেয় চুমো।
শির শির শির বাতাস হাসে, চোখ ভর্তি জলে,
টুকরো ছেঁড়া মেঘের তুলো ফিশফিশিয়ে বলে
বাবা আছেন যেমন তেমন—মায়ের বুক ফাটে
চল আমরা পালাই দূর সমুদ্দুর পাটে
ফুরফুরিয়ে ভাসল মেঘ বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কাপড় কাচা জলের মত আকাশ থাকে শুয়ে।

দুধের বরণ হাতীর শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা!
নদীর জল খুশীর তোড়ে বাজায় রিণিঝিণি
ঘাসের ফুল, শিশির ফোঁটা বললে যেন চিনি।
একটি শাদা কাশের গোছা বললে, পেন্নাম!
চিনি তোমায় হে মহারাজ, শরৎ তোমার নাম!



নাস্তা-নাবুদ

রঞ্জন ভাদুড়ী

নাস্তা নিয়ে ব্যস্ত বেজায়
পোস্তাবাসী খাস্তগীর—
খাস্তা গজা, পেস্তা-দেওয়া
জমাট-বাঁধা আস্ত ক্ষীর,
মস্ত বড় ডেকচিটাতে
গোস্ত আছে কবজিডুব,
পোস্তবড়া গণ্ডা-বিশেক,
ঝালঝোলেতে সবজি খুব।
বস্তাখানেক লুচির সাথে
সস্তা দরের শিককাবাব।—
রাস্তা দিয়ে যে যায়, বলে,
খাস্তগীরের শিক্ষাভাব,—
কুস্তিগীরও ত্রস্ত হবে
যে-সব খাবার দেখলে, সেই
হস্তিপ্রমাণ জাস্তি খানা
খাচ্ছে ব্যাটা—লজ্জা নেই!
আঁস্তাকুঁড়ে ফেললে ছুঁড়ে
এ-সব লোকের শাস্তি হয়—
সোয়াস্তি পায় দেশের মানুষ,
সবাই ভাবে—নাস্তি ভয়!



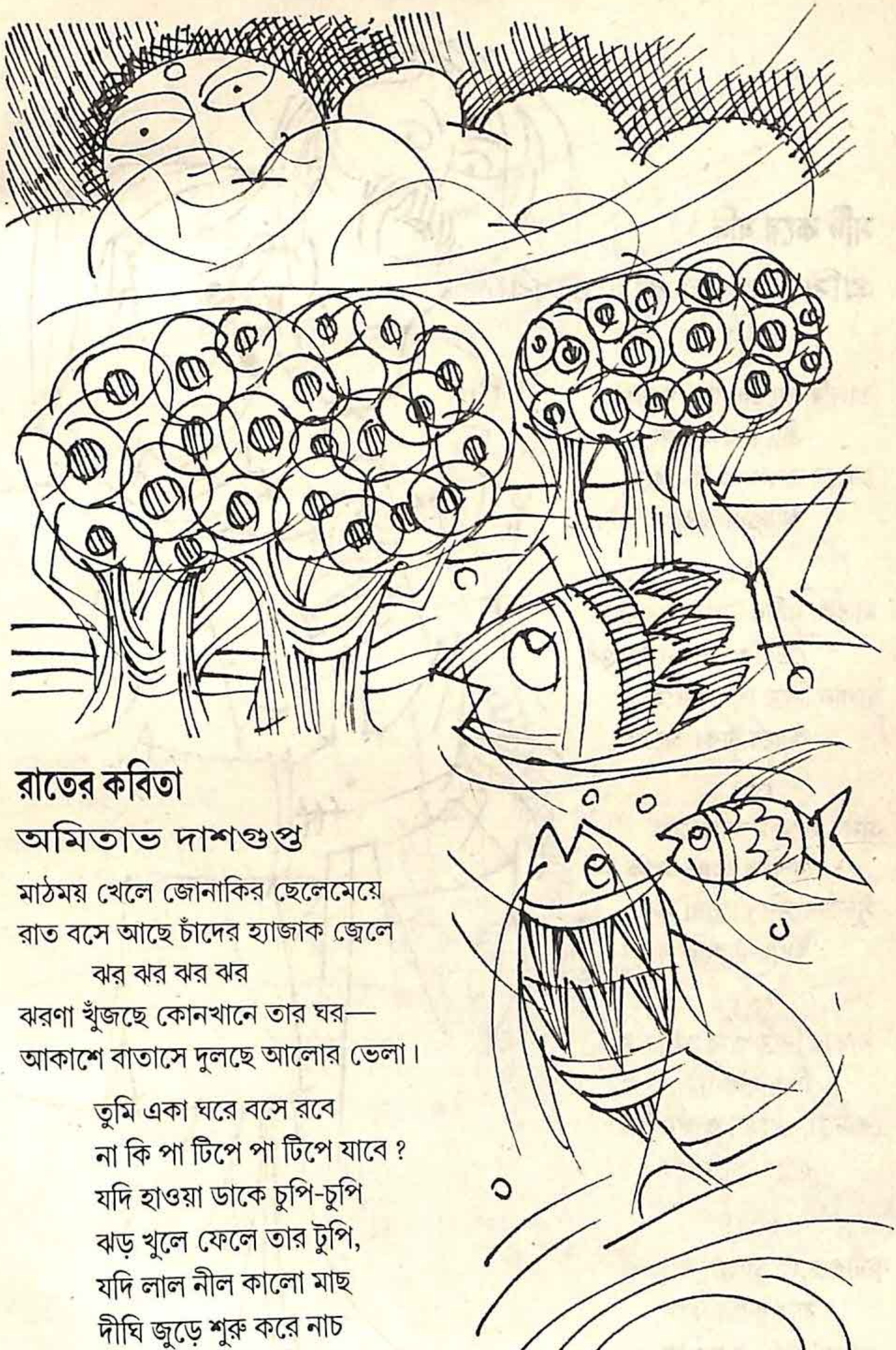
তুতুলের জন্যে কবিতা

শিবশম্ভু পাল

তোমার আকাশে শুধু চাঁদ শুধু দুটি
সবুজ পাতায় হাওয়াদের লুটোপুটি
তোমার বিশ্বে শুধু ভাব শুধু ভাব
তোমার দুচোখে সেই এতটুকু পাপ।
তোমার ঘুমেতে শুধু সমুদ্রপাড়ি
তেপান্তরের পারেতে রাজার বাড়ি
তোমার হাসিতে পারিজাত শুধু ঝরে
তোমার চোখের জলেতে মুক্তো পড়ে।

তুতুল, তোমার নীলপরী লালপরী
দুঃখসুখের নদীতে সোনার তরী
তুমিতো আমার কাজভোলানিয়া খেলা
তুমিতো আমার সোনারং ছেলেবেলা।

এইতো এসেছি তোমার কাছেতে, মণি
তুমি যে আমার লক্ষ হীরের খনি
এইতো দিলাম তোমার মুখেতে মুখ
এইতো আমার মরণভোলানো সুখ।



রাতের কবিতা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মাঠময় খেলে জোনাকির ছেলেমেয়ে
রাত বসে আছে চাঁদের হ্যাজাক জ্বেলে
ঝর ঝর ঝর ঝর
ঝরণা খুঁজছে কোনখানে তার ঘর—
আকাশে বাতাসে দুলছে আলোর ভেলা।

তুমি একা ঘরে বসে রবে
না কি পা টিপে পা টিপে যাবে?
যদি হাওয়া ডাকে চুপি-চুপি
ঝড় খুলে ফেলে তার টুপি,
যদি লাল নীল কালো মাছ
দীঘি জুড়ে শুরু করে নাচ
ঘরে বসে রবে না কি যাবে
সেই ঝলমলে উৎসবে?



সর্দি করে যদি

প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী

(১)

তাল্‌দি গাঁয়ের বদ্যি পাড়ার,
শ্রীভোম্বল নন্দী,
মাছের ব্যবসা করবে বলে
আঁটলো জবর ফন্দি।

(২)

মাত্‌লা নদীর ট্যাংরা, বোয়াল
ভেট্‌কি, ভাঙন গাঙের,
চালান দিয়ে শিয়ালদহে
করবে টাকা অঢের।

(৩)

এসব শুনে মগরাহাটের
বল্‌লে বলাই মাঝি,—
'সুঁদরেবনের বাঘেরা সব
বদরাগী আর পাজী।

(৪)

সাঁতার দিয়ে পার হয় তারা
বিদ্যাধরী-নদী,
কেউটে, বোড়া, কালনাগিনী
হঠাৎ কাটে যদি ?

(৫)

কুমীরগুলো চ্যাংড়া ফাজিল
ঠ্যাং ধরবে কষে,
তার চে'-দাদা গুড়ুক টানো
মজায় দাওয়ায় বসে।'

(৬)

এসব শুনে ভয় খাবে কি—
শ্রীভোম্বল নন্দী ?
'ঘুরছে মাথা রোদ লেগেছে
বদ্যি ডাকো জল্‌দি।'

(৭)

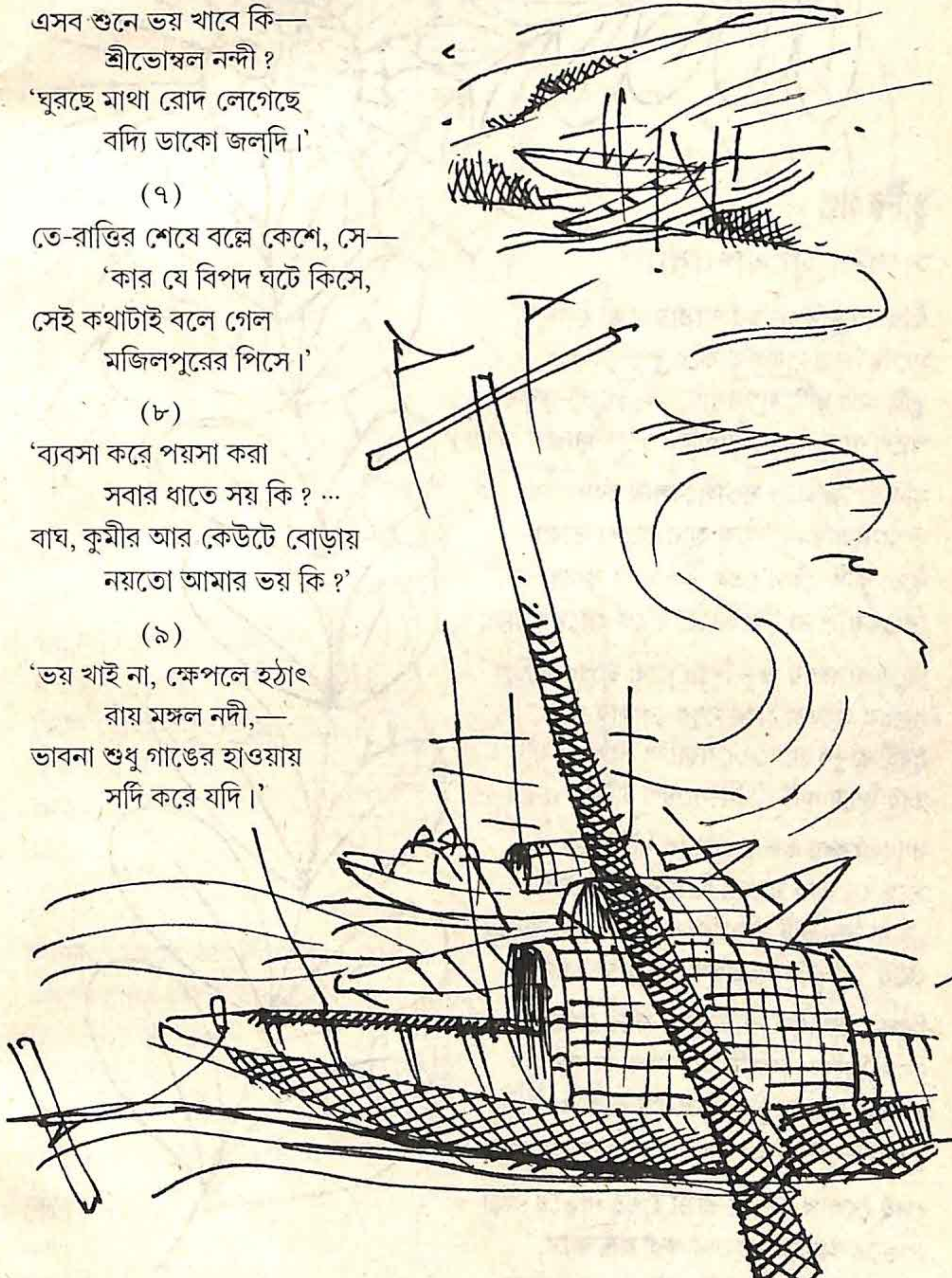
তে-রাত্তির শেষে বল্লে কেশে, সে—
'কার যে বিপদ ঘটে কিসে,
সেই কথাটাই বলে গেল
মজিলপুরের পিসে।'

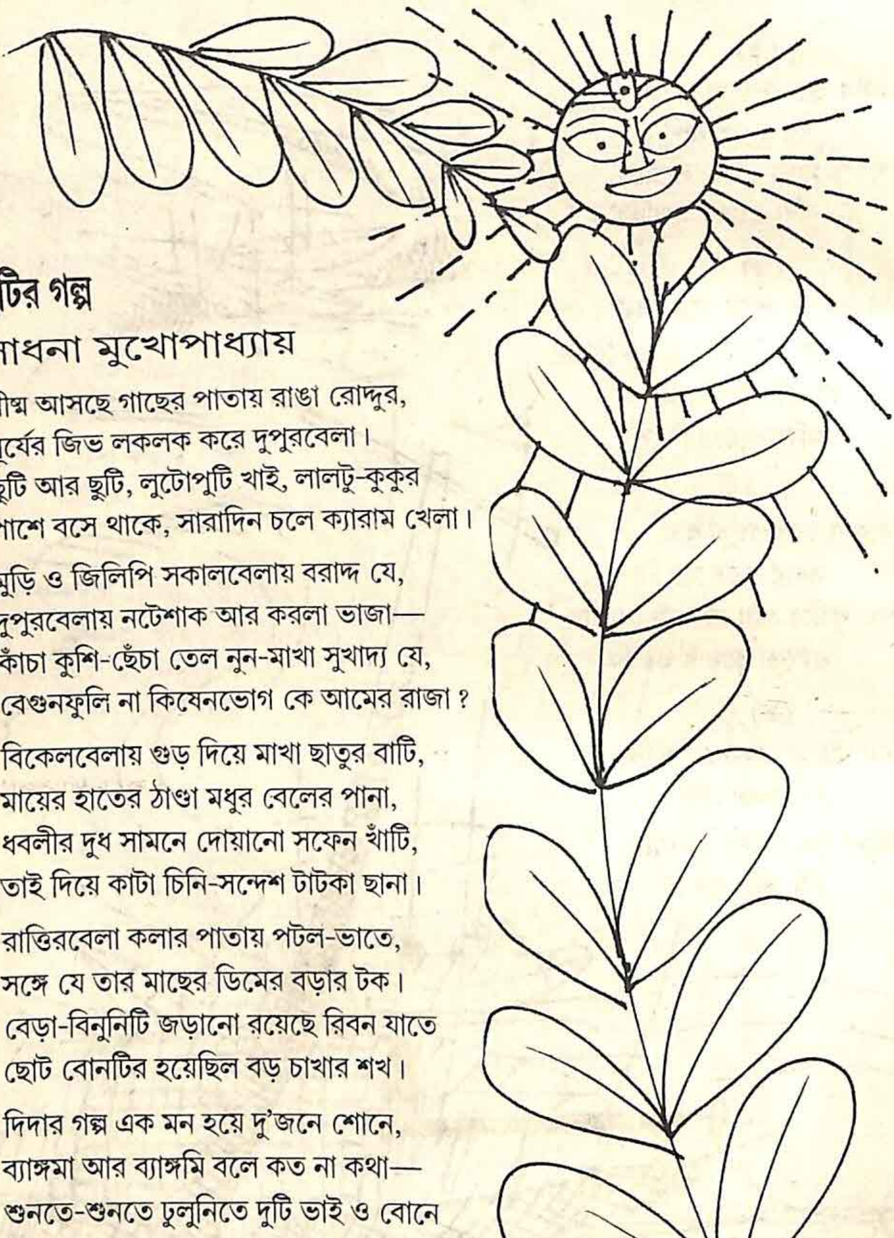
(৮)

'ব্যবসা করে পয়সা করা
সবার ধাতে সয় কি ? ...
বাঘ, কুমীর আর কেউটে বোড়ায়
নয়তো আমার ভয় কি ?'

(৯)

'ভয় খাই না, ক্ষেপলে হঠাৎ
রায় মঙ্গল নদী,—
ভাবনা শুধু গাঙের হাওয়ায়
সর্দি করে যদি।'





ছুটির গল্প

সাধনা মুখোপাধ্যায়

গ্রীষ্ম আসছে গাছের পাতায় রাঙা রোদ্দুর,
সূর্যের জিভ লকলক করে দুপুরবেলা।
ছুটি আর ছুটি, লুটোপুটি খাই, লালটু-কুকুর
পাশে বসে থাকে, সারাদিন চলে ক্যারাম খেলা।

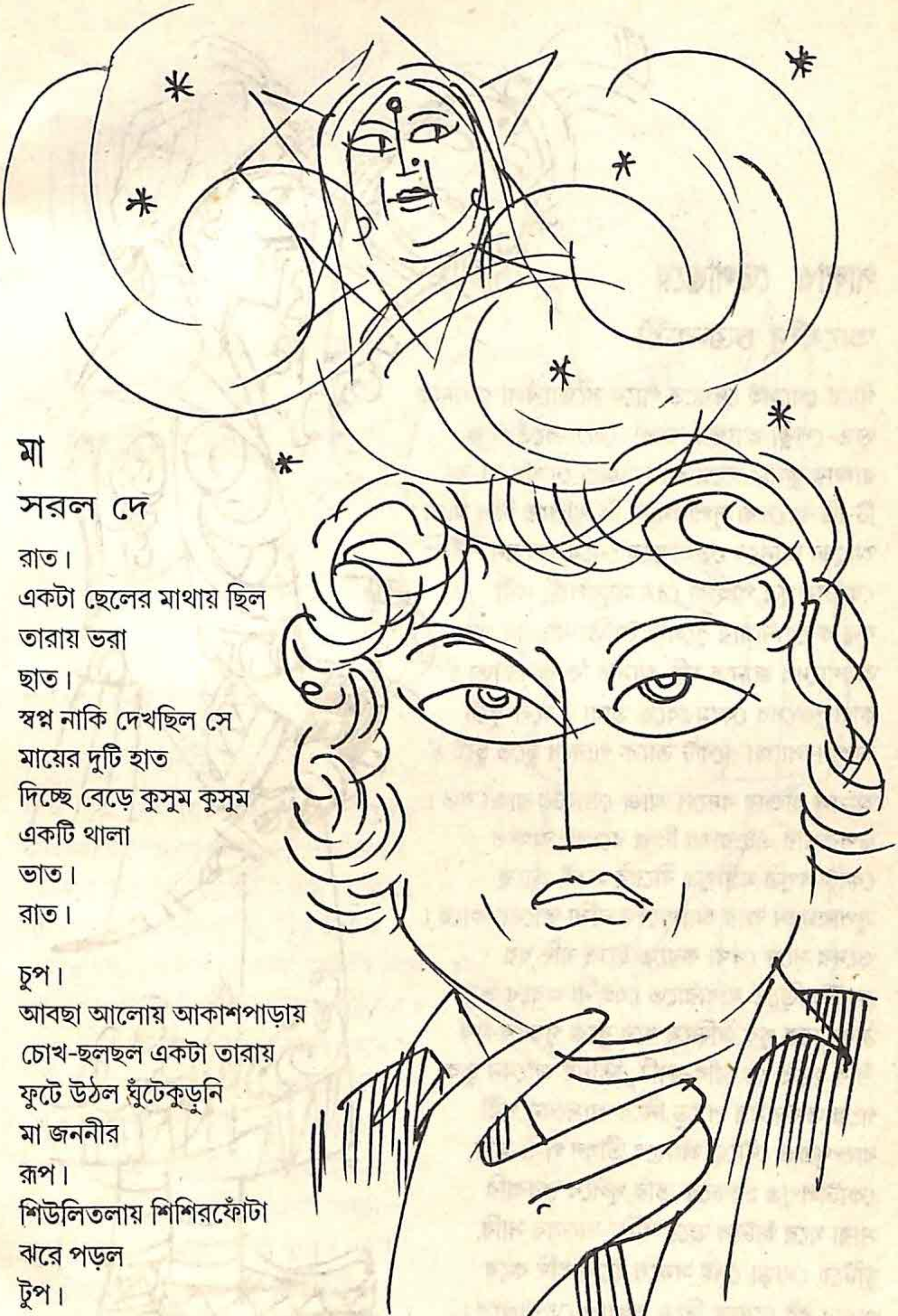
মুড়ি ও জিলিপি সকালবেলায় বরাদ্দ যে,
দুপুরবেলায় নটেশাক আর করলা ভাজা—
কাঁচা কুশি-ছেঁচো তেল নুন-মাখা সুখাদ্য যে,
বেগুনফুলি না কিষেনভোগ কে আমের রাজা?

বিকেলবেলায় গুড় দিয়ে মাখা ছাতুর বাটি,
মায়ের হাতের ঠাণ্ডা মধুর বেলের পানা,
ধবলীর দুধ সামনে দোয়ানো সফেন খাঁটি,
তাই দিয়ে কাটা চিনি-সন্দেশ টাটকা ছানা।

রাত্তিরবেলা কলার পাতায় পটল-ভাতে,
সঙ্গে যে তার মাছের ডিমের বড়ার টক।
বেড়া-বিনুনিটি জড়ানো রয়েছে রিবন যাতে
ছোট বোনটির হয়েছিল বড় চাখার শখ।

দিদার গল্প এক মন হয়ে দু'জনে শোনে,
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি বলে কত না কথা—
শুনতে-শুনতে ঢুলুনিতে দুটি ভাই ও বোনে
কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে পড়ে ভুলে খেলার কথা।

সেই বৈশাখ আলো-রাঙা হাতে নাড়ছে কড়া
ভাঙতে আঁধার মুখভার করা বন্ধ দ্বারে,
বছর শুরুতে ছুটি, তাই নেই লেখা ও পড়া,
মন খুশি করে সকলে এখন খেলতে যা রে।



মা

সরল দে

রাত।
একটা ছেলের মাথায় ছিল
তারায় ভরা
ছাত।
স্বপ্ন নাকি দেখছিল সে
মায়ের দুটি হাত
দিচ্ছে বেড়ে কুসুম কুসুম
একটি থালা
ভাত।
রাত।

চুপ।
আবছা আলোয় আকাশপাড়ায়
চোখ-ছলছল একটা তারায়
ফুটে উঠল ঘুঁটেকুড়ুনি
মা জননীর
রূপ।
শিউলিতলায় শিশিরফোঁটা
ঝরে পড়ল
টুপ।
চুপ।

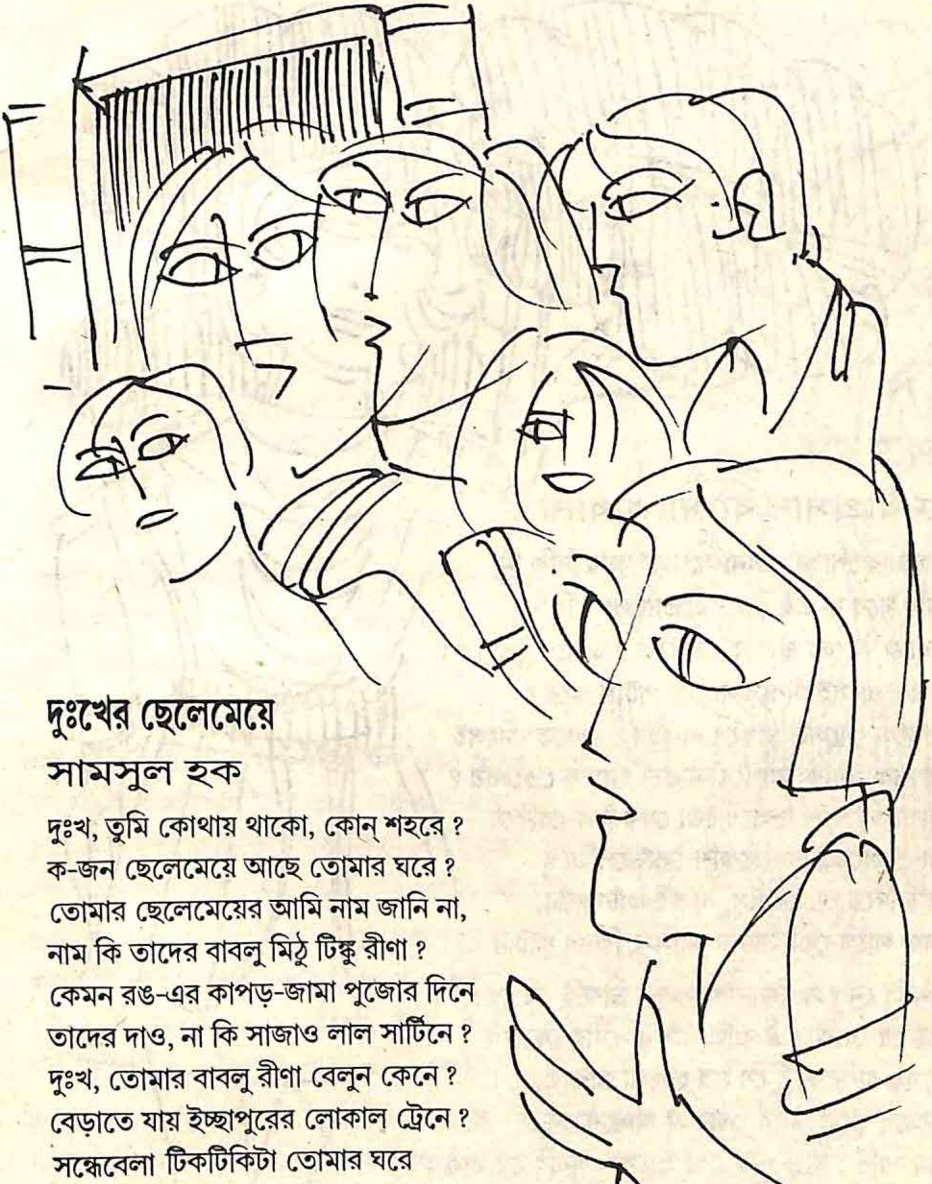


পালাও তেপান্তরে

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

গাঁয়ে গেলেই দেখতে পাবে সন্ধ্যেবেলা জোনাক
ভূত-পেত্নী আছেন, আহা, বেঁচে-বর্তে থাক !
রাজার কুমার স্বপ্নে বলে, 'একি দেখছি যা-তা
টি-ভি-র দেখা সুপারম্যান কি ঘুলিয়ে দিল মাথা ?
আজো জানবে তেপান্তরে নেমে আসেন পরী
কোটালপুত্র পাহারা দেয় ময়ূরপঙ্খী তরী
যুদ্ধ ক'রে নামায় ধুলোয় দৈত্যি-দানোর মাথা
অরণ্যদেব জানত যদি আসত কি কলকাতা ?
কালপুরুষের কোমরবন্ধে তারা উঠলে ফুটে
আগুন-ল্যাজা রকেট তাকে পারবে ছুঁতে ছুটে ?'

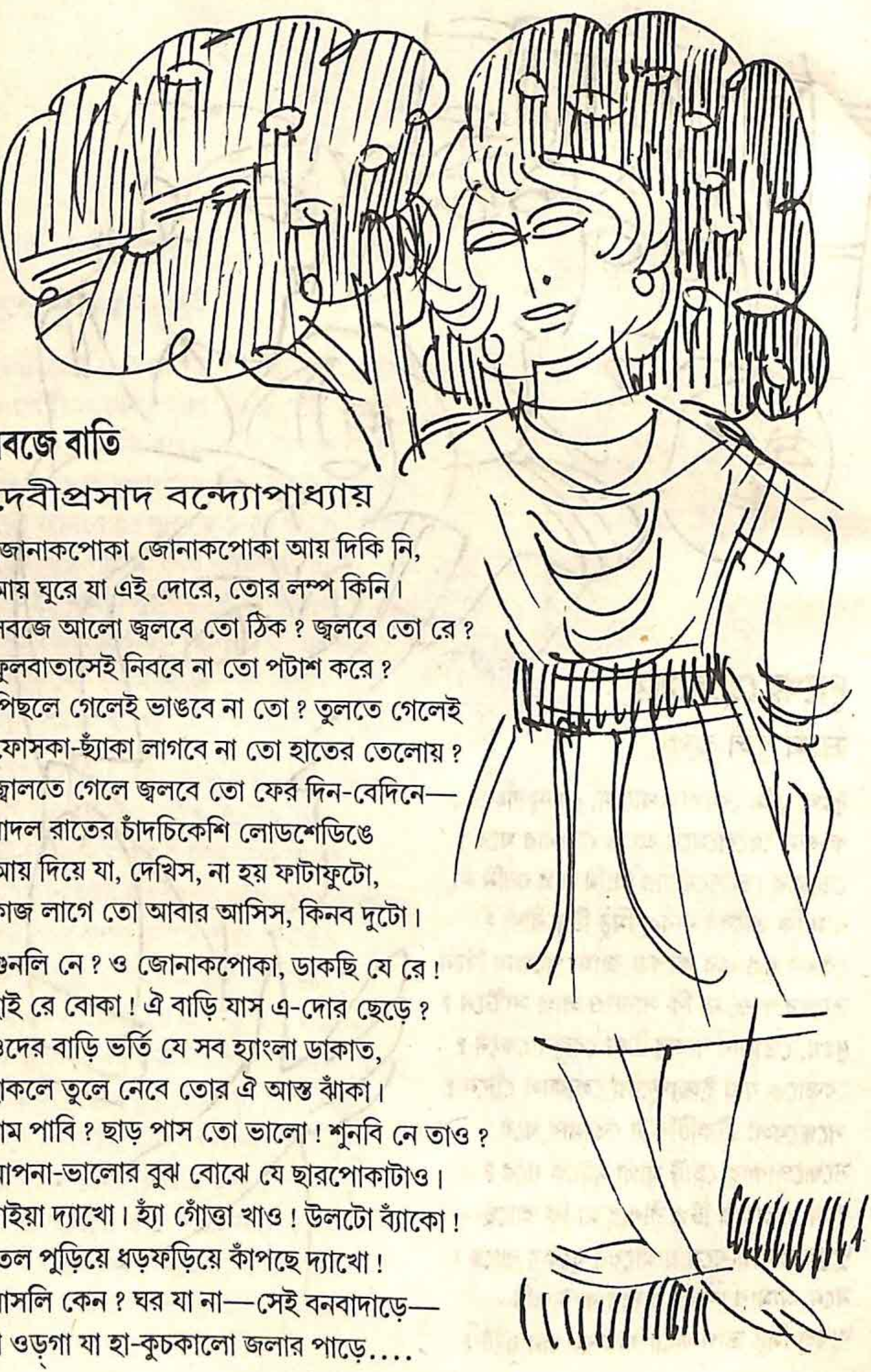
আসল রাজার বদলে আজ ভোটের রাজা যত !
রূপকথার এই রাজা কিন্তু রয়েছে অক্ষত
কোটালপুত্র মন্ত্রীপুত্র বীরের মতই আছে
সুপারম্যান আর অরণ্যদেব নস্যি তাদের কাছে।
ওদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে যদি হয়
ফ্ল্যাটবাড়িতে মধ্যিরাতে যেই না করবে ভয়
ঠাক্‌মাকে খুব জড়িয়ে ধরে বুকে গুঁজবে মুখ
তাঁর হাতে যে চাবি-কাঠি, তিনিই জানেন তুক
গল্পে তখন মন্ত্র প'ড়ে নিয়ে আসবেন পরী
রাজপুত্রও দৌড়ে আসবে ভীষণ পড়ি-মরি
কোটালপুত্র চকচকে তার খুলবে তরবারি
সারা ঘরে হাঁটবে ভয়ে দত্যি-দানোর সারি,
ছুটিয়ে ঘোড়া সেই সময়ে ইচ্ছে যদি করে
পড়ার বই চুলোয় দিয়ে পালাও তেপান্তরে।



দুঃখের ছেলেমেয়ে

সামসুল হক

দুঃখ, তুমি কোথায় থাকো, কোন্ শহরে ?
ক-জন ছেলেমেয়ে আছে তোমার ঘরে ?
তোমার ছেলেমেয়ের আমি নাম জানি না,
নাম কি তাদের বাবলু মিঠু টিঙ্কু রীণা ?
কেমন রঙ-এর কাপড়-জামা পুজোর দিনে
তাদের দাও, না কি সাজাও লাল সার্টিনে ?
দুঃখ, তোমার বাবলু রীণা বেলুন কেনে ?
বেড়াতে যায় ইচ্ছাপুরের লোকাল ট্রেনে ?
সন্ধেবেলা টিকটিকিটা তোমার ঘরে
সন্ধেপোকার ছোট্ট মাথা মট্‌কে ধরে ?
দুঃখ, তোমার টিঙ্কু রীণার মা কি আছে—
দুপুরবেলায় ঘুমোয় মায়ের বুকের কাছে ?
মনে আমার কতো কথার কাটাকুটি—
বাবলু মিঠু ভাগ করে খায় ক-খান রুটি ?

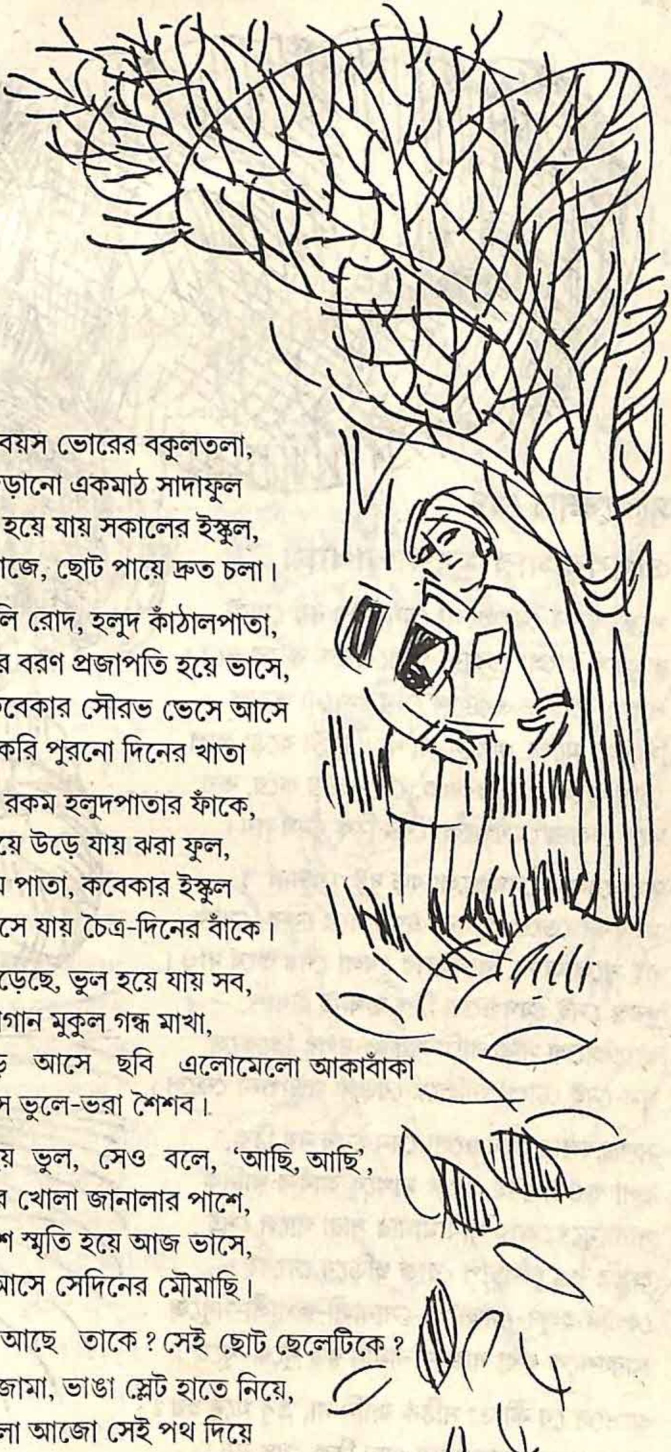


সবজে বাতি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জোনাকপোকা জোনাকপোকা আয় দিকি নি,
আয় ঘুরে যা এই দোরে, তোর লম্প কিনি।
সবজে আলো জ্বলবে তো ঠিক ? জ্বলবে তো রে ?
ফুলবাতাসেই নিববে না তো পটাশ করে ?
পিছলে গেলেই ভাঙবে না তো ? তুলতে গেলেই
ফোসকা-ছ্যাঁকা লাগবে না তো হাতের তেলোয় ?
জ্বালতে গেলে জ্বলবে তো ফের দিন-বেদিনে—
বাদল রাতের চাঁদচিকেশি লোডশেডিঙে
আয় দিয়ে যা, দেখিস, না হয় ফাটাফুটো,
কাজ লাগে তো আবার আসিস, কিনব দুটো।

শুনলি নে ? ও জোনাকপোকা, ডাকছি যে রে !
হাই রে বোকা ! ঐ বাড়ি যাস এ-দোর ছেড়ে ?
ওদের বাড়ি ভর্তি যে সব হ্যাংলা ডাকাত,
হাঁকলে তুলে নেবে তোর ঐ আস্ত ঝাঁকা।
দাম পাবি ? ছাড় পাস তো ভালো ! শুনবি নে তাও ?
আপনা-ভালোর বুঝ বোঝে যে ছারপোকাটাও।
গাঁইয়া দ্যাখো। হ্যাঁ গোঁত্তা খাও ! উলটো ব্যাঁকো !
তেল পুড়িয়ে ধড়ফড়িয়ে কাঁপছে দ্যাখো !
আসলি কেন ? ঘর যা না—সেই বনবাদাড়ে—
যা ওড়্গা যা হা-কুচকালো জলার পাড়ে....



পুরনো দিনের খাতা

তারাপদ রায়

আমাদের সেই হারানো বয়স ভোরের বকুলতলা,
সবুজ ঘাসের শিশিরে জড়ানো একমাঠ সাদাফুল
ঘোরা পথে যেতে দেরি হয়ে যায় সকালের ইস্কুল,
হঠাৎ ঘন্টা, শেষ বেল বাজে, ছোট পায়ে দ্রুত চলা।

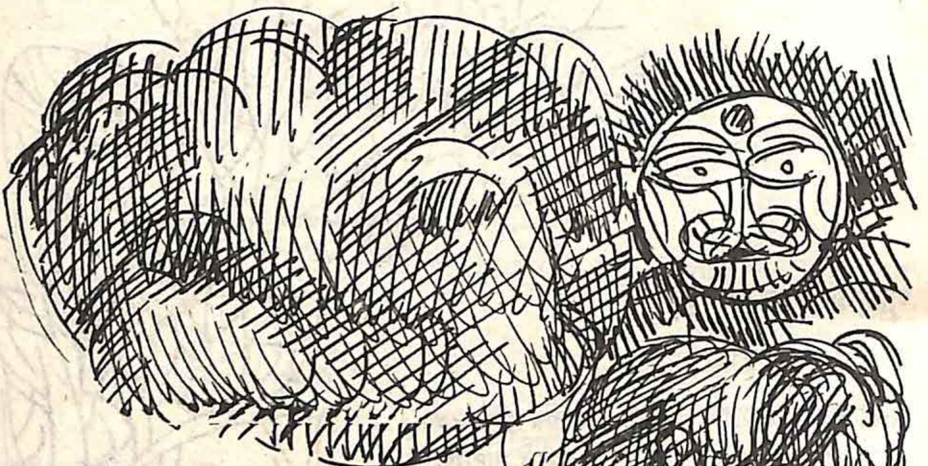
আমের বাগানে ঝিলিমিলি রোদ, হলুদ কাঁঠালপাতা,
ভোরের আলোয় সোনার বরণ প্রজাপতি হয়ে ভাসে,
বাতাসে-বাতাসে সেই কবেকার সৌরভ ভেসে আসে
বহুকাল পরে খুঁজে বার করি পুরনো দিনের খাতা

এই তো এখানে আরেক রকম হলুদপাতার ফাঁকে,
দুই পঙ্‌ক্তির মাঝপথ দিয়ে উড়ে যায় ঝরা ফুল,
উড়ে যায় ফুল, উড়ে যায় পাতা, কবেকার ইস্কুল
মেঘের মতন ভেসে-ভেসে যায় চৈত্র-দিনের বাঁকে।

ভুল হয়ে যায়, বয়েস বেড়েছে, ভুল হয়ে যায় সব,
কত দূরে সেই আমের বাগান মুকুল গন্ধ মাখা,
কত দূর থেকে উড়ে আসে ছবি এলোমেলো আকাবাঁকা
ঝরা মুকুলের সুদূর সুবাসে ভুলে-ভরা শৈশব।

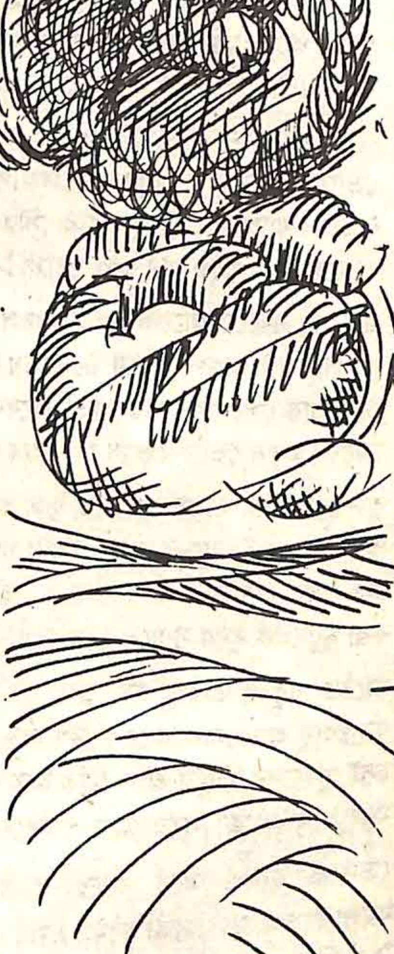
মাঠের বকুল তারও হয় ভুল, সেও বলে, 'আছি, আছি',
বসন্তবায়ু আনাগোনা করে খোলা জানালার পাশে,
সেই সুবাসের কিছুটা অংশ স্মৃতি হয়ে আজ ভাসে,
মধুগুঞ্জনে আজো ফিরে আসে সেদিনের মৌমাছি।

ভোরের বকুল, মনে আছে তাকে? সেই ছোট ছেলেটিকে?
ময়লা ইজের, ফুল-হাতা জামা, ভাঙা স্লেট হাতে নিয়ে,
চৈত্র-দিনের এই ভোরবেলা আজো সেই পথ দিয়ে
সে এখনো হাঁটে সেই আমতলা হলুদ পাতার দিকে।



সন্ধেবেলার মেঘ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়



সন্ধেবেলার মেঘগুলো যেন মেঘ নয় মোটে
রাক্ষুসে কালো চেহারা দেখলে ভয় ক'রে ওঠে।
পাহাড়-পাহাড় একরাশ মেঘ কখনো ভয়াল
সিংহের মতো, কখনো বা বাঘ, দুটো বড়ো লাল
চোখ জ্বলে ওঠে ধকধক, দেখে ভয় করে, ভয়......
সন্ধেবেলার মেঘগুলো যেন ঠিক মেঘ নয়।

সন্ধেবেলার মেঘগুলো বড় দুষ্টু, কেননা
মা যখন ডেকে বলেন, এখন ঘরে ফের, সোনা,
বই খুলে বসো, বিকেলের খেলা শেষ করে দাও।
দুরন্ত সেই মেঘগুলো ঠিক তখনই উধাও,
ছায়াকালো সারা রাত্রি-সকাল-দুপুর-বিকেলে
ঘুম-নেই চোখে পালিয়ে বেড়ায় পড়াশুনা ফেলে।

সন্ধেবেলার মেঘগুলো যেন মেঘ নয় ঠিক,
বলা কওয়া নেই, হঠাৎ মাখবে আবীর খানিক
সারা মুখে, আর সূয্যিমামার সারা গালে সেই
অদ্ভুত রঙ্ চুপিচুপি রোজ ছড়িয়ে দেবেই!
বেগনি-হলুদ-গোলাপী-সোনালী-রূপালী-সবুজে
আকাশকে ওরা সাজায় নানান রঙ্ খুঁজে-খুঁজে।

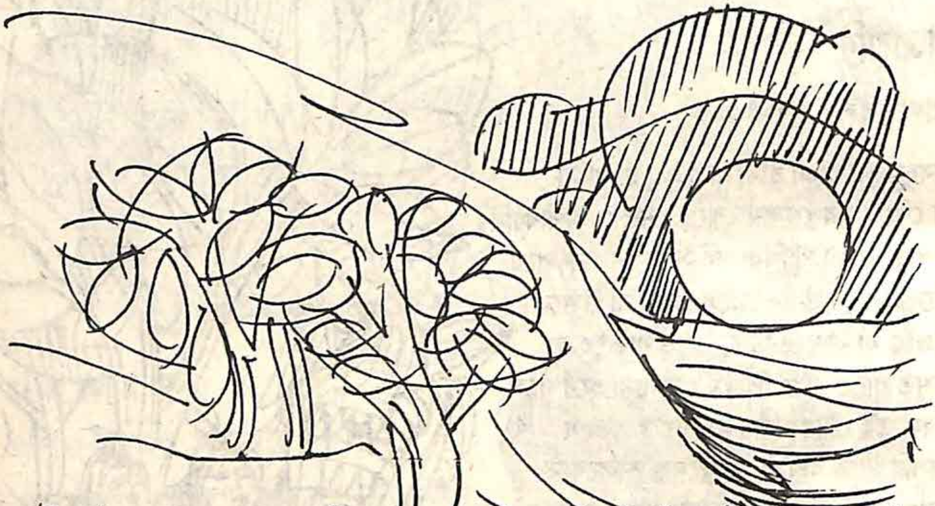
আসলে যে কী তা সঠিক জানি না, তবু মনে হয়ঃ
সন্ধেবেলার মেঘগুলো যেন ঠিক মেঘ নয়।

রাজারানি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত



বাবলু, তুই রাজা হবি, বাবলি তুই রানি?
গা থেকে সব ফেলব ঝেড়ে নোংরা কাঁথাকানি।
নীলচে রঙের পাখিরা সব সাদা নোলক পরে
চীনের দেশে তখন মেলে একটু বা উত্তরে।
প্রজাও যা রাজাও তাই, তবুও রাজা হলে
নিশুত রাতে রাঙা পিদিম জ্যোছ্না হয়ে গলে—
বাবলু তুই নৌকা হয়ে দুধসায়রে ভেসে
আসবি নিয়ে বাবলিকে অনেক ভালবেসে,
তারপরে কি টগবগিয়ে চড়বি লাল ঘোড়া?
চিনতে পাবি কলকাতাকে কানে পালক-পোরা?
এই তো সেই রাস্তাঘাট, একই তো ট্রাম, ধুলো—
কিন্তু এখন কোথাও নেই বানানো পরচুলো,
বাবলি ভেবেছিল তার ফোকলা দাঁত বলে
রানির মতো দেখাবে না মেয়েদের দঙ্গলে,
কিন্তু সবাই মেনে নিল, মেনে নিল সবাই—
শর্ত শুধু একটি আর হবে না কেউ জবাই।
বাবলু থাকে এই পাড়ায়, বাবলি কাছাকাছি—
সকালদুপুর টাপুরটুপুর খেলছে কানামাছি,
চেনা ছেলে রাজা হলে অনেক সুবিধে তো,
নইলে এত সহজে কি সবাই ছাড়া পেত?
বাবলি আরও বেশি চেনা, রানির মতো রানি,
চাবুকে নয়, থাকবে সুখে এখন জনপ্রাণী।
বাবলু তুই রাজা হলে ভুলবি না তো আমায়?
ছোট একটা তালি আমি দিয়েছি তোর জামায়।
বাবলি, তুই বড্ড রোগা, ঘুমকাতুরে বড়—
রাত না হতে তুই কেবলই খিদেয় জড়সড়;
এখন তোরা রাজারানি, খাওয়াবি আর খাবি।
একটা টাকা ওদের দিলে দশটা টাকা পাবি।



ছোট্ট মুখ
লাল টুক্ টুক্

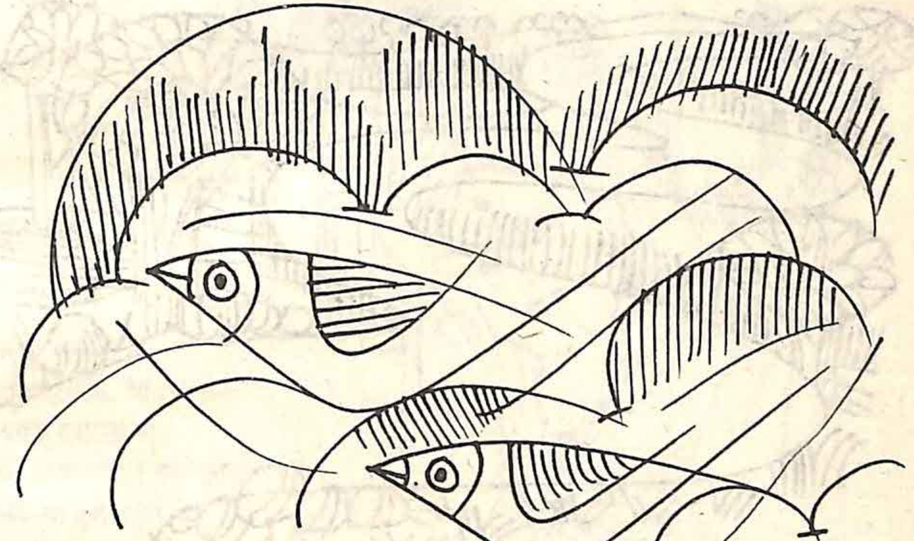
রত্নেশ্বর হাজরা



বিশ কাহারে বাইশ কাহারে দূরের পাল্লা
পথের ধারে.....
গ্রাম সুবাদে মাসীপিসি দাঁড়িয়ে বলে, কোন্
ছোট্ট বোন লাল টুক্ টুক্
ক' ভায়ের এক বোন?

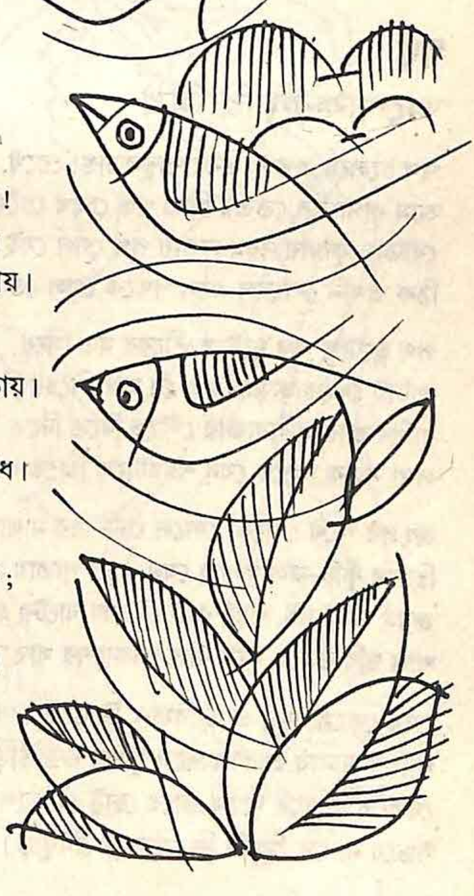
বিকেল ছিল বকুলতলায়, পিছে-পিছে
সেও চলে যায়
যেতে যেতে যেতে যেতে—খাদ......
ডাইনে পাহাড় বাঁয়ে পাহাড়
পিছন থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ—

চাঁদের সাথে গভীর রাতে আড়ি ছিল
ভাব জমাতে
চেলির উপর নেমে বলল, কোন্
ছোট্ট মুখ লাল টুক্ টুক্
ক' ভায়ের তুই বোন?



ছুটির সানাই বেজে ওঠে

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত



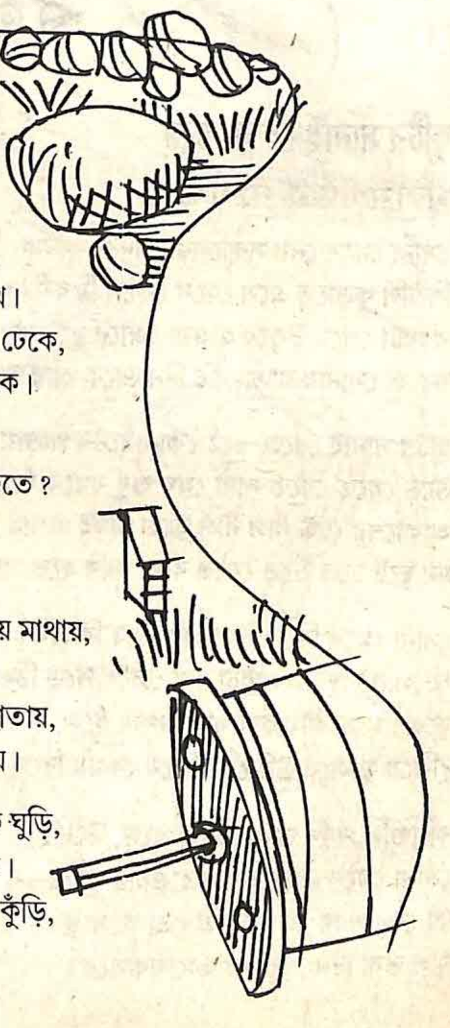
সোনা মেখে নেয় সকালের রোদ ঝিক্‌মিক্
শিউলি কুড়াতে এসে হেসে ফেলে ফিকফিক্ !
খবরটা পেয়ে উত্তুরে হাওয়া জোরে ছুটে যায়
সবুজে সোনায় মাতামাতি দিন ডাকে আয় আয়।

ছুটির সানাই বেজে ওঠে কোন মনের পাড়ায়
উড়ে যেতে যেতে সাদা মেঘ শুধু থমকে দাঁড়ায়।
আকাশের ঢেউ নীল নীল আহা অথই অগাধ
মন ছুটে চলে উড়ে যেতে বলে পাখি হতে সাধ।

সোনা মেখে নিলে সকালের রোদ ঝিক্‌মিক্
আলোর যাদুতে খবরটা ধরা চোখে পড়ে ঠিক ;
বুকের মধ্যে সীমাহীন খুশি অপার ইচ্ছে
দুলিয়ে ভুলিয়ে উড়িয়ে ছড়িয়ে কেমন দিচ্ছে।

খুশিগুলি পাখি ডানা মেলে ওড়ে, উড়ছে ;
সোনা মেখে রোদ অবাধ হাওয়ায় ঘুরছে—
কী যেন খবর কে যেন ঐ তো আসছে
খুশি ভরা দিন ; আশ্বিন ভালোবাসছে !





পথ

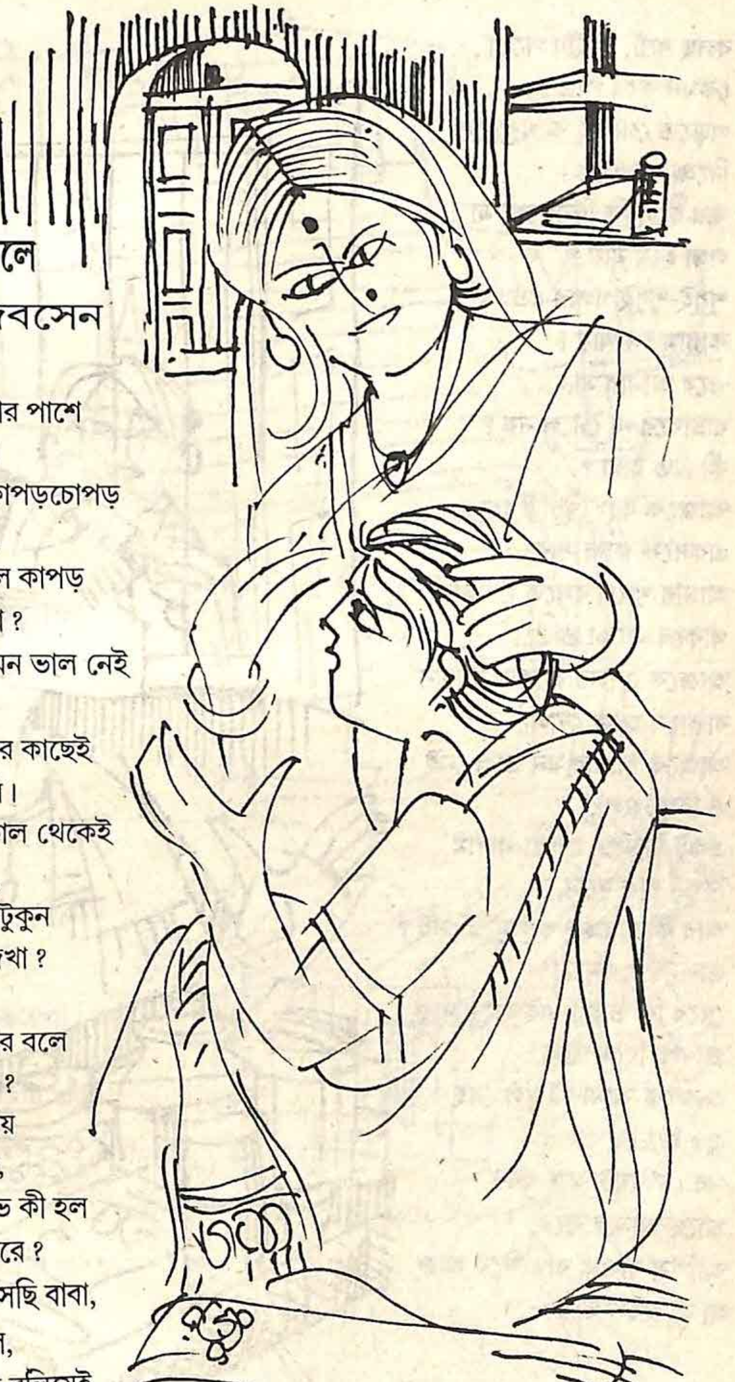
অশোককুমার মিত্র

পথ চলেছে একলা একা পারুলডাঙা রেখে,
আম বাগানের ভেতর দিয়ে গন্ধ চেখে চেখে।
বোতাম ফুলের নরম লতায় পথ গেল যেই ঢেকে,
ঠিক তখনি দোয়েল এসে পথকে গেল ডেকে।

পথ ছুটেছে পথ ছুটেছে তীরের মত সিধে,
লাটাই থেকে ছাড়ছে কে রে মস্ত পিচের ফিতে ?
রাণিবাজার মুন্সিবাজার পৌঁছে দিতে দিতে
লম্বা সড়ক চলছে যেন শহরটাকে জিতে।

জলের পথে নৌকো দোলে ঢেউ-এর মাথায় মাথায়,
হিরের কুঁচি-জল দুলছে যেন কচুর পাতায়।
জ্যাম জট নেই, শুধুই কটি নৌকো ঘাটের হাতায়,
শান্ত ছবি উঠছে ফুটে নীল আকাশের খাতায়।

মেঘ ভেসে যায়, ওড়ে বিমান, উড়েছে ডাক ঘুড়ি,
পাখির ডানায় আকাশ পথে খুশির ওড়াউড়ি।
দেখতে দেখতে দুঃখে ভাবে ছোট্ট গোলাপ কুঁড়ি,
উড়বে না সে, মিষ্টুদি কি নড়বড়ে চৌঘুড়ি।



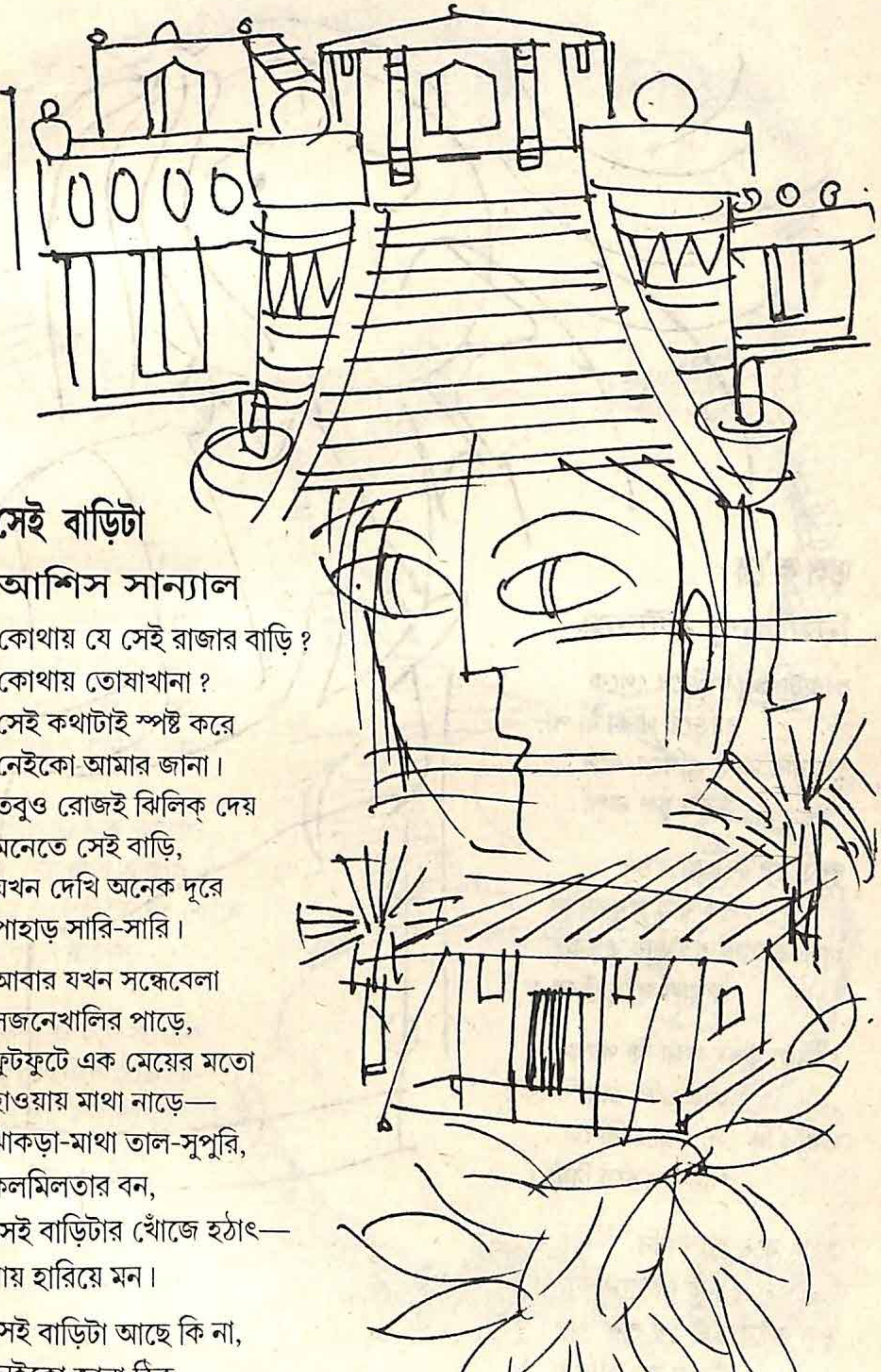
জ্বর হয়েছে বলে

নবনীতা দেবসেন

ওরে আমার মা,
জ্বর হয়েছে, আমার পাশে
একটু বোসো না।
কী অত কাজ ? কাপড়চোপড়
নাই-বা হল কাচা,
একদিন না কাচলে কাপড়
যায় না বুঝি সাজা ?
আজকে আমার মন ভাল নেই
ঘঙর ঘঙর কাসি
এমনি দিয়ে মায়ের কাছেই
থাকতে ভালবাসি।
এই যে আমি সকাল থেকেই
বিছনাটিতে একা,
এর মাঝে মা কত্তটুকুন
পাচ্ছি তোমার দেখা ?
ওরে আমার মা,
জ্বর হয়েছে আমার বলে
আপিস গেলে না ?
কিন্তু যদি ঘরকন্নায়
সময়টা যায় ভরে,
তোমার তবে লাভ কী হল
আপিস কামাই করে ?
'পাঁচমিনিটেই আসছি বাবা,
এইটা পড়ো' বলে,
একটু মাথায় হাত বুলিয়েই
যাচ্ছ কোথায় চলে ?

বলছ বটে, 'এইটা পড়ো',
কেমন করে পড়ি ?
পড়তে গেলেই আখরগুলো
দিচ্ছে গড়াগড়ি।
জ্বর হলে কি দিনগুলো মা
লম্বা হয়ে যায় ?
শুধুই-শুধুই গলার ভেতর
কান্নামতন পায় ?
ওরে আমার মা,
রান্নাঘরে না গেলে নয় ?
কী এত রান্না ?
আজকে বরং খিচুড়ি হোক,
একদফে কাজ সারা,
আমার পাশে বসতে তোমার
থাকবে নাকো তাড়া।
আজকে দিনের আকাশ আঁধার
বাতাসে আজ দোলা,
আজকে আমার মন ভাল নেই
ও বিস্কুটওলা,
একটু দাঁড়াও, পেস্তা-বাদাম
বিস্কুট দাও দুটো,
আর কী আছে ? ঝালমুড়ি নেই ?
ডালমুট একমুঠো
দেবে কি ভাই ? এই হাতে দাও
জানলা দিয়ে গলে,
আজকে আমার ইস্কুল নেই
জ্বর হয়েছে বলে।
সব চে' যেটা মস্ত খবর
আছে আমার জ্বরে,
আপিস যাওয়া বাদ দিয়ে আজ
মা রয়েছেন ঘরে।





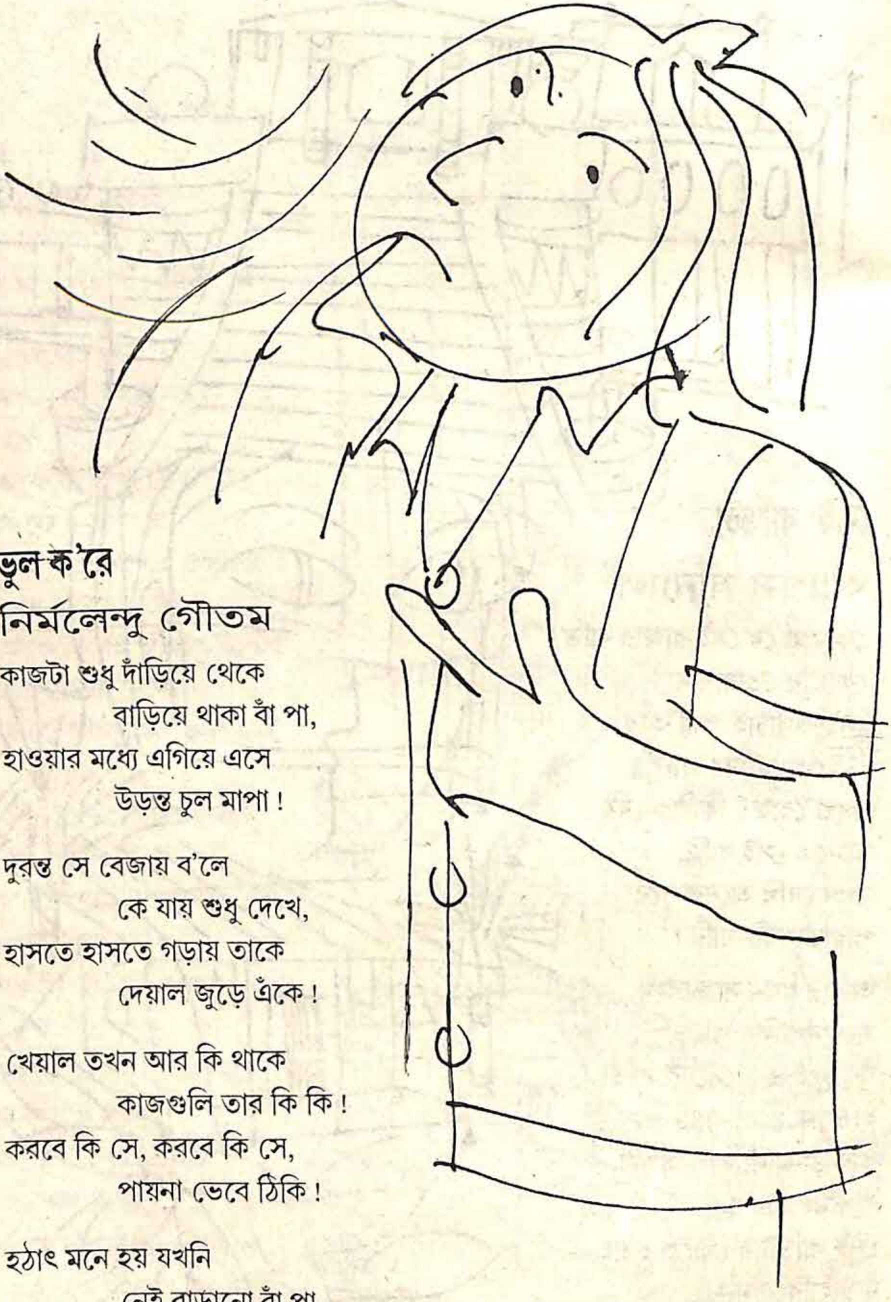
সেই বাড়িটা

আশিস সান্যাল

কোথায় যে সেই রাজার বাড়ি ?
কোথায় তোষাখানা ?
সেই কথাটাই স্পষ্ট করে
নেইকো আমার জানা।
তবুও রোজই ঝিলিক্ দেয়
মনেতে সেই বাড়ি,
যখন দেখি অনেক দূরে
পাহাড় সারি-সারি।

আবার যখন সন্ধেবেলা
সজনেখালির পাড়ে,
ফুটফুটে এক মেয়ের মতো
হাওয়ায় মাথা নাড়ে—
ঝাঁকড়া-মাথা তাল-সুপুরি,
কলমিলতার বন,
সেই বাড়িটার খোঁজে হঠাৎ—
যায় হারিয়ে মন।

সেই বাড়িটা আছে কি না,
নেইকো জানা ঠিক ;
তবুও রোজই তারার মতো
মনেতে ঝিকমিক্।



ভুল ক'রে

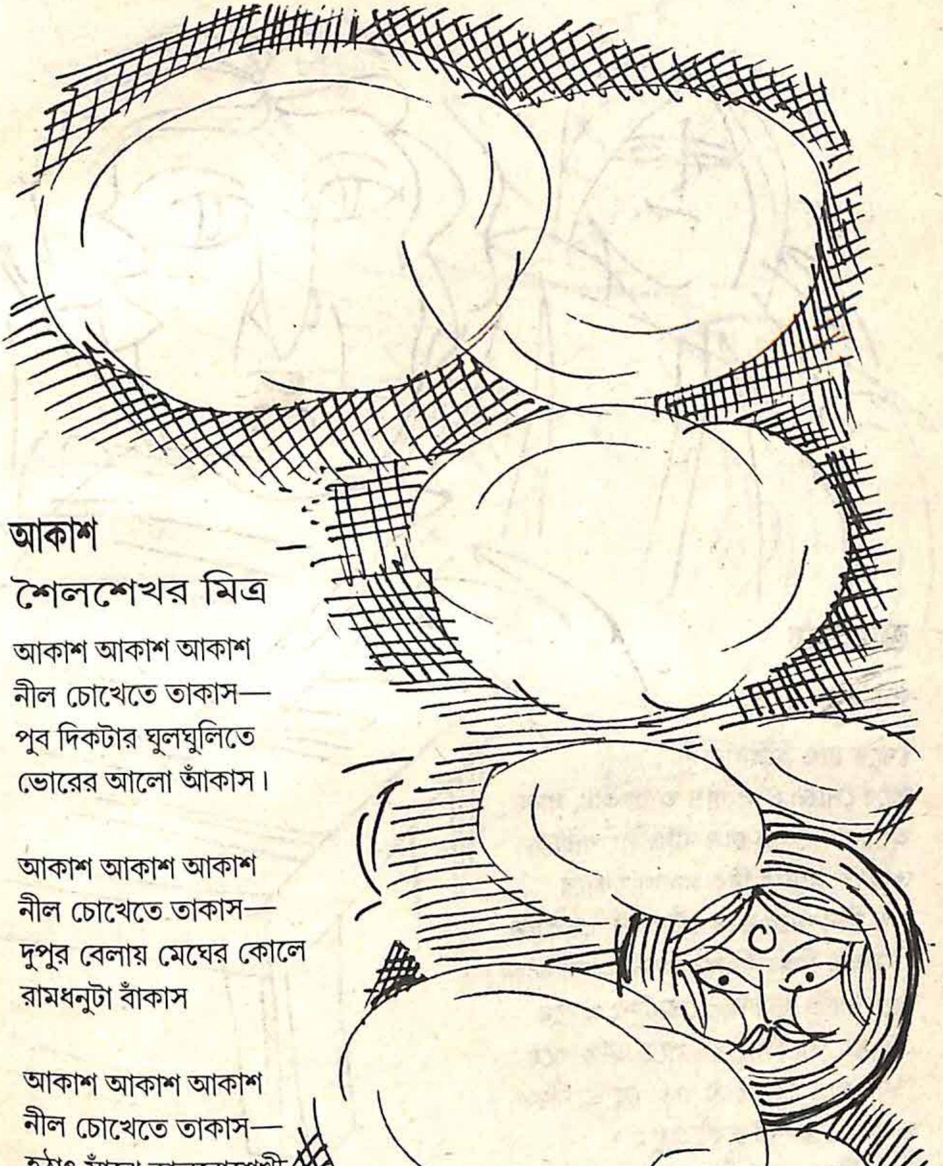
নির্মলেন্দু গৌতম

কাজটা শুধু দাঁড়িয়ে থেকে
বাড়িয়ে থাকা বাঁ পা,
হাওয়ার মধ্যে এগিয়ে এসে
উড়ন্ত চুল মাপা !

দুরন্ত সে বেজায় ব'লে
কে যায় শুধু দেখে,
হাসতে হাসতে গড়ায় তাকে
দেয়াল জুড়ে এঁকে !

খেয়াল তখন আর কি থাকে
কাজগুলি তার কি কি !
করবে কি সে, করবে কি সে,
পায়না ভেবে ঠিকি !

হঠাৎ মনে হয় যখনি
নেই বাড়ানো বাঁ পা,
ভুল ক'রে ভাই হয় শুরু তার
উড়ন্ত চুল মাপা !!



আকাশ

শৈলশেখর মিত্র

আকাশ আকাশ আকাশ
নীল চোখেতে তাকাস—
পুব দিকটার ঘুলঘুলিতে
ভোরের আলো আঁকাস।

আকাশ আকাশ আকাশ
নীল চোখেতে তাকাস—
দুপুর বেলায় মেঘের কোলে
রামধনুটা বাঁকাস

আকাশ আকাশ আকাশ
নীল চোখেতে তাকাস—
হঠাৎ সাঁঝে কালবোশেখীর
জুড়ি-গাড়ি হাঁকাস।

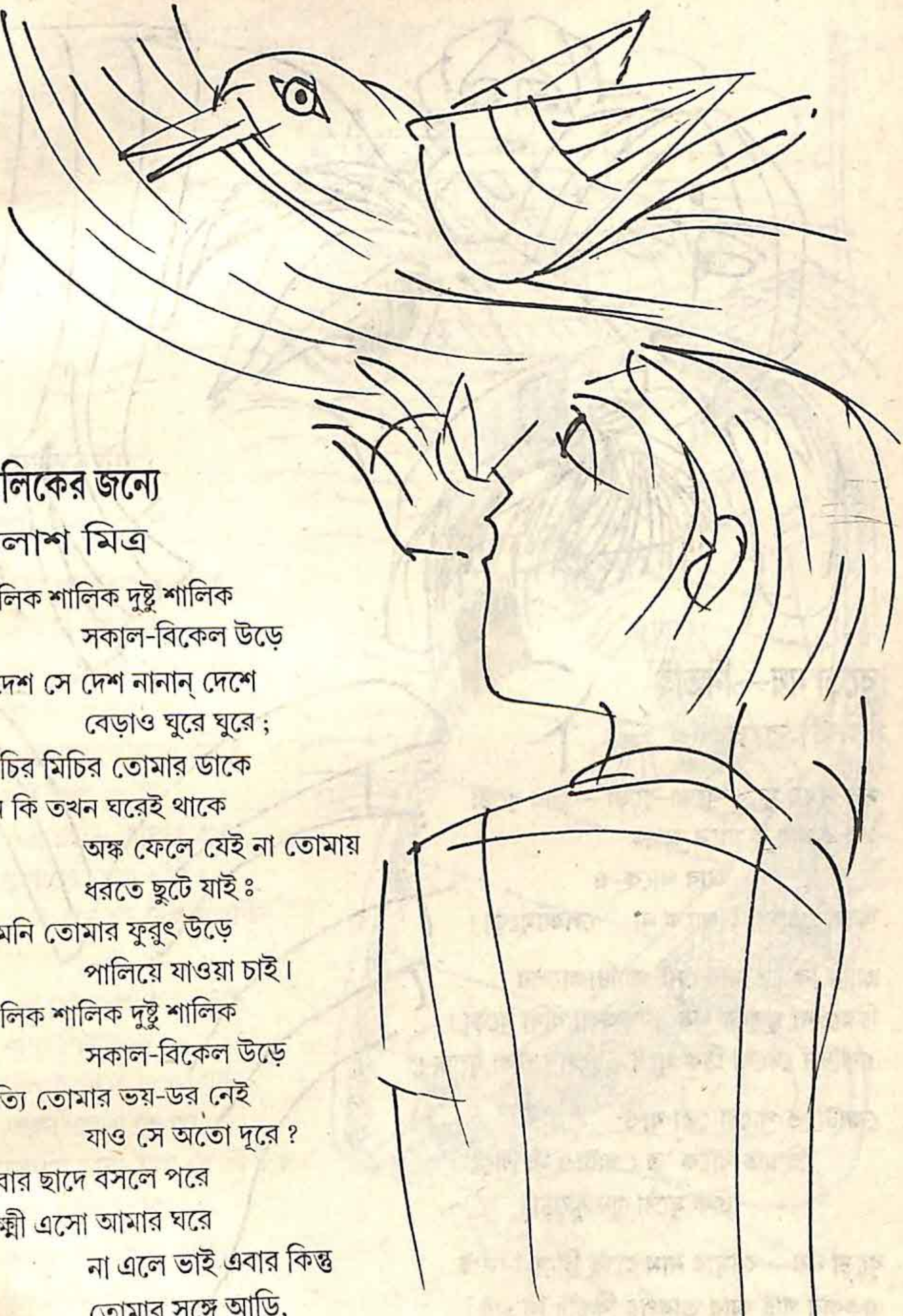
আকাশ আকাশ আকাশ
নীল চোখেতে তাকাস—
লুকিয়ে আবার জোছনারাতে
চাঁদকে হাসি মাখাস।



জ্ঞানকোষ

অনন্ত দাশ

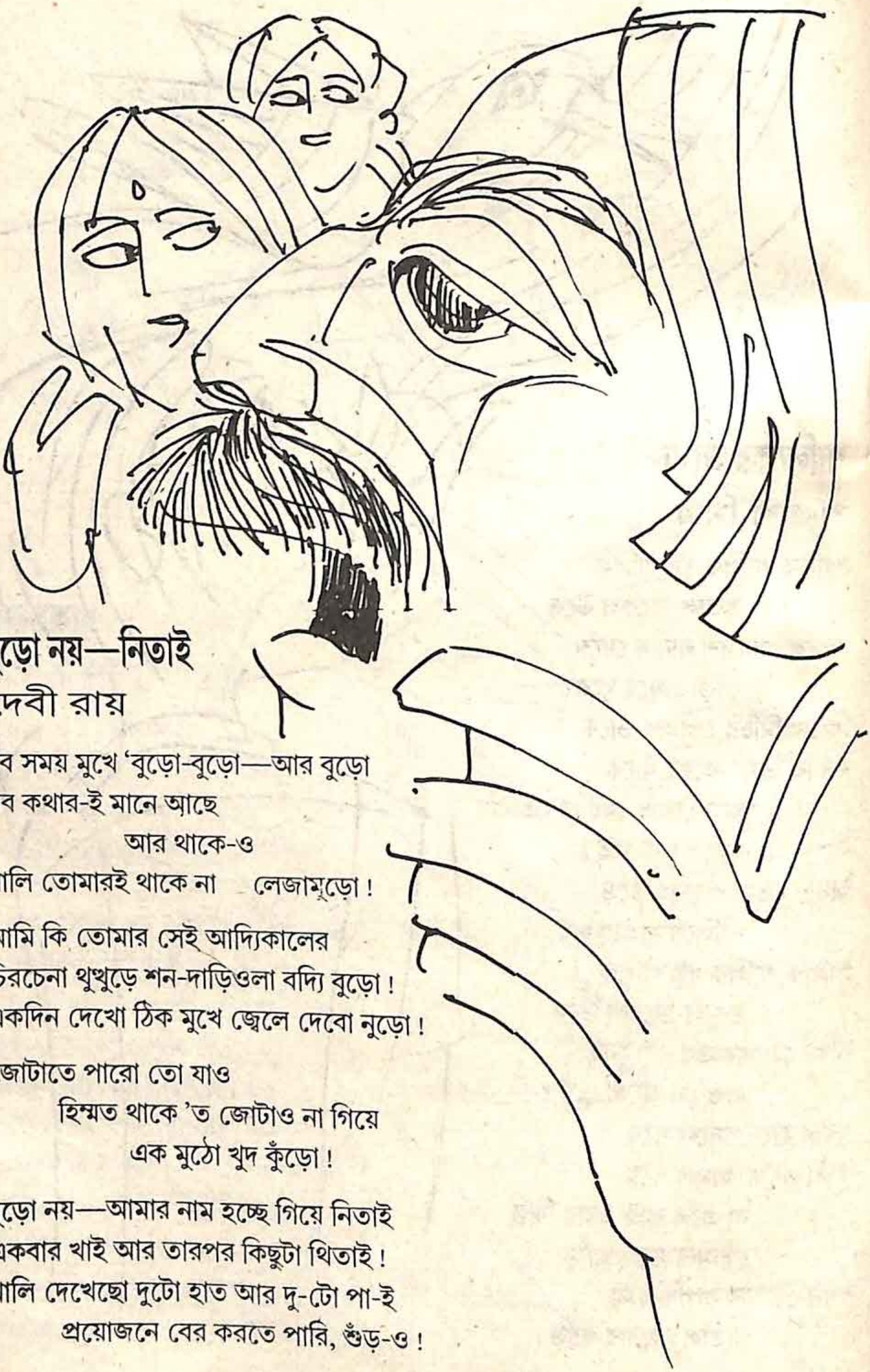
খেতে চাও মিহিদানা ?
তবে সোজা চলে যাও আফ্রিকায়, ঘানা
আর যদি যেতে চাও দার্জিলিং পাহাড়ে
তাহ'লে নামবে ঠিক মাদাগাস্কারে
চাও মিন্ পাবে তুমি স্টেশনারী দোকানে
ক্রিকেটে বিশ্বজয়ী মারাদোনা কেনা জানে !
চাঁদে পাড়ি দিয়েছিল তেনজিং প্রথমে
এই সব জানা যায় বই পড়ে অতি শ্রমে
বিনা তারে বেতারের বার্তা কে এনেছিল
জগদীশচন্দ্র ! না চাকী প্রফুল্ল ?
হয়ত বিষম খাবে ঠিক নাম শুনলে
তবু সব জানা যাবে জ্ঞানকোষ পড়লে
স্বাধীনতা এসেছিল পলাশীর যুদ্ধে
কী ভীষণ সে লড়াই অশোক ও বুদ্ধে—
পানিপথ রাজপথ সব হবে একাকার
যদি না পড়তে পার জ্ঞানকোষ একবার।



শালিকের জন্যে

পলাশ মিত্র

শালিক শালিক দুষ্টু শালিক
সকাল-বিকেল উড়ে
এদেশ সে দেশ নানান্ দেশে
বেড়াও ঘুরে ঘুরে ;
কিচির মিচির তোমার ডাকে
মন কি তখন ঘরেই থাকে
অঙ্ক ফেলে যেই না তোমায়
ধরতে ছুটে যাই ঃ
অমনি তোমার ফুরুৎ উড়ে
পালিয়ে যাওয়া চাই।
শালিক শালিক দুষ্টু শালিক
সকাল-বিকেল উড়ে
সত্যি তোমার ভয়-ডর নেই
যাও সে অতো দূরে ?
এবার ছাদে বসলে পরে
লক্ষ্মী এসো আমার ঘরে
না এলে ভাই এবার কিন্তু
তোমার সঙ্গে আড়ি,
তখন তোমায় চাপাবো না
পাতাল রেলের গাড়ি।



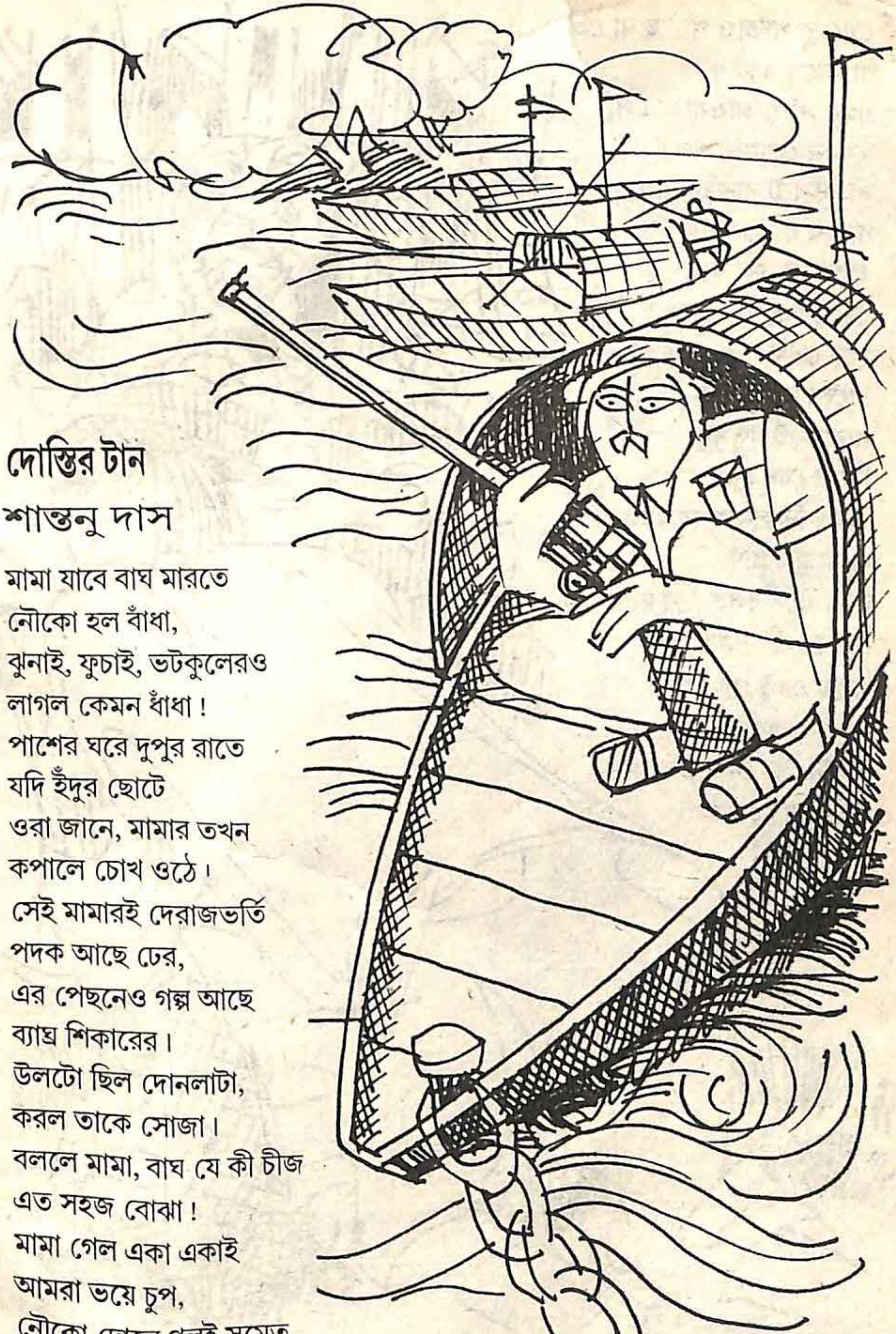
বুড়ো নয়—নিতাই
দেবী রায়

সব সময় মুখে 'বুড়ো-বুড়ো—আর বুড়ো
সব কথার-ই মানে আছে
আর থাকে-ও
খালি তোমারই থাকে না লেজামুড়ো!

আমি কি তোমার সেই আদ্যিকালের
চিরচেনা থুত্থুড়ে শন-দাড়িওলা বদ্যি বুড়ো!
একদিন দেখো ঠিক মুখে জ্বেলে দেবো নুড়ো!

জোটাতে পারো তো যাও
হিম্মত থাকে 'ত জোটাও না গিয়ে
এক মুঠো খুদ কুঁড়ো!

বুড়ো নয়—আমার নাম হচ্ছে গিয়ে নিতাই
একবার খাই আর তারপর কিছুটা থিতাই!
খালি দেখেছো দুটো হাত আর দু-টো পা-ই
প্রয়োজনে বের করতে পারি, শুঁড়-ও!

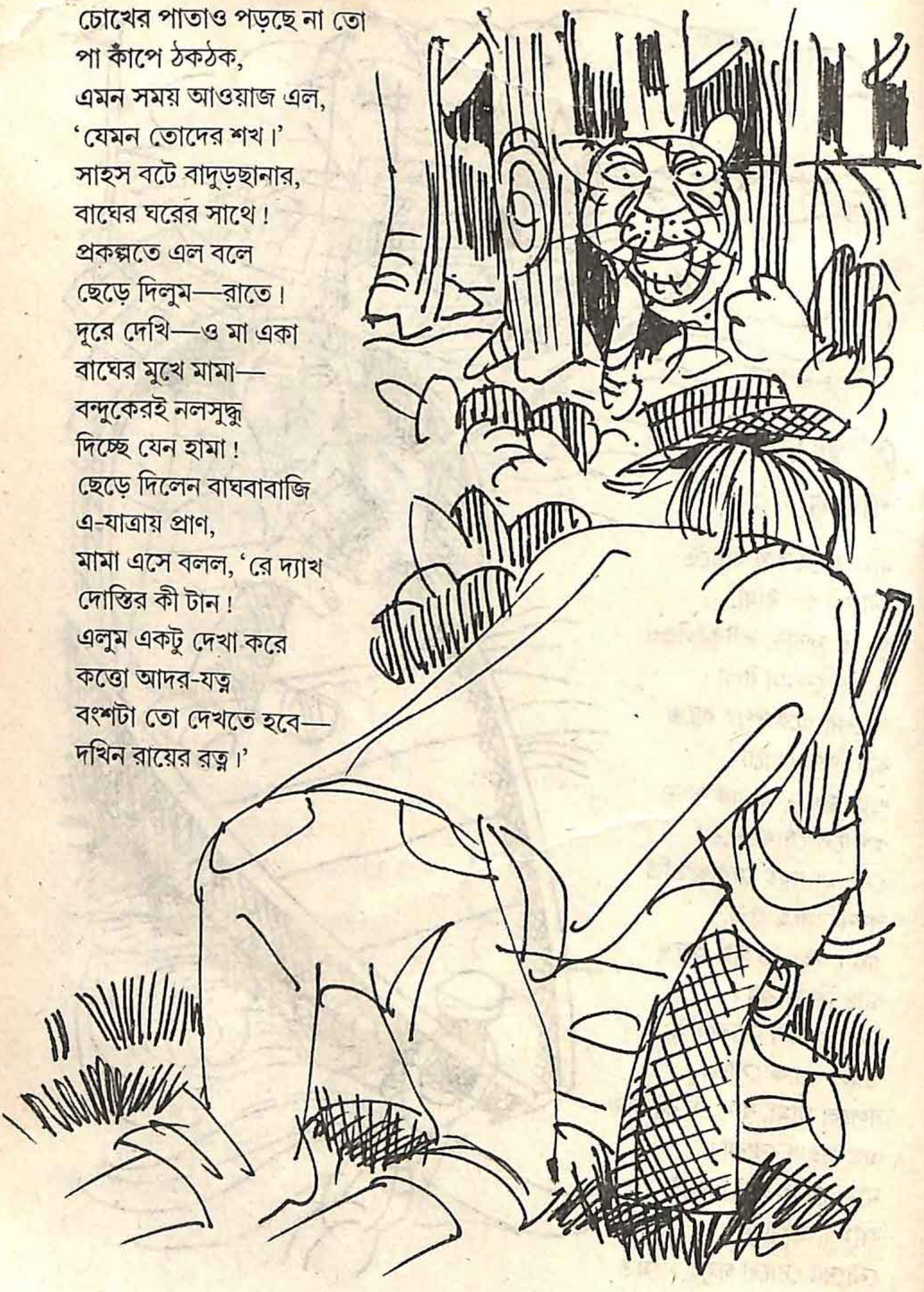


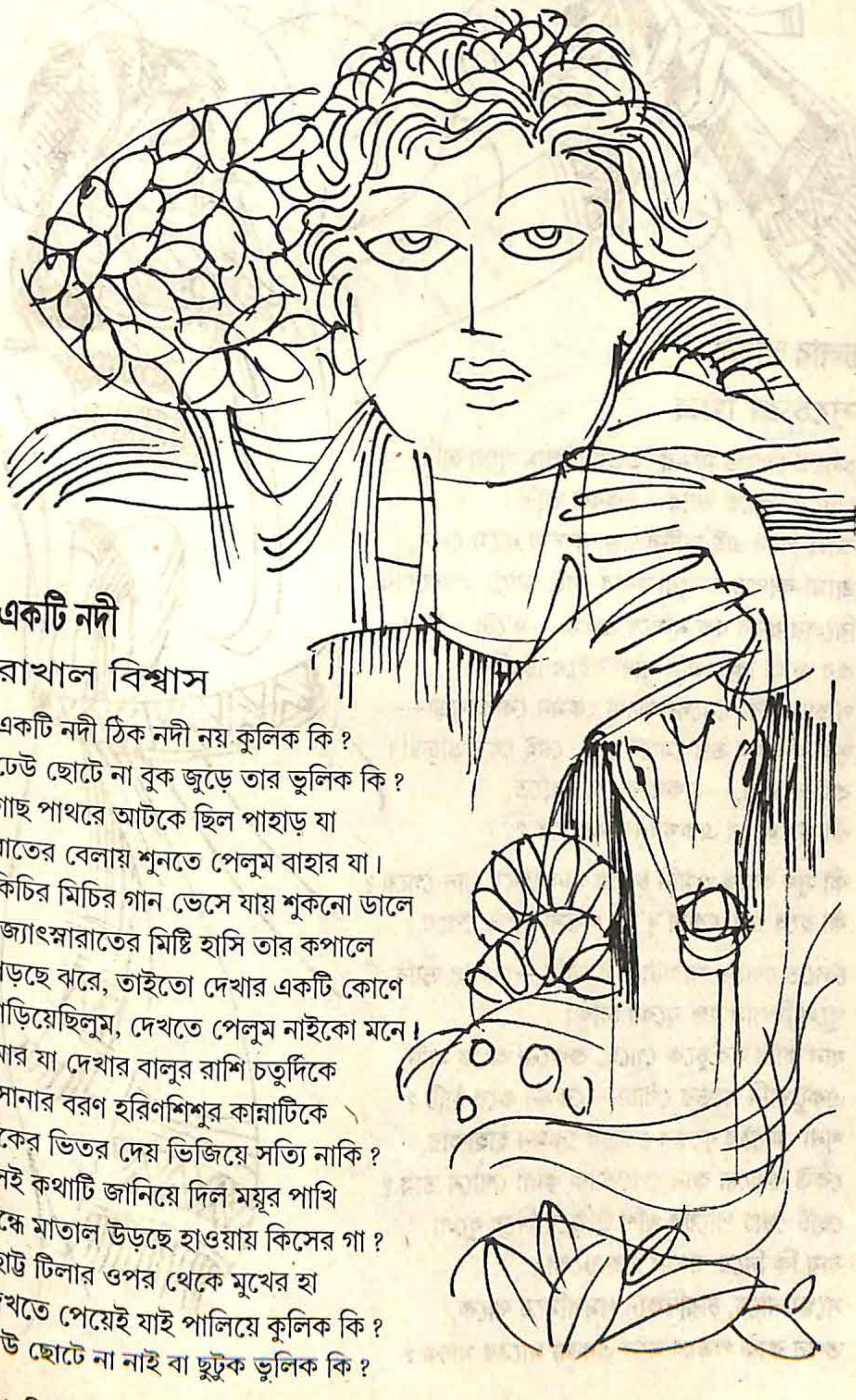
দোস্তির টান

শান্তনু দাস

মামা যাবে বাঘ মারতে
নৌকো হল বাঁধা,
ঝুনাই, ফুচাই, ভটকুলেরও
লাগল কেমন ধাঁধা!
পাশের ঘরে দুপুর রাতে
যদি ইঁদুর ছোটে
ওরা জানে, মামার তখন
কপালে চোখ ওঠে।
সেই মামারই দেরাজভর্তি
পদক আছে ঢের,
এর পেছনেও গল্প আছে
ব্যাঘ্র শিকারের।
উলটো ছিল দোনলাটা,
করল তাকে সোজা।
বললে মামা, বাঘ যে কী চীজ
এত সহজ বোঝা!
মামা গেল একা একাই
আমরা ভয়ে চুপ,
নৌকো দোলে গলুই সমেত
রাত্তির নিশ্চুপ।

চোখের পাতাও পড়ছে না তো
পা কাঁপে ঠকঠক,
এমন সময় আওয়াজ এল,
'যেমন তোদের শখ।'
সাহস বটে বাদুড়ছানার,
বাঘের ঘরের সাথে!
প্রকল্পতে এল বলে
ছেড়ে দিলুম—রাতে।
দূরে দেখি—ও মা একা
বাঘের মুখে মামা—
বন্দুকেরই নলসুদ্ধু
দিচ্ছে যেন হামা!
ছেড়ে দিলেন বাঘবাবাজি
এ-যাত্রায় প্রাণ,
মামা এসে বলল, 'রে দ্যাখ
দোস্তির কী টান!
এলুম একটু দেখা করে
কত্তো আদর-যত্ন
বংশটা তো দেখতে হবে—
দখিন রায়ের রত্ন।'

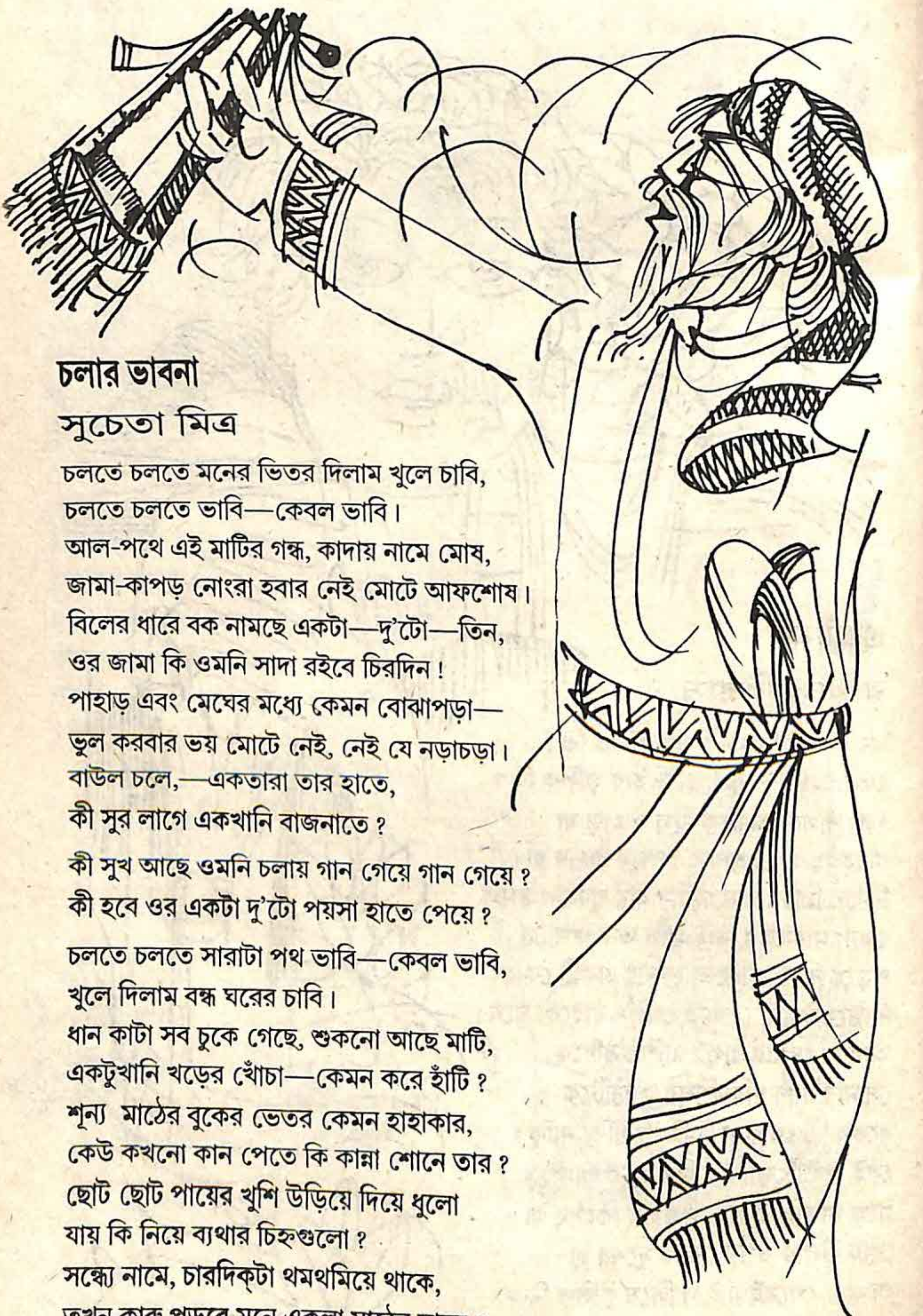




একটি নদী

রাখাল বিশ্বাস

একটি নদী ঠিক নদী নয় কুলিক কি ?
ঢেউ ছোটে না বুক জুড়ে তার ভুলিক কি ?
গাছ পাথরে আটকে ছিল পাহাড় যা
রাতের বেলায় শুনতে পেলুম বাহার যা।
কিচির মিচির গান ভেসে যায় শুকনো ডালে
জ্যোৎস্নারাতের মিষ্টি হাসি তার কপালে
পড়ছে ঝরে, তাইতো দেখার একটি কোণে
দাঁড়িয়েছিলুম, দেখতে পেলুম নাইকো মনে।
আর যা দেখার বালুর রাশি চতুর্দিকে
সোনার বরণ হরিণশিশুর কান্নাটিকে
বুকের ভিতর দেয় ভিজিয়ে সত্যি নাকি ?
সেই কথাটি জানিয়ে দিল ময়ূর পাখি
গন্ধে মাতাল উড়ছে হাওয়ায় কিসের গা ?
ছোট্ট টিলার ওপর থেকে মুখের হা
দেখতে পেয়েই যাই পালিয়ে কুলিক কি ?
ঢেউ ছোটে না নাই বা ছুটুক ভুলিক কি ?



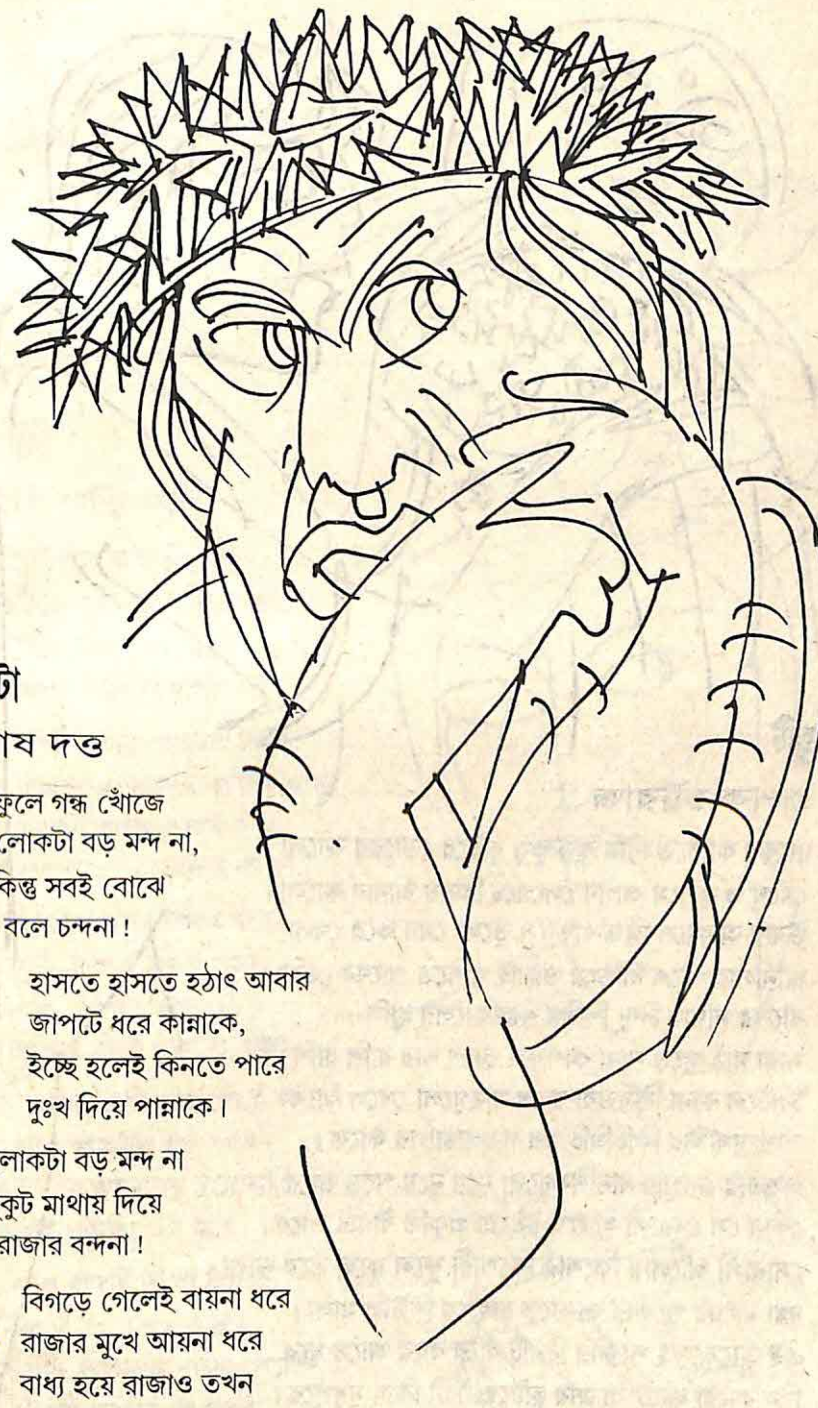
চলার ভাবনা

সুচেতা মিত্র

চলতে চলতে মনের ভিতর দিলাম খুলে চাবি,
চলতে চলতে ভাবি—কেবল ভাবি।
আল-পথে এই মাটির গন্ধ, কাদায় নামে মোষ,
জামা-কাপড় নোংরা হবার নেই মোটে আফশোষ।
বিলের ধারে বক নামছে একটা—দু'টো—তিন,
ওর জামা কি ওমনি সাদা রইবে চিরদিন!
পাহাড় এবং মেঘের মধ্যে কেমন বোঝাপড়া—
ভুল করবার ভয় মোটে নেই, নেই যে নড়াচড়া।
বাউল চলে,—একতারা তার হাতে,
কী সুর লাগে একখানি বাজনাতে?

কী সুখ আছে ওমনি চলায় গান গেয়ে গান গেয়ে?
কী হবে ওর একটা দু'টো পয়সা হাতে পেয়ে?

চলতে চলতে সারাটা পথ ভাবি—কেবল ভাবি,
খুলে দিলাম বন্ধ ঘরের চাবি।
ধান কাটা সব চুকে গেছে, শুকনো আছে মাটি,
একটুখানি খড়ের খোঁচা—কেমন করে হাঁটি?
শূন্য মাঠের বুকের ভেতর কেমন হাহাকার,
কেউ কখনো কান পেতে কি কান্না শোনে তার?
ছোট ছোট পায়ের খুশি উড়িয়ে দিয়ে ধুলো
যায় কি নিয়ে ব্যথার চিহ্নগুলো?
সন্ধ্যে নামে, চারদিক্‌টা থমথমিয়ে থাকে,
তখন কারু পড়বে মনে একলা মাঠের মাকে?



লোকটা

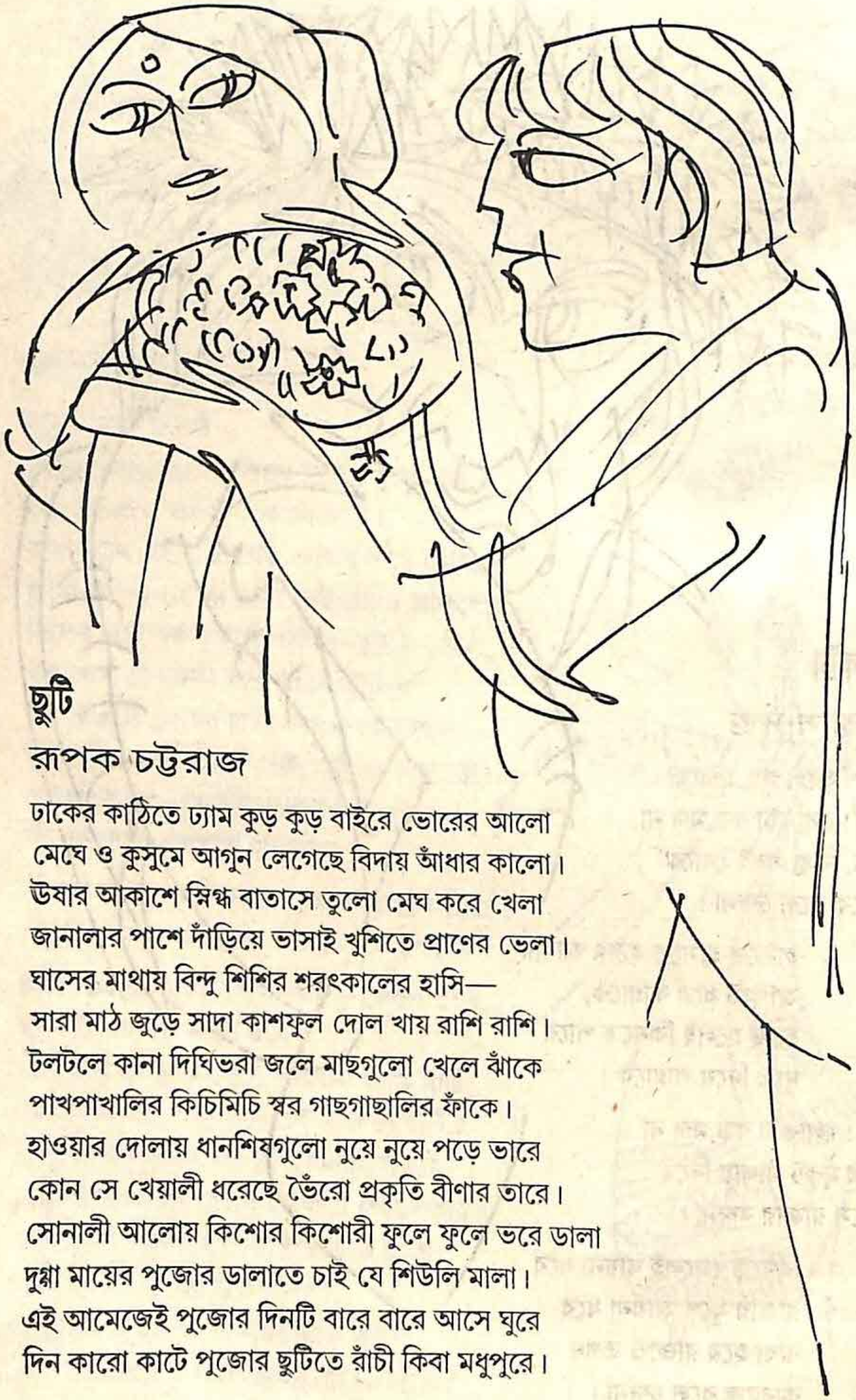
সন্তোষ দত্ত

পলাশ ফুলে গন্ধ খোঁজে
আহা ! লোকটা বড় মন্দ না,
অবুঝ, কিন্তু সবই বোঝে
কাককে বলে চন্দনা !

হাসতে হাসতে হঠাৎ আবার
জাপটে ধরে কান্নাকে,
ইচ্ছে হলেই কিনতে পারে
দুঃখ দিয়ে পান্নাকে।

আহা ! লোকটা বড় মন্দ না
কাঁটার মুকুট মাথায় দিয়ে
গায় সে রাজার বন্দনা !

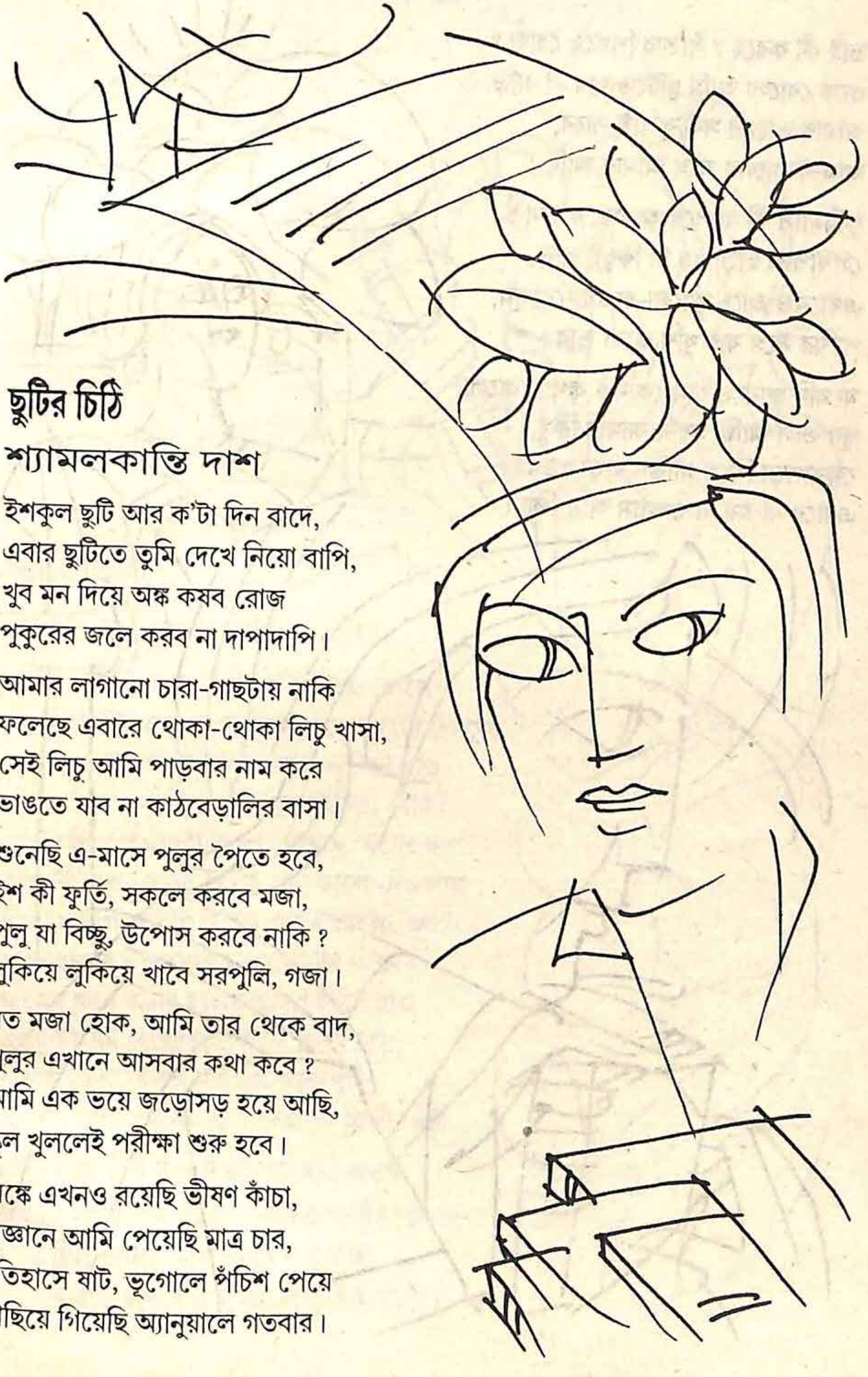
বিগড়ে গেলেই বায়না ধরে
রাজার মুখে আয়না ধরে
বাধ্য হয়ে রাজাও তখন
কাককে বলে চন্দনা।



ছুটি

রূপক চট্টরাজ

ঢাকের কাঠিতে ড্যাম কুড় কুড় বাইরে ভোরের আলো
মেঘে ও কুসুমে আগুন লেগেছে বিদায় আঁধার কালো।
ঊষার আকাশে স্নিগ্ধ বাতাসে তুলো মেঘ করে খেলা
জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভাসাই খুশিতে প্রাণের ভেলা।
ঘাসের মাথায় বিন্দু শিশির শরৎকালের হাসি—
সারা মাঠ জুড়ে সাদা কাশফুল দোল খায় রাশি রাশি।
টলটলে কানা দিঘিভরা জলে মাছগুলো খেলে ঝাঁকে
পাখপাখালির কিচিমিচি স্বর গাছগাছালির ফাঁকে।
হাওয়ার দোলায় ধানশিষগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে ভারে
কোন সে খেয়ালী ধরেছে ভৈঁরো প্রকৃতি বীণার তারে।
সোনালী আলোয় কিশোর কিশোরী ফুলে ফুলে ভরে ডালা
দুগ্গা মায়ের পুজোর ডালাতে চাই যে শিউলি মালা।
এই আমেজেই পুজোর দিনটি বারে বারে আসে ঘুরে
দিন কারো কাটে পুজোর ছুটিতে রাঁচী কিবা মধুপুরে।



ছুটির চিঠি

শ্যামলকান্তি দাশ

ইশকুল ছুটি আর ক'টা দিন বাদে,
এবার ছুটিতে তুমি দেখে নিয়ো বাপি,
খুব মন দিয়ে অঙ্ক কষব রোজ
পুকুরের জলে করব না দাপাদাপি।

আমার লাগানো চারা-গাছটায় নাকি
ফলেছে এবারে থোকা-থোকা লিচু খাসা,
সেই লিচু আমি পাড়বার নাম করে
ভাঙতে যাব না কাঠবেড়ালির বাসা।

শুনেছি এ-মাসে পুলুর পৈতে হবে,
ইশ কী ফুর্তি, সকলে করবে মজা,
পুলু যা বিচ্ছু, উপোস করবে নাকি ?
লুকিয়ে লুকিয়ে খাবে সরপুলি, গজা।

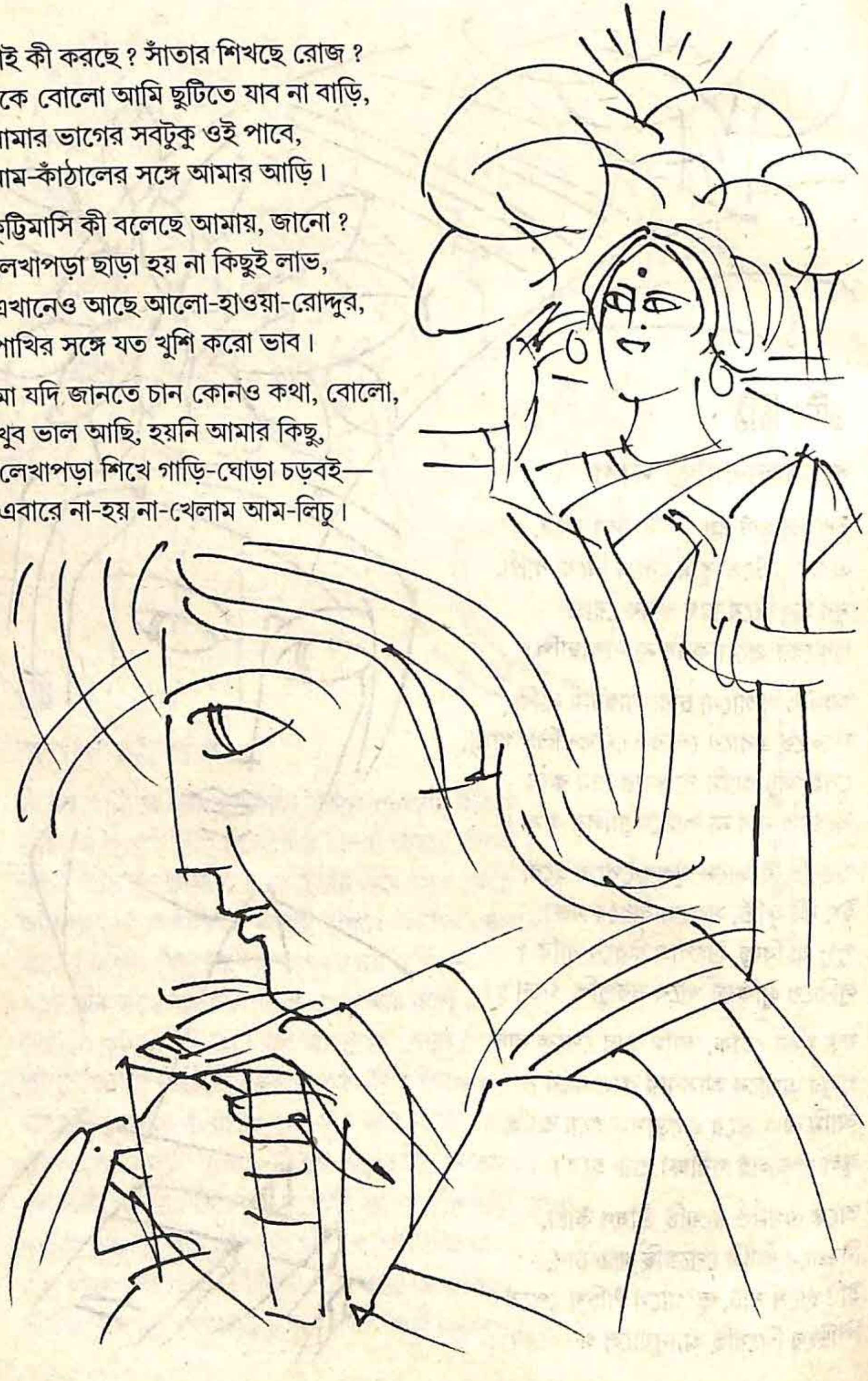
যত মজা হোক, আমি তার থেকে বাদ,
পুলুর এখানে আসবার কথা কবে ?
আমি এক ভয়ে জড়োসড় হয়ে আছি,
স্কুল খুললেই পরীক্ষা শুরু হবে।

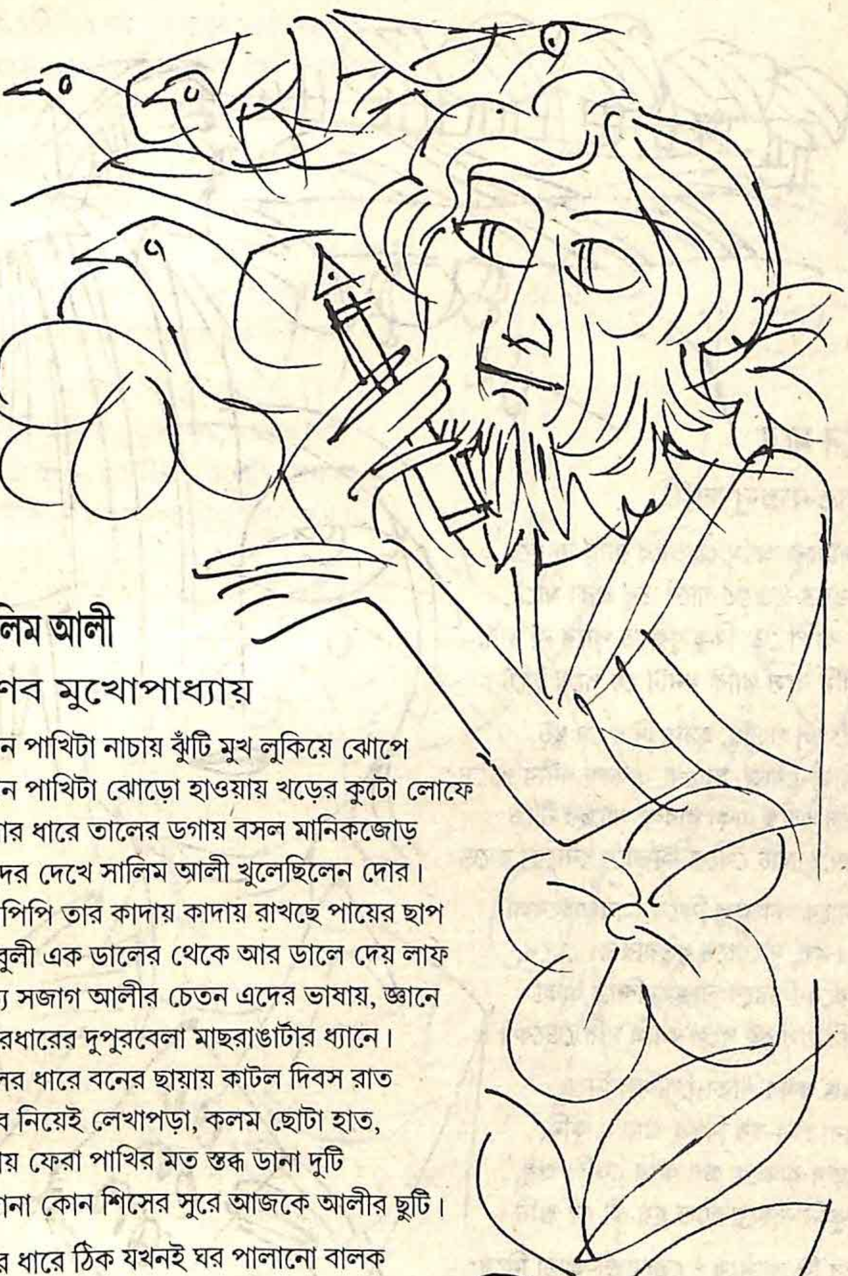
অঙ্কে এখনও রয়েছি ভীষণ কাঁচা,
বিজ্ঞানে আমি পেয়েছি মাত্র চার,
ইতিহাসে ষাট, ভূগোলে পঁচিশ পেয়ে
পিছিয়ে গিয়েছি অ্যানুয়ালে গতবার।

ভাই কী করছে ? সাঁতার শিখছে রোজ ?
ওকে বোলো আমি ছুটিতে যাব না বাড়ি,
আমার ভাগের সবটুকু ওই পাবে,
আম-কাঁঠালের সঙ্গে আমার আড়ি।

কুট্টিমাসি কী বলেছে আমায়, জানো ?
লেখাপড়া ছাড়া হয় না কিছুই লাভ,
এখানেও আছে আলো-হাওয়া-রোদ্দুর,
পাখির সঙ্গে যত খুশি করো ভাব।

মা যদি জানতে চান কোনও কথা, বোলো,
খুব ভাল আছি, হয়নি আমার কিছু,
লেখাপড়া শিখে গাড়ি-ঘোড়া চড়বই—
এবারে না-হয় না-খেলাম আম-লিচু।



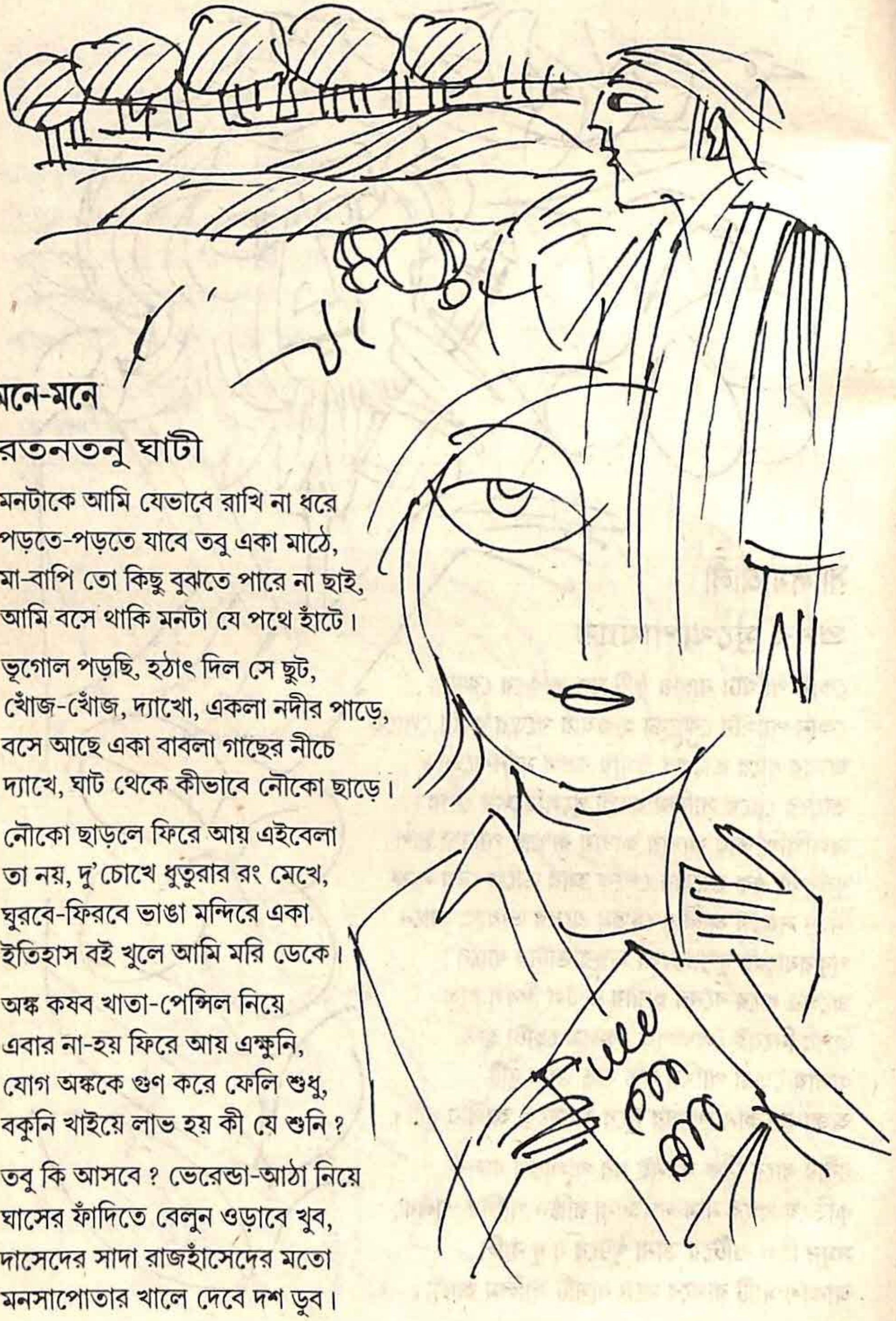


সালিম আলী

প্রণব মুখোপাধ্যায়

কোন পাখিটা নাচায় ঝুঁটি মুখ লুকিয়ে ঝোপে
কোন পাখিটা ঝোড়ো হাওয়ায় খড়ের কুটো লোফে
জলার ধারে তালের ডগায় বসল মানিকজোড়
তাদের দেখে সালিম আলী খুলেছিলেন দোর।
জলপিপি তার কাদায় কাদায় রাখছে পায়ের ছাপ
বুলবুলী এক ডালের থেকে আর ডালে দেয় লাফ
নিত্য সজাগ আলীর চেতন এদের ভাষায়, জ্ঞানে
পুকুরধারের দুপুরবেলা মাছরাঙাটার ধ্যানে।
জলের ধারে বনের ছায়ায় কাটল দিবস রাত
এসব নিয়েই লেখাপড়া, কলম ছোটা হাত,
বাসায় ফেরা পাখির মত স্তব্ধ ডানা দুটি
অজানা কোন শিসের সুরে আজকে আলীর ছুটি।

নদীর ধারে ঠিক যখনই ঘর পালানো বালক
কুড়িয়ে পাবে নাম-না-জানা রঙিন পাখির পালক,
সমুদ্র চিল গুটিয়ে ডানা খুঁটবে ধূ ধূ বালি
আকাশ মাটি রাখবে মনে নামটি সালিম আলী।



মনে-মনে

রতনতনু ঘাটী

মনটাকে আমি যেভাবে রাখি না ধরে
পড়তে-পড়তে যাবে তবু একা মাঠে,
মা-বাপি তো কিছু বুঝতে পারে না ছাই,
আমি বসে থাকি মনটা যে পথে হাঁটে।

ভূগোল পড়ছি, হঠাৎ দিল সে ছুট,
খোঁজ-খোঁজ, দ্যাখো, একলা নদীর পাড়ে,
বসে আছে একা বাবলা গাছের নীচে
দ্যাখে, ঘাট থেকে কীভাবে নৌকো ছাড়ে।

নৌকো ছাড়লে ফিরে আয় এইবেলা
তা নয়, দু'চোখে ধুতুরার রং মেখে,
ঘুরবে-ফিরবে ভাঙা মন্দিরে একা
ইতিহাস বই খুলে আমি মরি ডেকে।

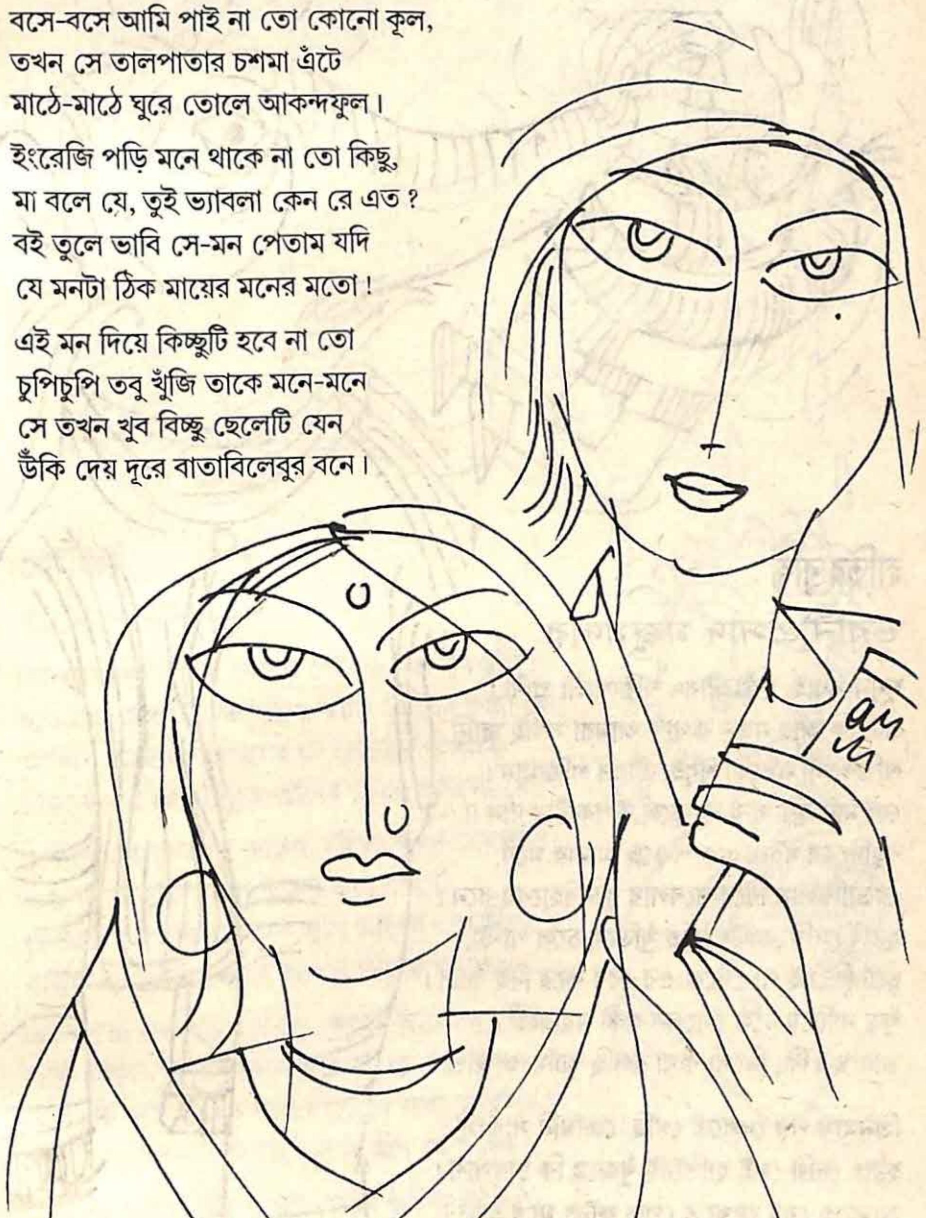
অঙ্ক কষব খাতা-পেন্সিল নিয়ে
এবার না-হয় ফিরে আয় এক্ষুনি,
যোগ অঙ্ককে গুণ করে ফেলি শুধু,
বকুনি খাইয়ে লাভ হয় কী যে শুনি?

তবু কি আসবে? ভেরেন্ডা-আঠা নিয়ে
ঘাসের ফাঁদিতে বেলুন ওড়াবে খুব,
দাসেদের সাদা রাজহাঁসেদের মতো
মনসাপোতার খালে দেবে দশ ডুব।

জ্যামিতির বই ড্রইংয়ের খাতা ধরে
বসে-বসে আমি পাই না তো কোনো কূল,
তখন সে তালপাতার চশমা এঁটে
মাঠে-মাঠে ঘুরে তোলে আকন্দফুল।

ইংরেজি পড়ি মনে থাকে না তো কিছু,
মা বলে যে, তুই ভ্যাবলা কেন রে এত?
বই তুলে ভাবি সে-মন পেতাম যদি
যে মনটা ঠিক মায়ের মনের মতো!

এই মন দিয়ে কিচ্ছুটি হবে না তো
চুপিচুপি তবু খুঁজি তাকে মনে-মনে
সে তখন খুব বিচ্ছু ছেলেটি যেন
উঁকি দেয় দূরে বাতাবিলেবুর বনে।





হাতির বুদ্ধি

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

শুনুন সবাই, হস্তী ভীষণ শক্তিশালী প্রাণী !
এটা কি আর নতুন কথা ? আমরা সবাই জানি
শক্তিশালী নয়কো শুধুই, ভীষণ শক্তিমান !
বেইমান নয়, যায় না ভুলে উপকারীর দান !!
বহুদিনের ঘটনা এক পড়ছে আমার মনে,
বেড়াচ্ছিলাম বিকেলবেলায় কুচবিহারের বনে।
হঠাৎ দেখি একটা হাতি খুঁড়িয়ে চলে পা-টা,
ছুটে গিয়েই পা থেকে ওর বের করে দিই কাঁটা।
শুঁড় নাচিয়ে চলে গেলেন হস্তী মহারাজ।
ভাবছেন কি, মিথ্যে কথা বলছি আমি আজ ?

তিনমাস পর দেখতে গেছি 'জেমিনি সার্কাস'
হঠাৎ দেখি সেই হাতিটাই খুঁজছে কি চারপাশ !
আমাকে যেই দেখতে পেল ফুটল মুখে হাসি।
তারপরে কি করলো হাতি, বলতে পারো মাসি ?
বারো-আনার আসন থেকে আমায় তুলে পিঠে
শুঁড়ে করে বসিয়ে দিলো দশ-টাকার এক সীটে !!



তেপান্তর

প্রমোদ বসু

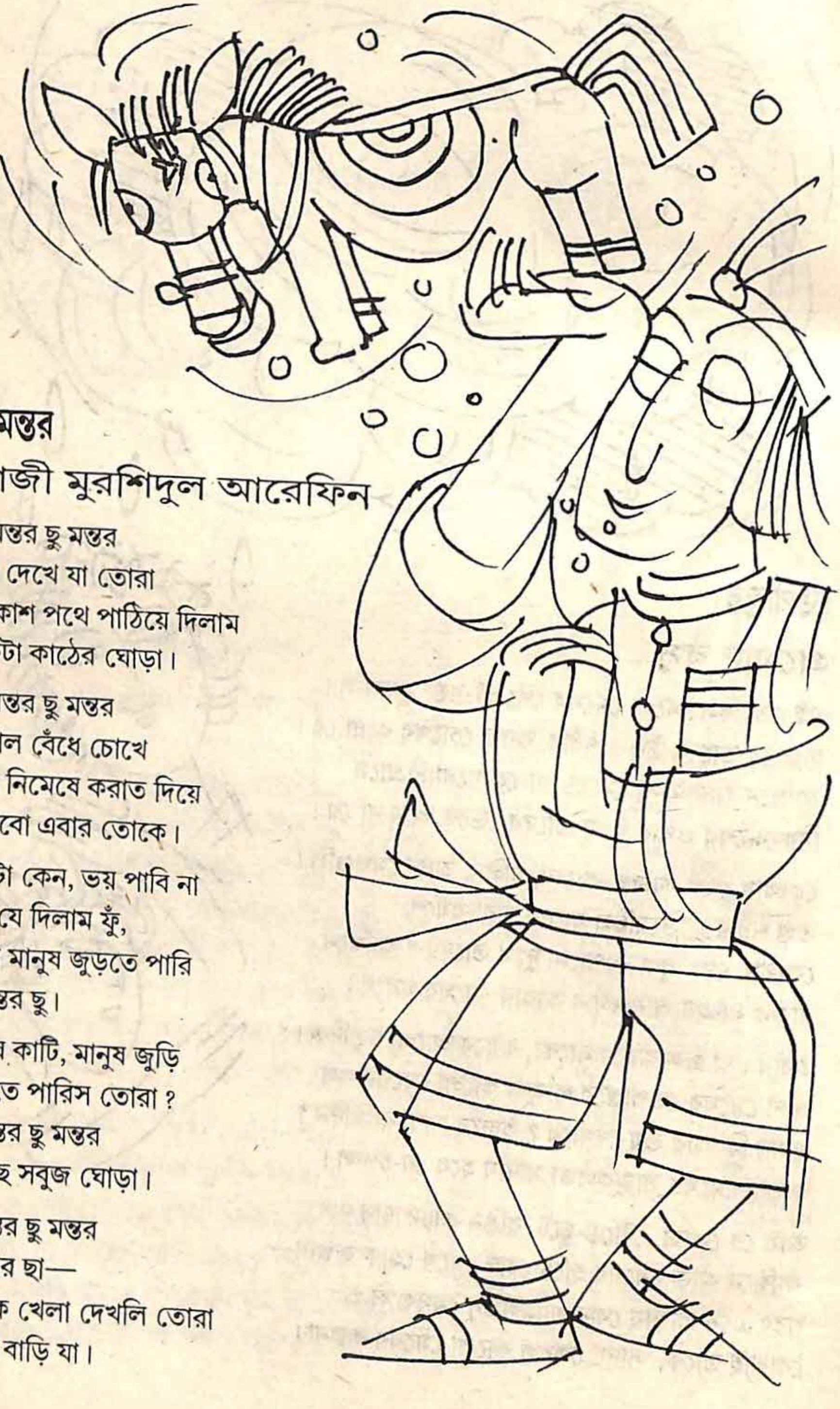


এই তো ছিল কালো মেঘের শেলেট-রঙা মুখগুলি !
হাওয়ায় তাদের উড়ত শরীর, ঝরত চোখের কান্না রে !
আশ্বিনে আজ ফর্সা মেঘের গা-হেলানো বিশ্রামে
নিরুদ্দেশের ওপার খুঁজে তাদের ডেকে আন্ না রে !

কোথায় গেল কাজল-কালো, মলিন, আহা মেঘগুলি !
তপ্ত শরীর জুড়িয়েছিল যাদের ধারা-বর্ষণে,
কোথায় গেল বুক-কাঁপানো দুঃখ তাদের ? আশ্বিনে
বাজুক না-হয় আনন্দগান আবার মেঘের ঘর্ষণে।

এবার তো জল ঝরবে নাকো, ঝরবে আলো চতুর্দিক।
সাদা মেঘের তেপান্তরে লাজুক কালো মেঘের দল
এবার কি আর ভয় দেখাবে ? কাঁদবে সারা রাত্রিদিন ?
কালো মেঘের লাজুকলতা সাদায় হবে যে-চঞ্চল !

আয় রে তোরা, দৌড়ে-ছুটে, রঙিন কচিকাঁচার দল,
আশ্বিনে আজ মেঘের হাটে রোদ মেখে হোক জল্পনা—
শরৎ এসে তাড়ায় কেন শ্যামলতনু মেঘগুলি ?
বোঝাই তাকে, 'সাদা' কেবল কালো মেঘের কল্পনা।



ছু মন্তর

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

ছু মন্তর ছু মন্তর
এই দেখে যা তোরা
আকাশ পথে পাঠিয়ে দিলাম
একটা কাঠের ঘোড়া।

ছু মন্তর ছু মন্তর
রুমাল বেঁধে চোখে
এক নিমেষে করাত দিয়ে
কাটবো এবার তোকে।

ভয়টা কেন, ভয় পাবি না
এই যে দিলাম ফুঁ,
কাটা মানুষ জুড়তে পারি
ছু মন্তর ছু।

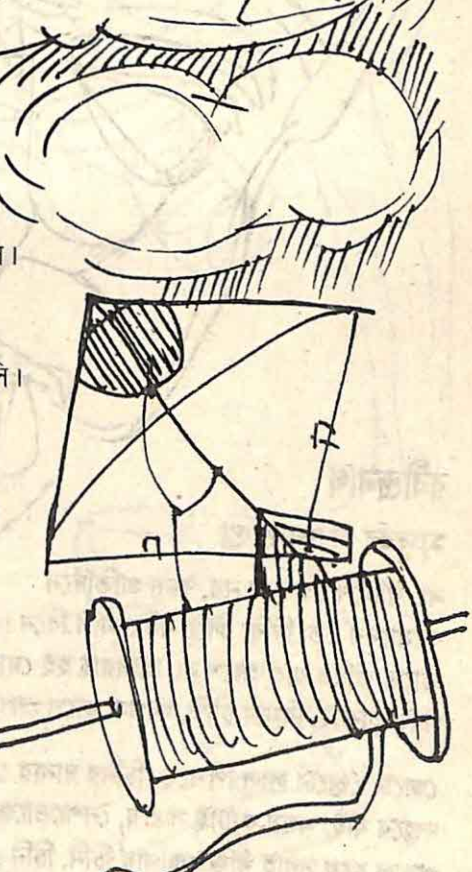
মানুষ কাটি, মানুষ জুড়ি
কাটতে পারিস তোরা?
ছু মন্তর ছু মন্তর
উড়ছে সবুজ ঘোড়া।

ছু মন্তর ছু মন্তর
ছু মন্তর ছা—
অনেক খেলা দেখলি তোরা
এবার বাড়ি যা।



তুমি যখন

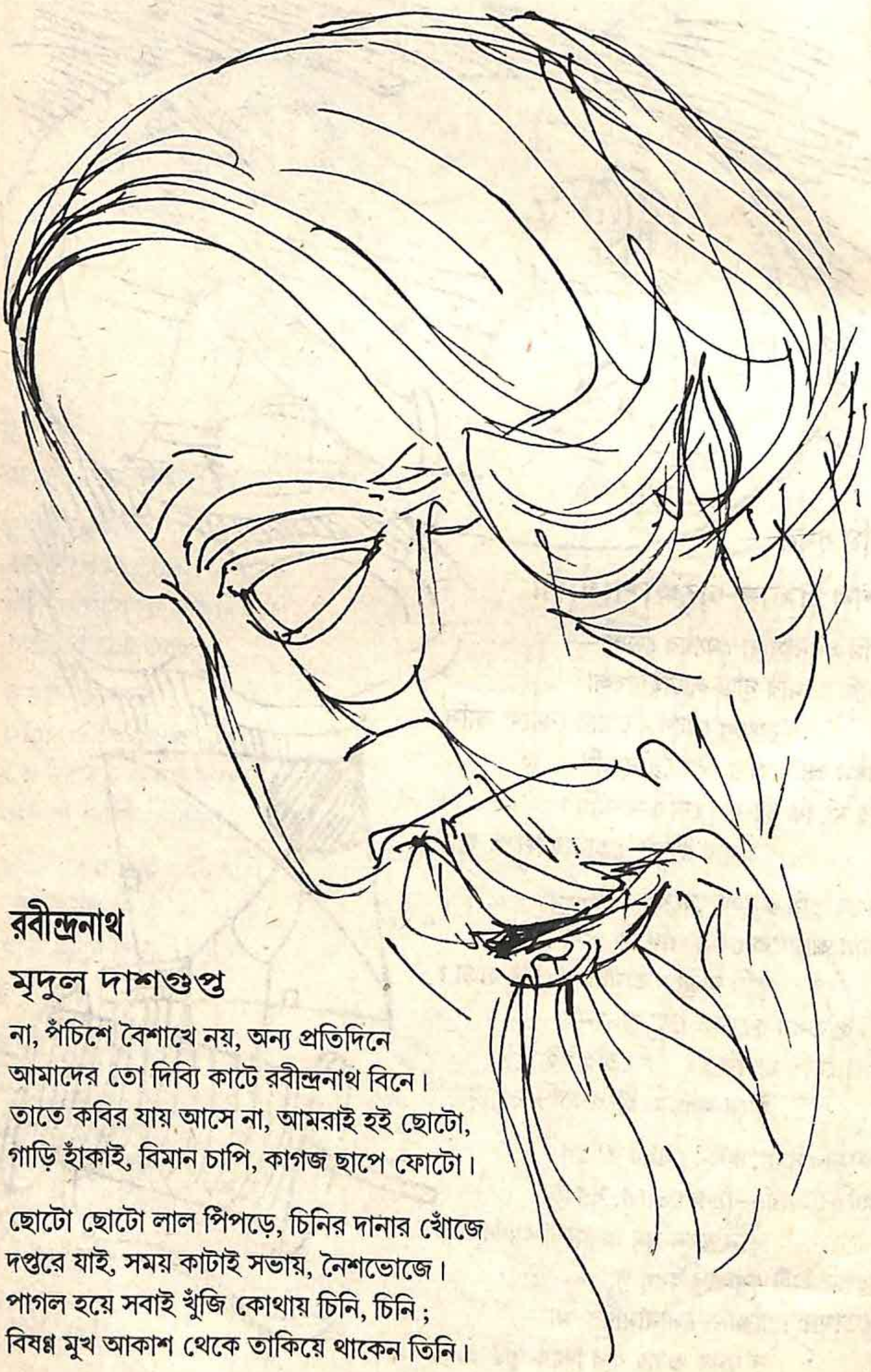
শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়



তুমি যখন সাদা মেঘের ভেলা—
আমি আমার ঘুড়ি-লাটাই খেলা
ফেলে রেখে তোমার কোলে ভাসি।
তখন আমি আর তো সোনামণি
হই না, কি হই বল্ দেখি মা-মণি?
তোমার রুপো, তোমার রুপো-হাসি।

যখন তুমি কালো মেঘের ঢেউ—
আর আমাকে কেউ পায় কি কেউ
তুমি ছাড়া, তোমার ও ঢেউ ছাড়া?
কিন্তু তখন রুপোও তো আর নই—
বল্ দেখি মা, কি হই, কি তোর হই?
হীরে-মাণিক, হীরে-মাণিক-পারা।

কখন সোনা, কখন সোনা তা'লে?
রাত্তিরে নয়—ঠিক ভোরে, সকালে
তুমি যখন ঘুম জড়ানো আকাশ,
তখন খাঁটি সোনার বরণ গা
তোমার খোকা—সোনামণির, মা
দু'চোখ ভ'রে যার দিকে তুই তাকাস!



রবীন্দ্রনাথ

মৃদুল দাশগুপ্ত

না, পঁচিশে বৈশাখে নয়, অন্য প্রতিদিনে
আমাদের তো দিব্যি কাটে রবীন্দ্রনাথ বিনে।
তাতে কবির যায় আসে না, আমরাই হই ছোটো,
গাড়ি হাঁকাই, বিমান চাপি, কাগজ ছাপে ফোটো।

ছোটো ছোটো লাল পিঁপড়ে, চিনির দানার খোঁজে
দপ্তরে যাই, সময় কাটাই সভায়, নৈশভোজে।
পাগল হয়ে সবাই খুঁজি কোথায় চিনি, চিনি ;
বিষণ্ণ মুখ আকাশ থেকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।



ঘরের পাশে লঙ্কাজবা

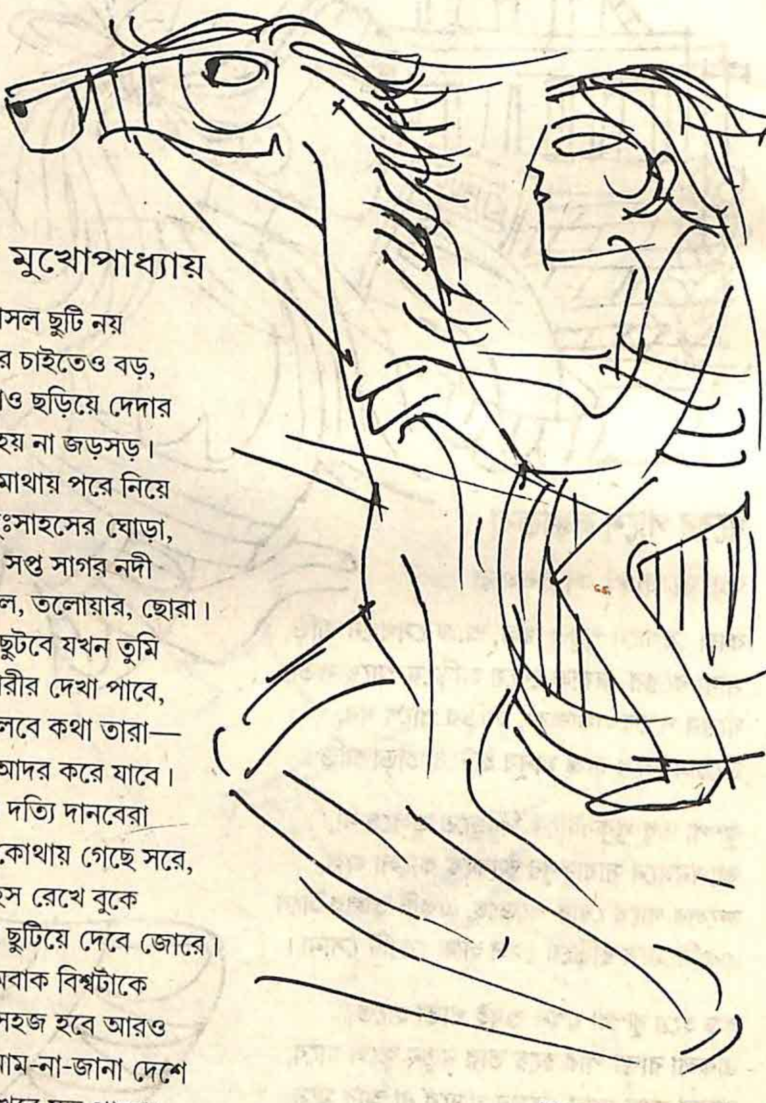
অভিরূপ সরকার

কাল যেখানে পুকুর ছিল, আজ সেখানে বাড়ি,
সাদা রঙের দেয়াল বেয়ে জড়িয়ে আছে লতা।
ঘরের পাশে লঙ্কাজবা, সিঁড়ির পাশে ঘর,
উঠোন দিয়ে ব্যস্ত মানুষ হাঁটছে তাড়াতাড়ি।

ঝুম্পা তবু পুকুরটাকে কিচ্ছুতে ভুলছে না,
আপনমনে সারাদুপুর আঁকছে কালো জল,
জলের গায়ে রোদ পড়েছে, একটি তুলির টানে
একনিমেষে ছড়িয়ে গেল লক্ষ-কোটি সোনা।

বড় হয়ে ঝুম্পা যখন শুধুই খাতা হাতে
একলা রাস্তা পার হয়ে তার নতুন স্কুলে যাবে,
দাদার কথা যখন তেমন পড়বে না আর মনে,
তখন কোনো দুপুর কিংবা নিদ্রাবিহীন রাতে

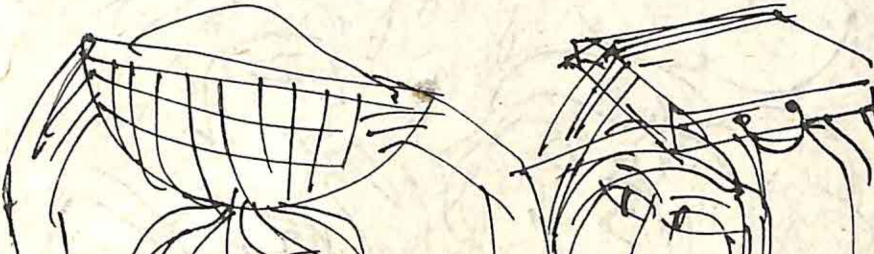
এই বাড়িটা পড়বে মনে। হয়নি কোনো ক্ষতি
দাঁড়িয়ে আছে যেমন ছিল বারো বছর আগে।
লঙ্কাজবা ? তাও আজও এই ঘরের পাশে আছে।
দোরগোড়াতে জ্বলছে ধুধু হলুদ গজমোতি।



আসল ছুটি

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

পড়ার ছুটি আসল ছুটি নয়
মনের ছুটি তার চাইতেও বড়,
উধাও করে দাও ছড়িয়ে দেদার
মোটেই যেন হয় না জড়সড়।
মেঘের মুকুট মাথায় পরে নিয়ে
ছুটিয়ে দিয়ে দুঃসাহসের ঘোড়া,
পেরিয়ে যাবে সপ্ত সাগর নদী
সঙ্গে নেবে ঢাল, তলোয়ার, ছোরা।
আকাশ চিরে ছুটবে যখন তুমি
গল্পে-শোনা পরীর দেখা পাবে,
রাত্রি হলেই বলবে কথা তারা—
দূরের হাওয়া আদর করে যাবে।
ভয় পেয়ে সব দত্যি দানবেরা
দেখবে হঠাৎ কোথায় গেছে সরে,
শক্তি এবং সাহস রেখে বুকে
ঘোড়া তোমার ছুটিয়ে দেবে জোরে।
এমনি করেই অবাক বিশ্বটাকে
দেখবে যতই, সহজ হবে আরও
ঘুরবে অনেক নাম-না-জানা দেশে
নানান ভাষা শিখবে যত পারো।
পুঁথির পড়া থাক না ক'দিন তোলা
ঘরের বাঁধন দাও না কেটে ছুট,
বেরিয়ে পড়ো যেখানে মন চায়।
বিশ্বটাকে নাও না করে লুট ॥





অরুণ-বরুণ-কিরণমালা

অপূর্বকুমার কুণ্ডু

রূপকাহিনীর দরজাতে আজ কে লাগালো তালা ;
নামলো পথে অরুণ-বরুণ এবং কিরণমালা।
ভুলেই গেছে সোনার-প্রাসাদ, পথের ধুলোয় থাকে ;
তিন ভাইবোন পথটা খোঁজে পথের বাঁকে-বাঁকে।

এখন আমার অরুণ-বরুণ এবং কিরণমালা—
ঘুরছে পথে, পেটে তাদের দারুণ ক্ষিদের জ্বালা।
মোট বইছে অরুণ-বরুণ ইষ্টিশানের কাছে ;
কিরণমালা পথের ধারে কয়লা শুধু বাছে।

আয়রে আমার অরুণ-বরুণ আয়রে কিরণমালা—
দে ভুলিয়ে এখন তোদের রূপকাহিনীর পালা।
সামনে ছুটে যারে তোরা নতুন পথের টানে,
সবার প্রাণে লাগুক জোয়ার তোদের গানে গানে।



চল্‌ রে টুকুন

সুদেব বক্‌সী

মেঘের পেয়ালা ফুটো হয়ে ঝরে জল
আলোর পিরিচ চুঁইয়ে পড়ছে রোদ—
চল্‌ রে টুকুন, বাইরে খেলবি চল্‌,
রোজই গেম্‌ দিস, আমি আজ দেবো শোধ।

খেলা কিছু নয়, পরের সঙ্গে খেলা
খেলা কিছু নয়, ঘরের সঙ্গে আড়ি
খেলা কিছু নয়, ফিরে পাবো ছেলেবেলা,
টুকুন রে তোর ছুঁয়ে দেবো পাততাড়ি।

বাইরে এখন বাতাস দিচ্ছে ফুঁ,
বাইরে এখন নতুন জলের মেলা ;
বাইরে এখন রোদ্দুরে মজা—ছুঃ—
চল্‌ রে টুকুন এলেবেলে করি খেলা।



ভোরের দিকে
বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়
ভোরের স্মৃতি ছবি হয়ে আটকে আছে মায়ায়।

সামনে সটান মাঠে
চোখ মাড়িয়ে রামু কাকা এবং কারা হাঁটে?

হঠাৎ আশে পাশে
দোল দিয়ে যায় দীঘিগুলো শাপলা শালুক হাসে।

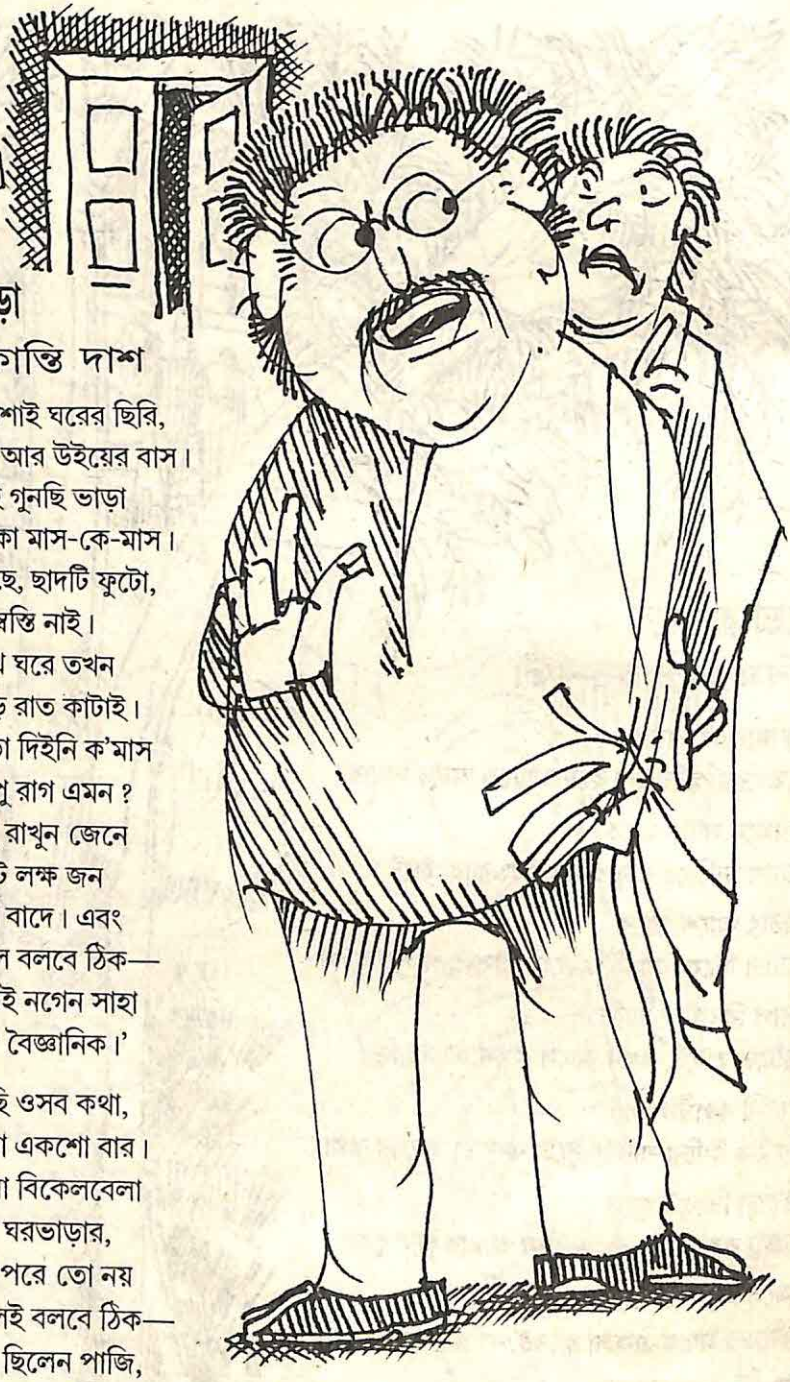
সাপ কিলবিল গাড়ি
ছুটতে ছুটতে কখন আসে কখন ছাড়াছাড়ি।

সাক্ষী কলমীলতা
কিচির মিচির শালিখ দুটো বলতো প্রাণের কথা।

দরজা দিতেই খুলে
ছোট্ট বকুল ফুল গুঁজে দেয় আমার চুলে চুলে।

অনেক কথাই ভাবি
ভীড়ের মাঝে একলা হলেই পাচ্ছি ভোরের চাবি।

খিড়কি দিয়ে গলে
যাচ্ছি ভেসে ছায়ায় ছায়ায় ভোরের দিকেই চলে।

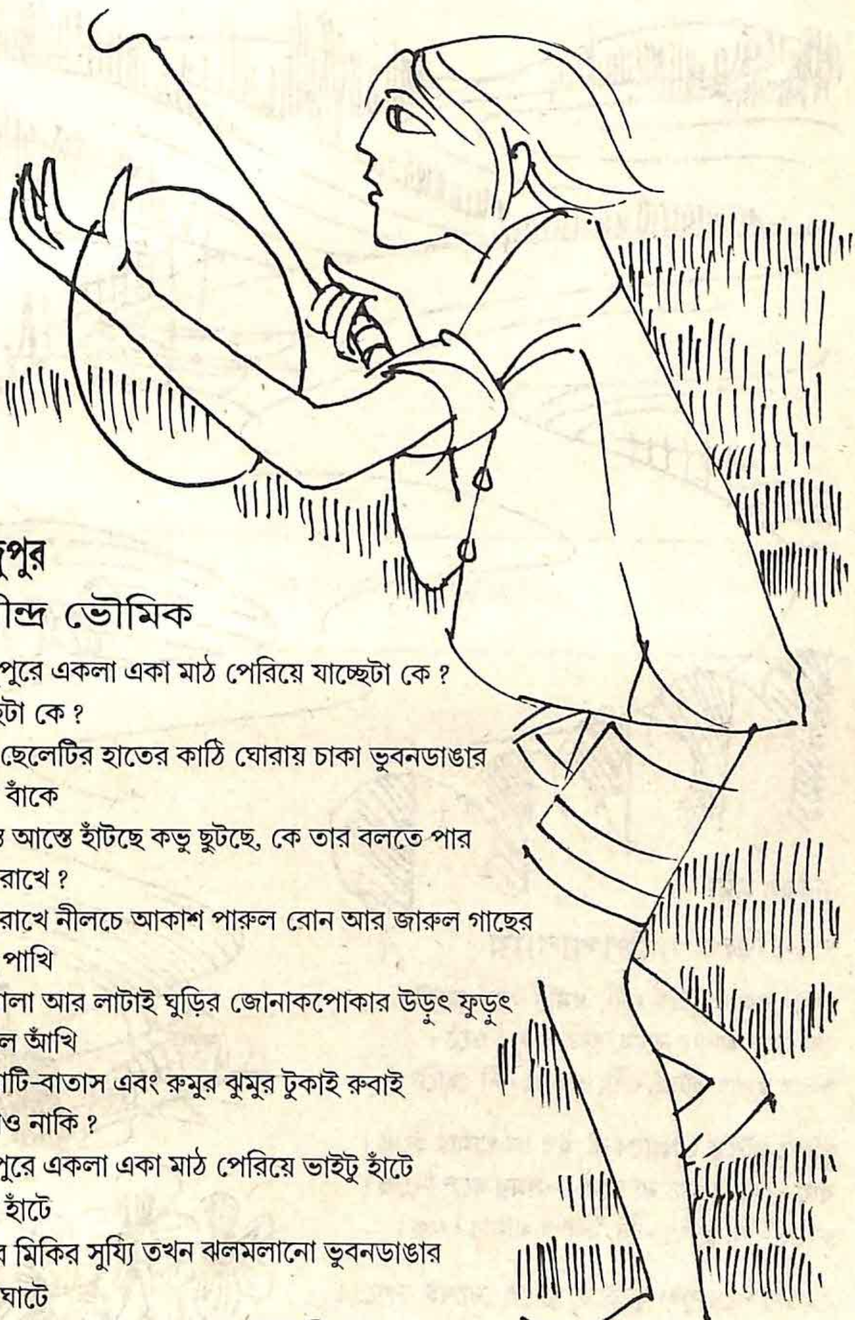


ভাড়া-তাড়া

মৃণালকান্তি দাশ

‘এই তো মশাই ঘরের ছিরি,
আরশোলা আর উইয়ের বাস।
এর জন্যেই গুনছি ভাড়া
একশো টাকা মাস-কে-মাস।
আরও আছে, ছাদটি ফুটো,
বর্ষাকালে স্বস্তি নাই।
জল থৈ থৈ ঘরে তখন
পানসি চড়ে রাত কাটাই।
না হয় ভাড়া দিইনি ক'মাস
তাতেই বাপু রাগ এমন ?
কিন্তু মশাই রাখুন জেনে
আসবে ছুটে লক্ষ জন
পঁচিশ বছর বাদে। এবং
আঙুল তুলে বলবে ঠিক—
এই ঘরেতেই নগেন সাহা
ছিলেন মস্ত বৈজ্ঞানিক।’

‘ঢের শুনেছি ওসব কথা,
কম করে তা একশো বার।
আজ যদি না বিকেলবেলা
ব্যবস্থা নেন ঘরভাড়ার,
পঁচিশ বছর পরে তো নয়
কাল সকালেই বলবে ঠিক—
এই ঘরেতে ছিলেন পাজি,
ভণ্ড সে এক বৈজ্ঞানিক।’



ভরদুপুর

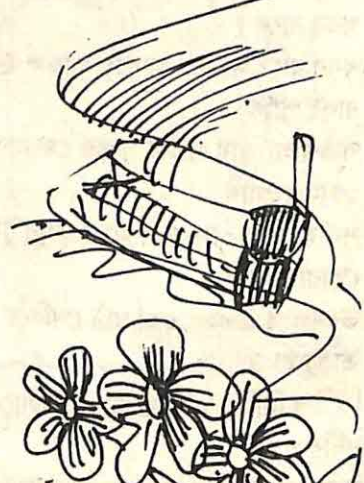
শমীন্দ্র ভৌমিক

ভরদুপুরে একলা একা মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছেটা কে ?
যাচ্ছেটা কে ?
সেই ছেলেটির হাতের কাঠি ঘোরায় চাকা ভুবনডাঙার
নদীর বাঁকে
আস্তে আস্তে হাঁটছে কভু ছুটছে, কে তার বলতে পার
খবর রাখে ?
খবর রাখে নীলচে আকাশ পারুল বোন আর জারুল গাছের
বাবুই পাখি
পাঠশালা আর লাটাই ঘুড়ির জোনাকপোকার উড়ুৎ ফুড়ুৎ
কোমল আঁখি
সূর্য-মাটি-বাতাস এবং রুমুর ঝুমুর টুকাই রুবাই
তোরাও নাকি ?
ভরদুপুরে একলা একা মাঠ পেরিয়ে ভাইটু হাঁটে
ভাইটু হাঁটে
ঝিকির মিকির সুয্যি তখন ঝলমলানো ভুবনডাঙার
নদীর ঘাটে
সন্ধে হতেই শুকতারকা খেলবে টুকি নীল আকাশের
মেঘের মাঠে।



একলা নদী

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

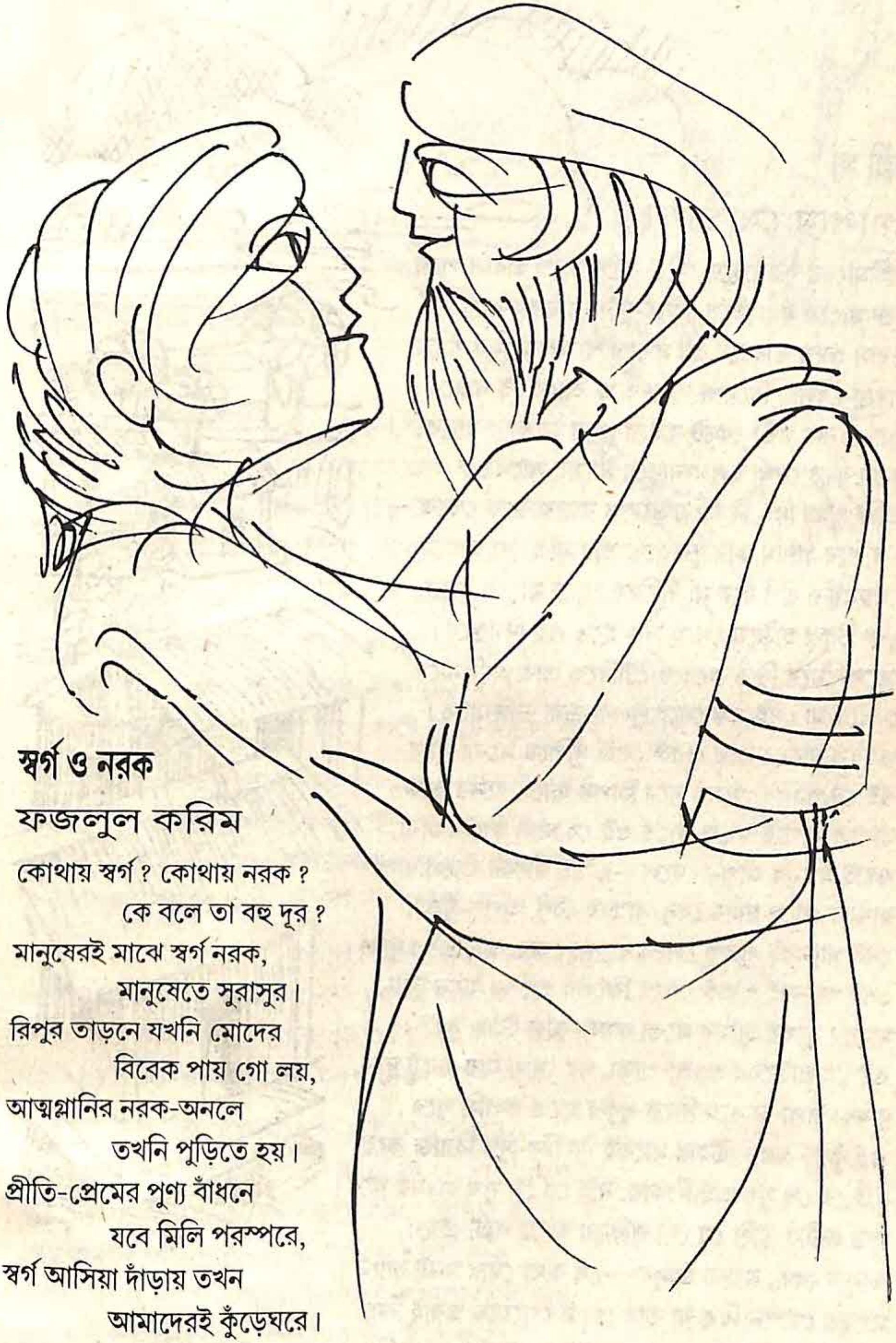


ছলাৎ ছলাৎ ছুটছে নদী, এমনি করে ছোটে।
সূর্য ওঠে আঁধার নামে, আবার সূর্য ওঠে।
ছলাৎ ছলাৎ ছুটছে নদী, একলা নদী ছোটে।

ছুটতে ছুটতে ভাল্লাগে না, হয় যে থামার ইচ্ছে।
যায় না থামা যায় না থামা—সময় বলে দিচ্ছে।
ছুটছে নদী, ছুটছে নদী, উধাও থামার ইচ্ছে।

ছোটার পথে ফুল ফুটেছে, ছুটতে দেখেই ফোটে।
ছলাৎ ছলাৎ ছুটছে নদী, কলকলিয়ে ছোটে।
নদীর মুখে হাসির ঝিলিক, ফুলের মতো ফোটে।

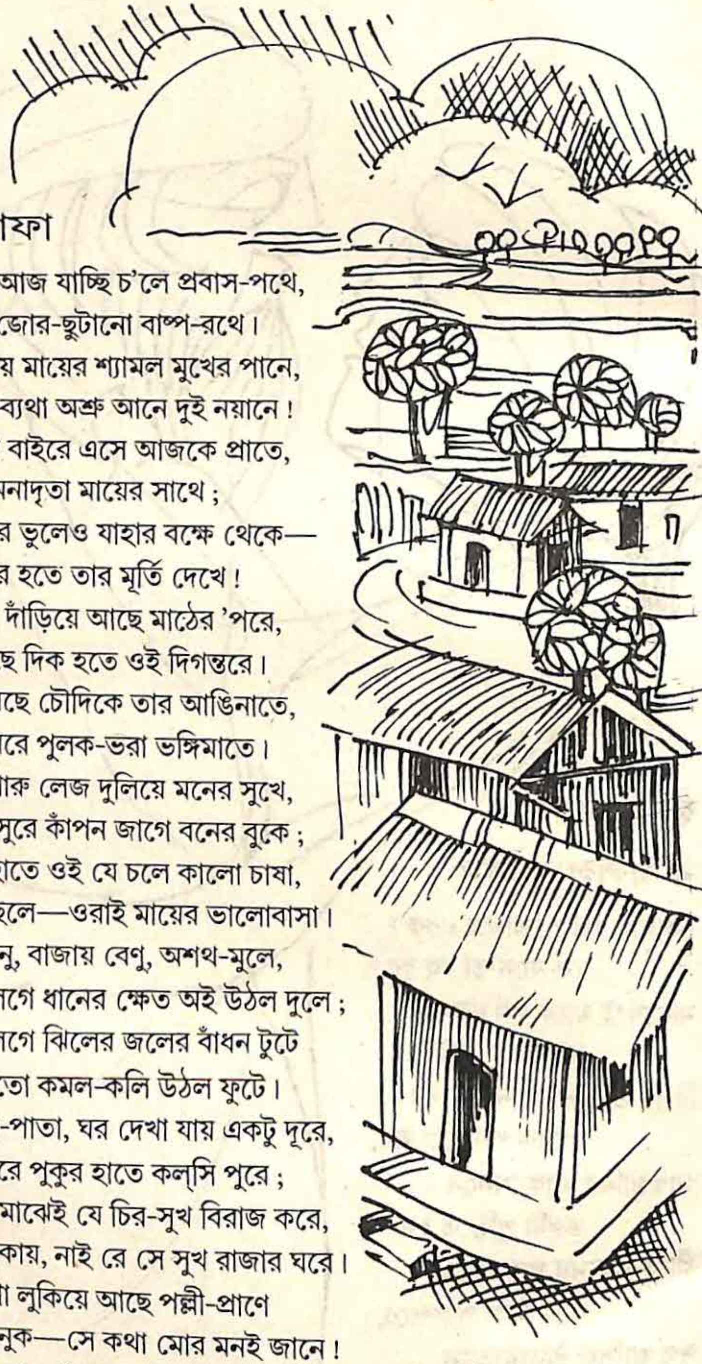
বাংলাদেশ



স্বর্গ ও নরক

ফজলুল করিম

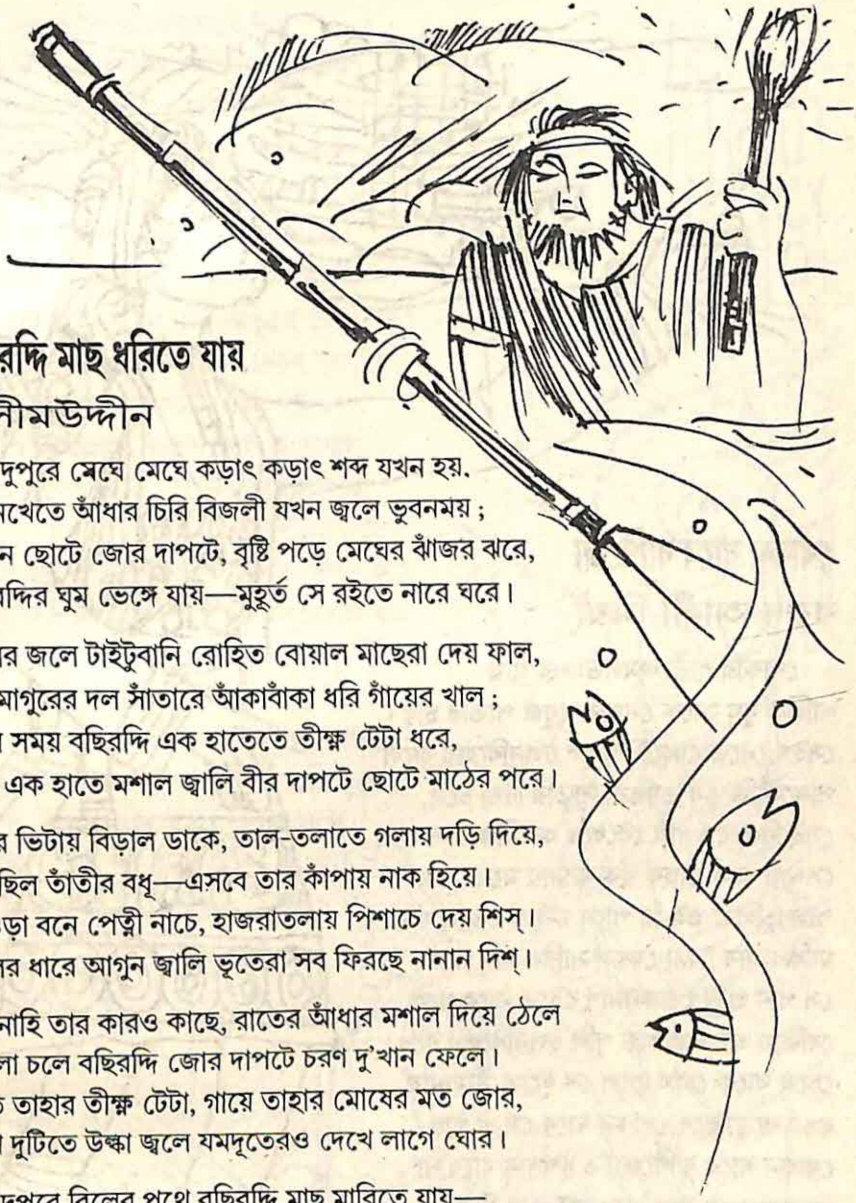
কোথায় স্বর্গ ? কোথায় নরক ?
কে বলে তা বহু দূর ?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক,
মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের
বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে
তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি-প্রেমের পুণ্য বাঁধনে
যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
আমাদেরই কুঁড়েঘরে।



পল্লী মা

গোলাম মোস্তাফা

পল্লীমায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চ'লে প্রবাস-পথে,
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়-বেলায় বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে!
চির-চেনার গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে,
নূতন করে দেখা হল অনাদৃতা মায়ের সাথে;
ভক্তি পূজা দিই নি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে—
নম্রশিরে প্রণাম করি দূর হতে তার মূর্তি দেখে!
স্নেহময়ীর রূপ ধরে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক হতে ওই দিগন্তরে।
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙিনাতে,
দেখছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।
ওই যে মাঠে চলছে গোরু লেজ দুলিয়ে মনের সুখে,
ওই যে পাখির গানের সুরে কাঁপন জাগে বনের বুকে;
মাখাল-মাথায় কাস্তে-হাতে ওই যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালোবাসা।
রাখাল-ছেলে চরায় ধেনু, বাজায় বেণু, অশথ-মূলে,
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত অই উঠল দুলে;
সেই গানেরই পুলক লেগে ঝিলের জলের বাঁধন টুটে
মায়ের মুখের হাসির মতো কমল-কলি উঠল ফুটে।
ওই যে লাউয়ের জংলা-পাতা, ঘর দেখা যায় একটু দূরে,
কৃষক-বালা আসছে ফিরে পুকুর হাতে কল্‌সি পুরে;
ওই কুঁড়ে-ঘর—উহার মাঝেই যে চির-সুখ বিরাজ করে,
নাই রে সে সুখ অট্টালিকায়, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে।
কত গভীর তৃপ্তি যে গো লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে
জানুক কেহ, নাইবা জানুক—সে কথা মোর মনই জানে!
মায়ের গোপন বিত্ত যা তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মতো তাই ওরা আর ছুটছে নাকো মোহের পিছু।



বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়

জসীমউদ্দীন

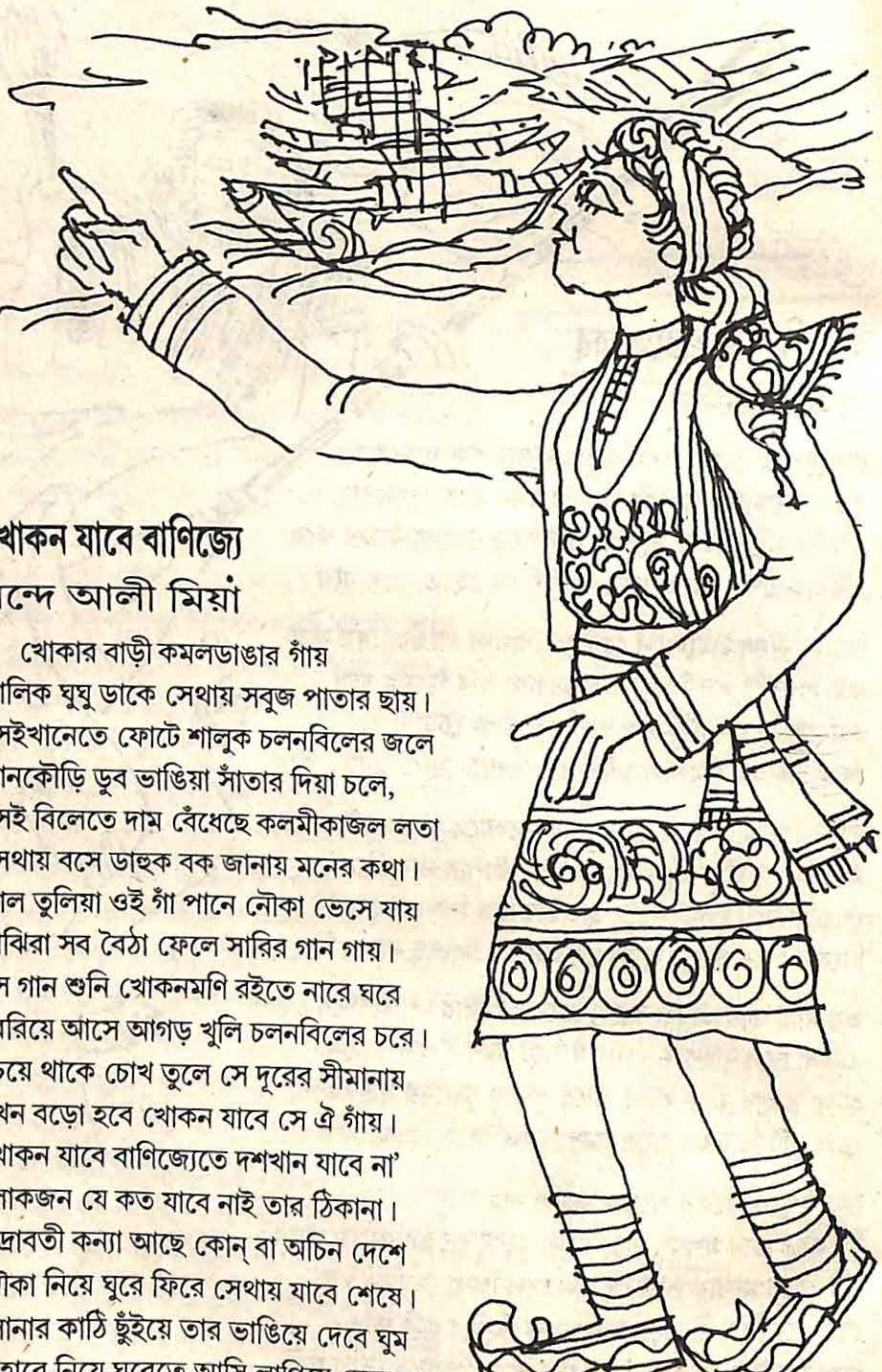
রাত দুপুরে মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ যখন হয়,
দুই নখেতে আঁধার চিরি বিজলী যখন জ্বলে ভুবনময় ;
তুফান ছোটে জোর দাপটে, বৃষ্টি পড়ে মেঘের ঝাঁজর ঝরে,
বছিরদ্দির ঘুম ভেঙ্গে যায়—মুহূর্ত সে রইতে নারে ঘরে।

বিলের জলে টাইটুবানি রোহিত বোয়াল মাছেরা দেয় ফাল,
কই মাগুরের দল সাঁতারে আঁকাবাঁকা ধরি গাঁয়ের খাল ;
এমন সময় বছিরদ্দি এক হাতেতে তীক্ষ্ণ টেঁটা ধরে,
আর এক হাতে মশাল জ্বালি বীর দাপটে ছোটে মাঠের পরে।

বুড়ীর ভিটায় বিড়াল ডাকে, তাল-তলাতে গলায় দড়ি দিয়ে,
মরেছিল তাঁতীর বধূ—এসবে তার কাঁপায় নাক হিয়ে।
শেওড়া বনে পেত্নী নাচে, হাজরাতলায় পিশাচে দেয় শিস্।
বিলের ধারে আগুন জ্বালি ভূতেরা সব ফিরছে নানান দিশ্।

ভয় নাহি তার কারও কাছে, রাতের আঁধার মশাল দিয়ে ঠেলে
একলা চলে বছিরদ্দি জোর দাপটে চরণ দু'খান ফেলে।
হাতে তাহার তীক্ষ্ণ টেঁটা, গায়ে তাহার মোষের মত জোর,
চোখ দুটিতে উল্কা জ্বলে যমদূতেরও দেখে লাগে ঘোর।

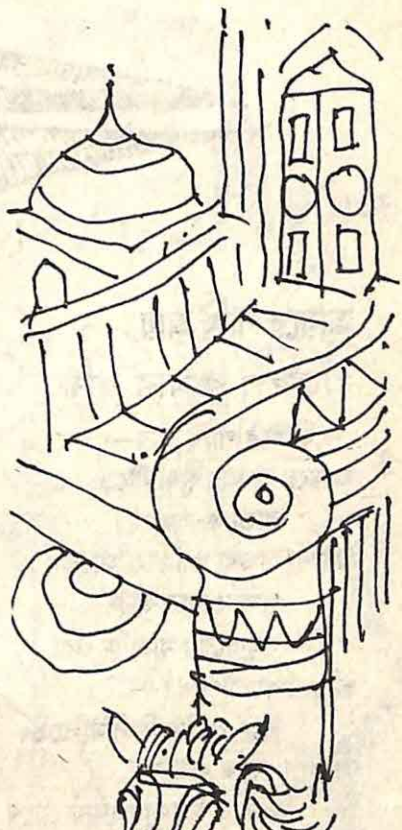
রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ মারিতে যায়—
দূর হতে তার মশাল জ্বলে ধকো ধকো রাতের কালো ছায়।
বৃষ্টি-শীলা মাথায় পড়ে, তুফান চলে ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত,
রয়ে রয়ে বিজলী জ্বলে ইন্দ্র ডাকে আঁধার করি ক্ষত ;
শ্মশান-ঘাটায় পেত্নী নাচে, বটের শাখে পিশাচে দোল খায়,
রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়।



খোকন যাবে বাণিজ্যে

বন্দে আলী মিয়াঁ

খোকার বাড়ী কমলডাঙার গাঁয়
শালিক ঘুঘু ডাকে সেথায় সবুজ পাতার ছায়।
সেইখানেতে ফোটে শালুক চলনবিলের জলে
পানকৌড়ি ডুব ভাঙিয়া সাঁতার দিয়া চলে,
সেই বিলেতে দাম বেঁধেছে কলমীকাজল লতা
সেথায় বসে ডাহুক বক জানায় মনের কথা।
পাল তুলিয়া ওই গাঁ পানে নৌকা ভেসে যায়
মাঝিরা সব বৈঠা ফেলে সারির গান গায়।
সে গান শুনি খোকনমণি রইতে নারে ঘরে
বেরিয়ে আসে আগড় খুলি চলনবিলের চরে।
চেয়ে থাকে চোখ তুলে সে দূরের সীমানায়
যখন বড়ো হবে খোকন যাবে সে ঐ গাঁয়।
খোকন যাবে বাণিজ্যেতে দশখান যাবে না'
লোকজন যে কত যাবে নাই তার ঠিকানা।
নিদ্রাবতী কন্যা আছে কোন্ বা অচিন দেশে
নৌকা নিয়ে ঘুরে ফিরে সেথায় যাবে শেষে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তার ভাঙিয়ে দেবে ঘুম
তাহারে নিয়ে ঘরেতে আসি লাগিয়ে দেবে ধুম।



খোকন থাকে কমলডাঙার গাঁয়
ফুলের বনে প্রজাপতির সাথে সে বেড়ায়।
তালিপাতার আবডালেতে চাঁদ যে ওঠে রাতে
বাঁশের বনের দীঘল ছায়া পড়ে আঙিনাতে।
জোনাকিরা হীরার মতো জ্বলে কেবল জ্বলে
ঘুমপরীরা দল বাঁধিয়া নাচে গাছের তলে।
খোকার গায়ে কাতুকুতু দেয় যে স্বপনবুড়ী
ঘুমের ঘোরে হাসে সে তাই আঙুলে দেয় তুড়ি।
পক্ষীরাজে চড়ে খোকন মায়ার দেশে যায়
পিছন হতে দত্যিদানা ধরতে পিছু ধায়।
বীর সিপাহী খোকন দাঁড়ায় খুলে তরোয়াল
বাঁ হাতে তার ঝল্‌কে ওঠে মকরমুখী ঢাল।
সড়কি হাতে বাগিয়ে ধরে খোকন যায় তেড়ে
পালিয়ে বাঁচে দৈত্যরা সব—পালায় দেশ ছেড়ে।
ঘোড়ায় চড়ে হাওয়ার বেগে এগিয়ে আরো যায়
সোনার গাছে মাণিক ফলে দেখতে সে দেশ পায়।
হীরার ফল জ্বলে সেথায় মুক্তা পাহাড় ঘিরে
কোঁচড় ভরে নিয়ে খোকা আসবে দেশে ফিরে।
মা দেখে খুব হবেন খুশি—চুমো খাবেন মুখে
গর্ব ভরে খোকন বসে হাস্‌বে মনের সুখে।



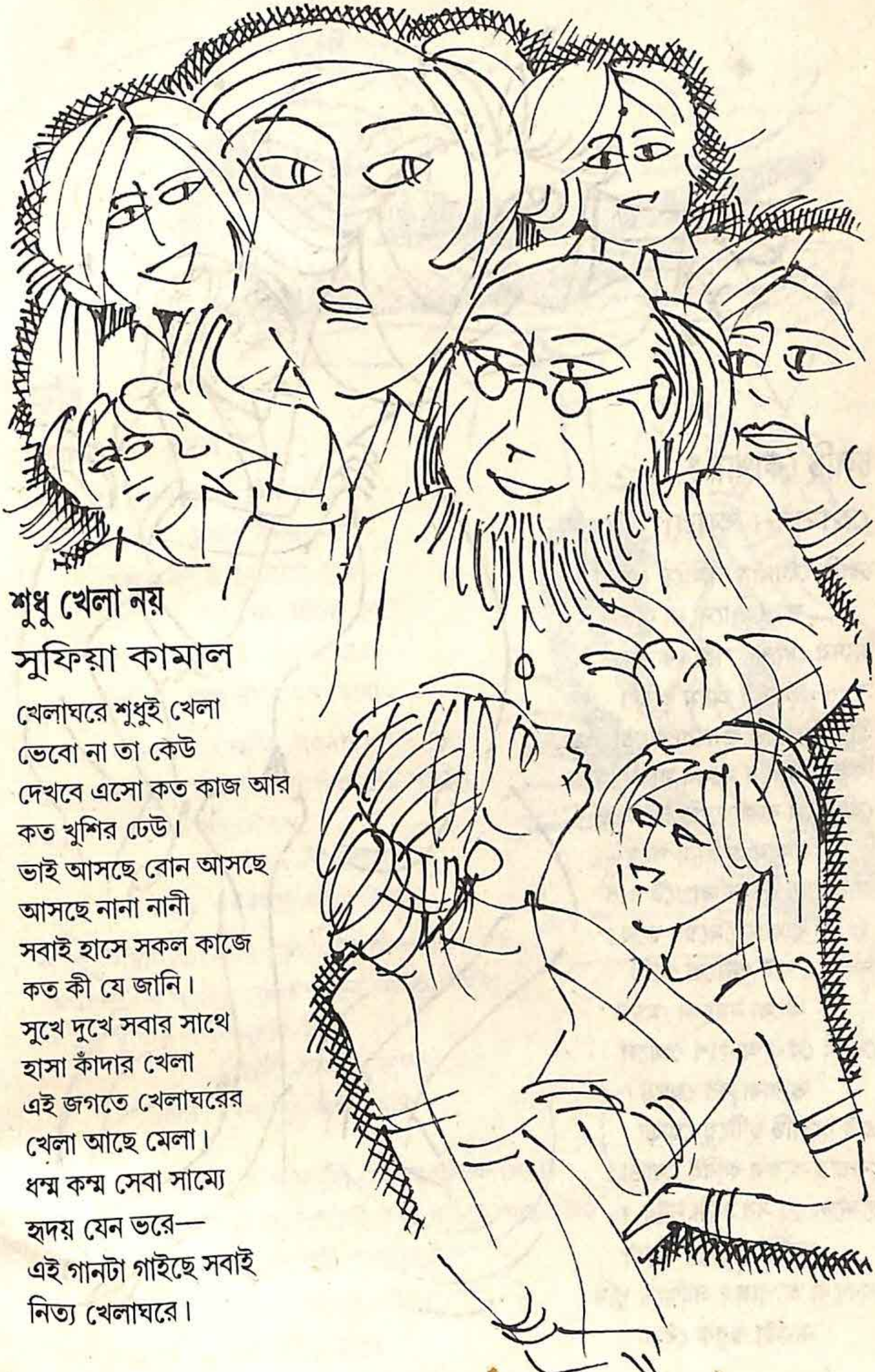


আয়রে পাখি আয়

প্রজেশ কুমার রায়

আয়রে পাখি আয়—
আয়রে আমার শূন্য নীড়ে
রাঙা এ-সন্ধ্যায়।
ক্ষ্যাপা হাওয়া তাড়িয়ে আনে
লক্ষ তারার ঝাঁক,
সমুদ্দুরের মাছ কি ওরা
হঠাৎ পেলো পাখ!—
লক্ষ পাখির ঝিলমিলিতে
আকাশ ছেয়ে যায়—
তারার আলো পাখায় মেখে
আমার পাখি আয়।

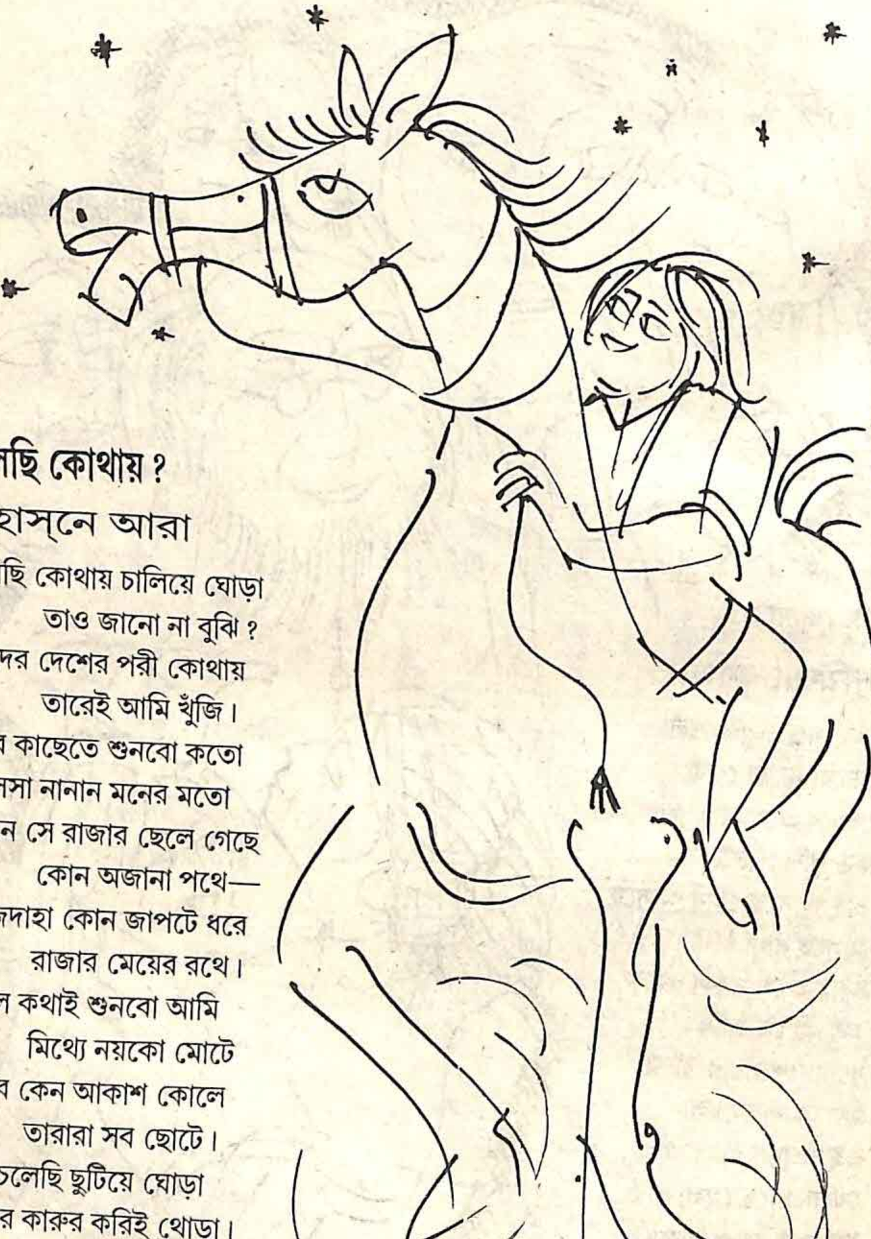
আয়রে পাখি আয়—
আয়রে আমার শূন্য নীড়ে
রাঙা এ-সন্ধ্যায়।
দমকা হাওয়ায় দোলায় মাথা
মত্ত শালের গাছ,
আবছায়াতে শুরু হল
ফুল-পরীদের নাচ ;
পরীর অলক, ফুলের রেণু
শূন্যে ভেসে যায়—
ফুলের রেণু পাখায় মেখে
আমার পাখি আয়।



শুধু খেলা নয়

সুফিয়া কামাল

খেলাঘরে শুধুই খেলা
ভেবো না তা কেউ
দেখবে এসো কত কাজ আর
কত খুশির ঢেউ।
ভাই আসছে বোন আসছে
আসছে নানা নানী
সবাই হাসে সকল কাজে
কত কী যে জানি।
সুখে দুখে সবার সাথে
হাসা কাঁদার খেলা
এই জগতে খেলাঘরের
খেলা আছে মেলা।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সেবা সাম্যে
হৃদয় যেন ভরে—
এই গানটা গাইছে সবাই
নিত্য খেলাঘরে।



চলছি কোথায় ?

হোস্‌নে আরা

চলছি কোথায় চালিয়ে ঘোড়া
তাও জানো না বুঝি ?
চাঁদের দেশের পরী কোথায়
তারেই আমি খুঁজি।
তার কাছেতে শুনবো কতো
কিসসা নানান মনের মতো
কোন সে রাজার ছেলে গেছে
কোন অজানা পথে—
আজদাহা কোন জাপটে ধরে
রাজার মেয়ের রথে।
সকল কথাই শুনবো আমি
মিথ্যে নয়কো মোটে
দেখব কেন আকাশ কোলে
তারারা সব ছোটে।
তাই চলেছি ছুটিয়ে ঘোড়া
কেয়ার কারুর করিই থোড়া।
হাসছো যে সব ঠাট্টা নাকি ?
ভারি তো সব ছোঁচা
ডাকবো আপায় ? লাগিয়ে ঘুষি
নাকটা করুক বোঁচা।



আমি

আহসান হাবীব

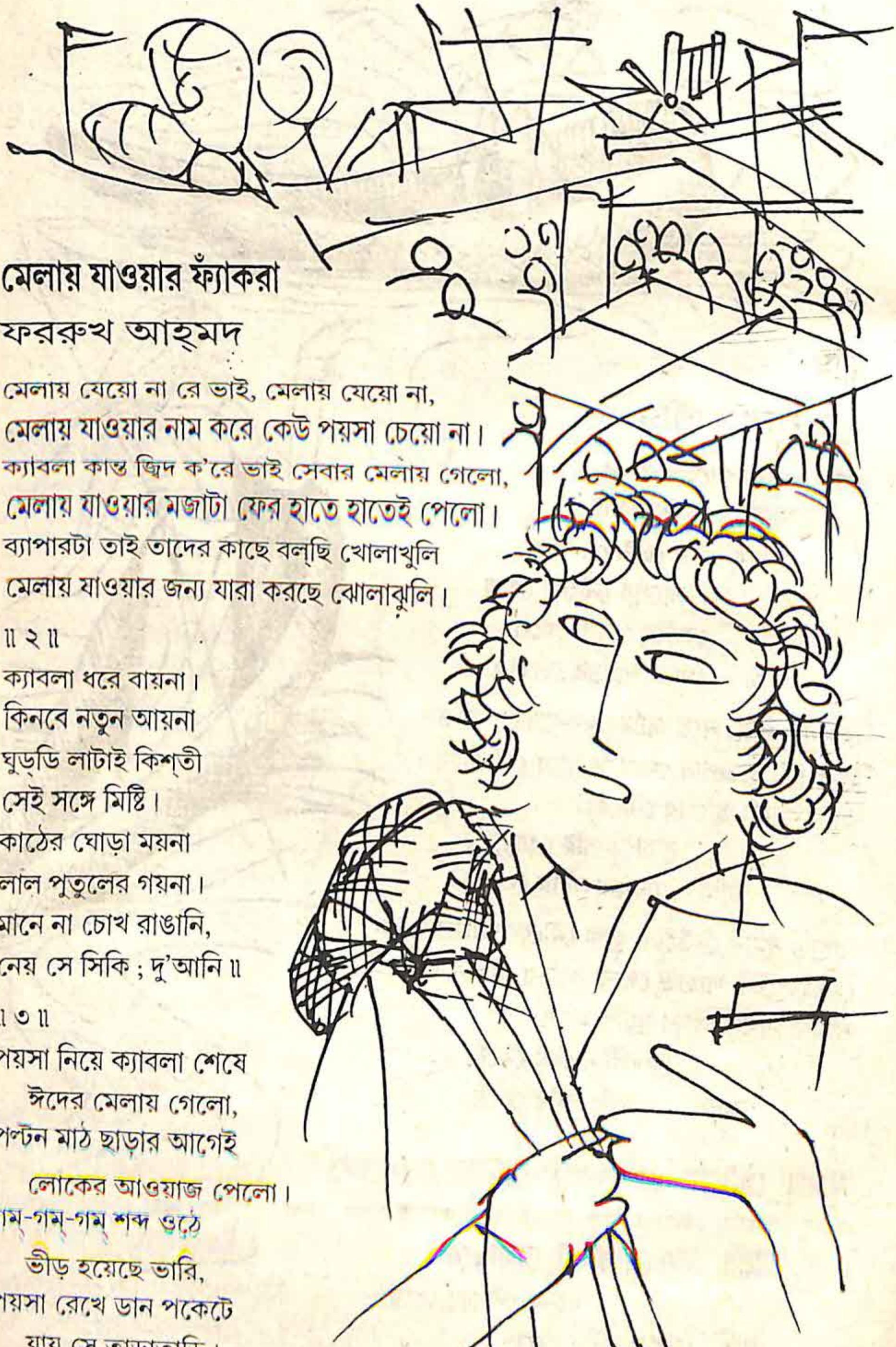


আমি মেঘনাপাড়ের ছেলে
আমি মেঘনা নদীর নেয়ে।
মেঘনা নদীর ঢেউয়ের বুকে
তালের নৌকো বেয়ে
আমি বেড়াই হেসে-খেলে—
আমি মেঘনাপাড়ের ছেলে।

মেঘনা নদীর নেয়ে আমি মেঘনাপাড়ে বাড়ি
ইচ্ছে হলেই এপার থেকে ওপারে দেই পাড়ি।
তালে তালে তালের নৌকো,
দু'হাতে যাই বেয়ে,
আমি মেঘনা নদীর মেয়ে।

পাহাড় সমান ঢেউয়ের বুকে নৌকো আমার ভাসে।
মেঘমুলুকের পাহাড় থেকে ঝড়ের ঝাপটা আসে—
আমার মাথার ওপর মুচ্‌কি হাসে
বিজলী নামের মেয়ে
আমি মেঘনা নদীর নেয়ে।

আমার ঢেউয়ের সঙ্গে গলাগলি ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা
আমি ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে কাটাই সারা বেলা
আর দেশ থেকে যাই দেশান্তরে
মনের নৌকো বেয়ে—
আমি মেঘনা নদীর ছেলে
আমি মেঘনা নদীর নেয়ে।



মেলায় যাওয়ার ফ্যাকরা
ফররুখ আহ্‌মদ

মেলায় যেয়ো না রে ভাই, মেলায় যেয়ো না,
মেলায় যাওয়ার নাম করে কেউ পয়সা চেয়ো না।
ক্যাবলা কান্ত জিদ ক'রে ভাই সেবার মেলায় গেলো,
মেলায় যাওয়ার মজাটা ফের হাতে হাতেই পেলো।
ব্যাপারটা তাই তাদের কাছে বল্‌ছি খোলাখুলি
মেলায় যাওয়ার জন্য যারা করছে ঝোলাঝুলি।

॥ ২ ॥

ক্যাবলা ধরে বায়না।
কিনবে নতুন আয়না
ঘুড়ডি লাটাই কিশ্‌তী
সেই সঙ্গে মিষ্টি।
কাঠের ঘোড়া ময়না
লাল পুতুলের গয়না।
মানে না চোখ রাঙানি,
নেয় সে সিকি ; দু'আনি ॥

॥ ৩ ॥

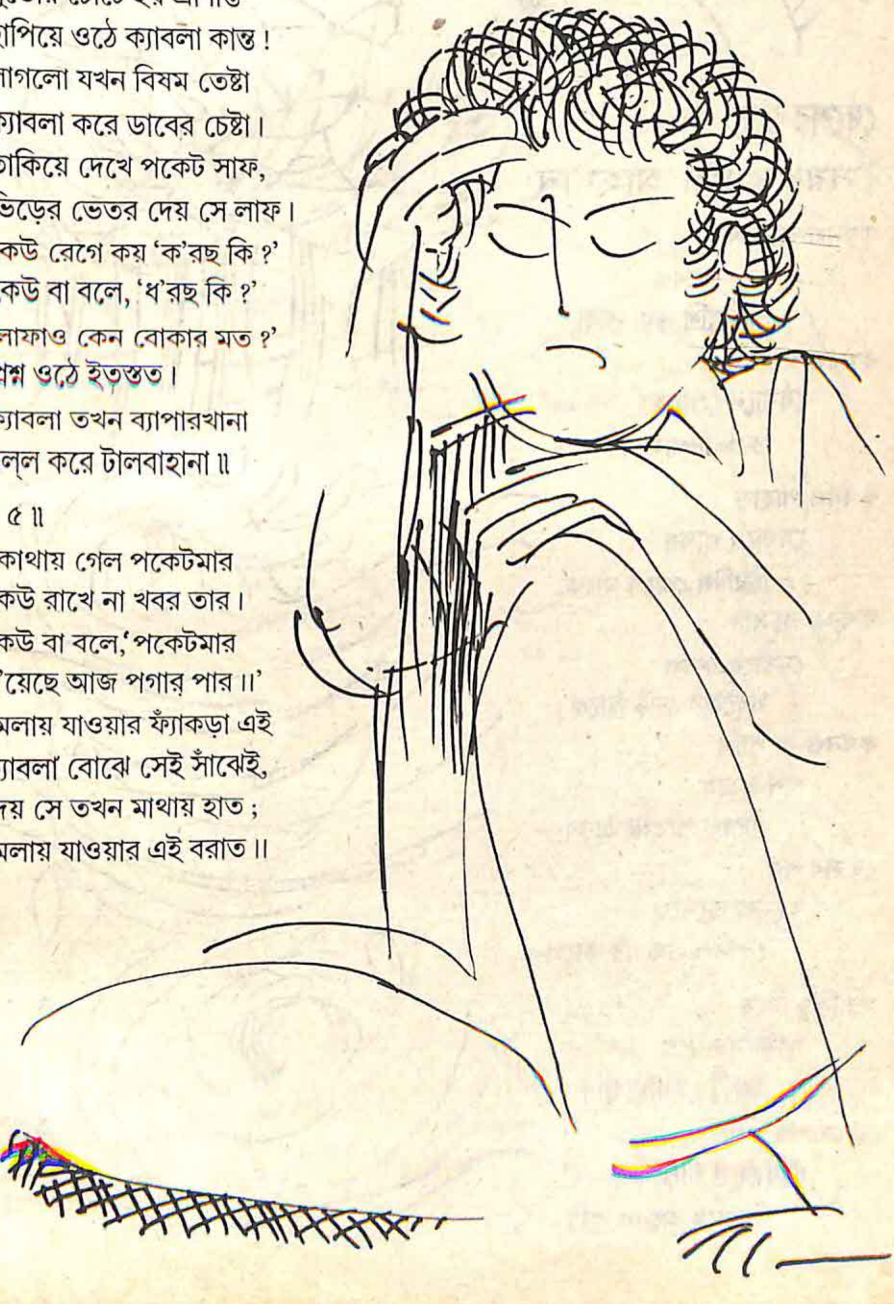
পয়সা নিয়ে ক্যাবলা শেষে
ঈদের মেলায় গেলো,
পল্টন মাঠ ছাড়ার আগেই
লোকের আওয়াজ পেলো।
গম্‌-গম্‌-গম্‌ শব্দ ওঠে
ভীড় হয়েছে ভারি,
পয়সা রেখে ডান পকেটে
যায় সে তাড়াতাড়ি।—

॥ ৪ ॥

বাপ্‌রে সে কী ধূম ধাড়াক্কা
দিচ্ছে ধাক্কা, খাচ্ছে ধাক্কা,
গুঁতোর চোটে হয় প্রাণান্ত
হাঁপিয়ে ওঠে ক্যাবলা কান্ত!
লাগলো যখন বিষম তেষ্টা
ক্যাবলা করে ডাবের চেষ্টা।
তাকিয়ে দেখে পকেট সাফ,
ভিড়ের ভেতর দেয় সে লাফ।
কেউ রেগে কয় 'ক'রছ কি?'
কেউ বা বলে, 'ধ'রছ কি?'
'লাফাও কেন বোকার মত?'
প্রশ্ন ওঠে ইতস্তত।
ক্যাবলা তখন ব্যাপারখানা
বল্‌ল করে টালবাহানা ॥

॥ ৫ ॥

কোথায় গেল পকেটমার
কেউ রাখে না খবর তার।
কেউ বা বলে,'পকেটমার
হ'য়েছে আজ পগার পার ॥'
মেলায় যাওয়ার ফ্যাকড়া এই
ক্যাবলা বোঝে সেই সাঁঝেই,
দেয় সে তখন মাথায় হাত;
মেলায় যাওয়ার এই বরাত ॥





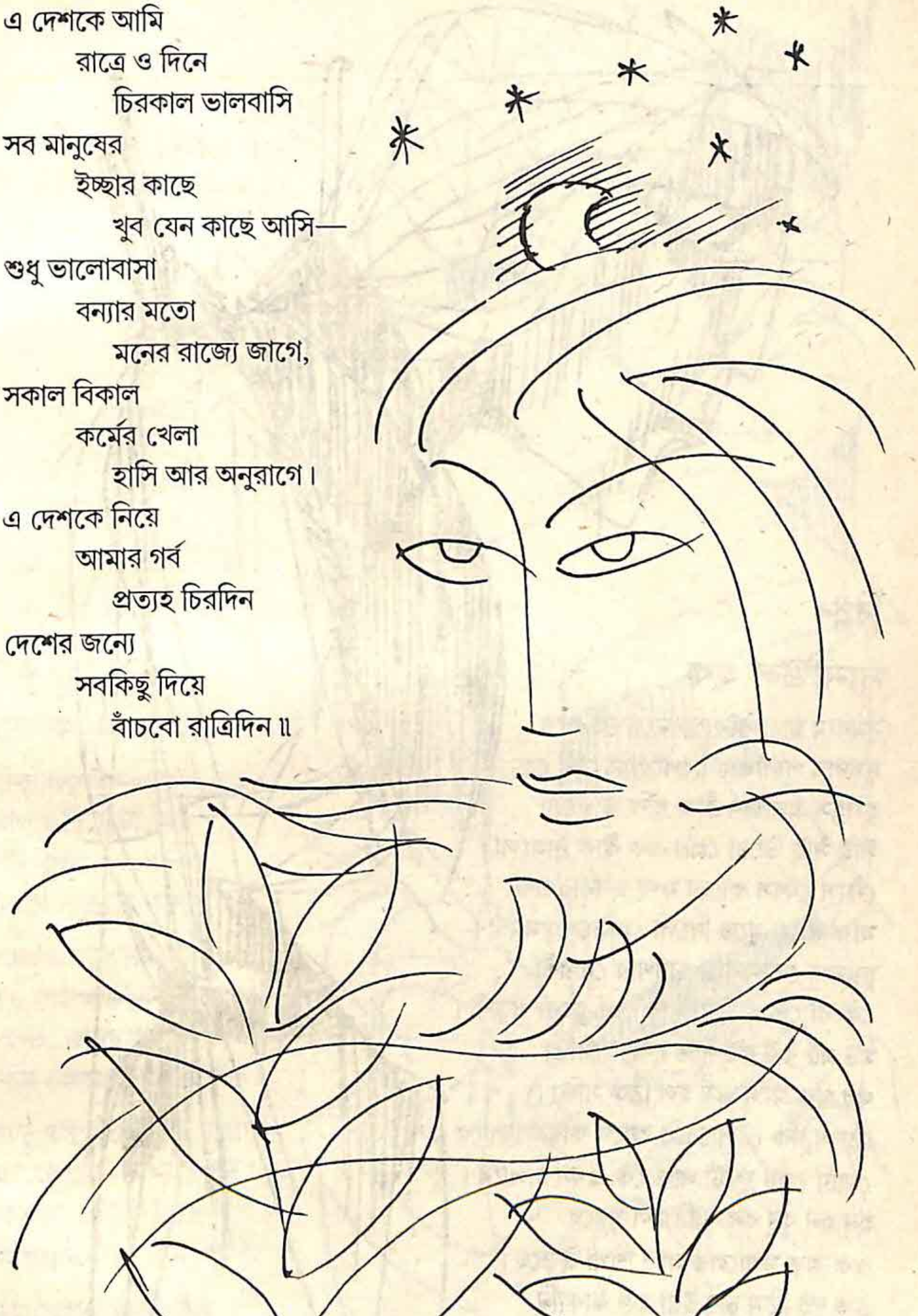
দেশের জন্য

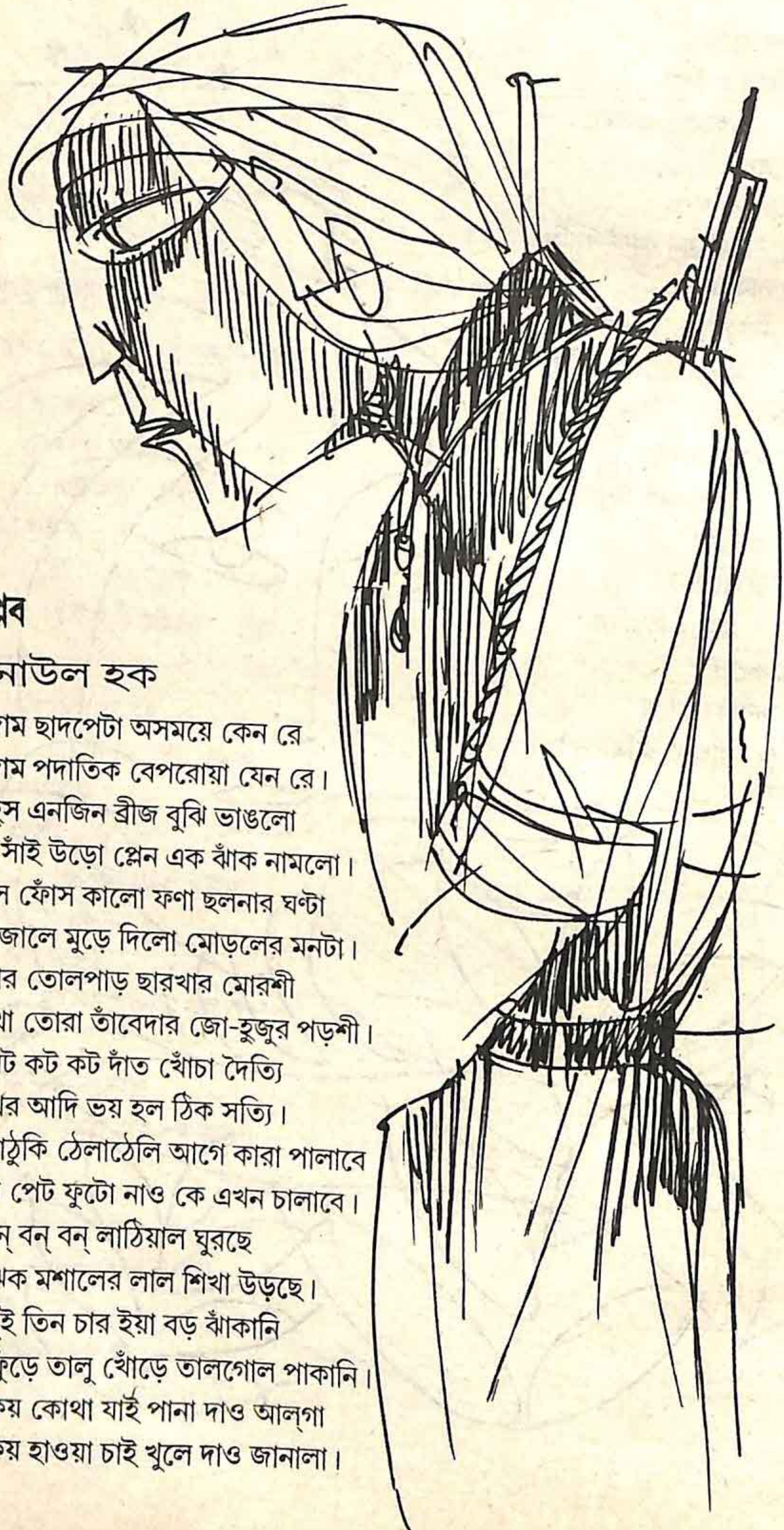
সৈয়দ আলী আহসান

কখনও আকাশ
যেখানে অনেক
হাসিখুশি ভরা তারা,
কখনও সাগর
যেখানে স্রোতের
তরঙ্গ দিশাহারা।
কখনও পাহাড়
যেখানে পাথর
চিরদিন জেগে থাকে,
কখনও-বা মাঠ
যেখানে ফসল
সবুজের ঢেউ আঁকে।
কখনও-বা পাখি
শব্দ ছড়ায়
গাছের পাতায় ডালে—
যে সব শব্দ
অনেক শুনেছে
কোনও এক দূর কালে—
সব কিছু নিয়ে
আমাদের দেশ
একটি সোনার ছবি
যে দেশের কথা
কবিতা ও গানে
লিখেছে অনেক কবি—



এ দেশকে আমি
রাত্রে ও দিনে
চিরকাল ভালবাসি
সব মানুষের
ইচ্ছার কাছে
খুব যেন কাছে আসি—
শুধু ভালোবাসা
বন্যার মতো
মনের রাজ্যে জাগে,
সকাল বিকাল
কর্মের খেলা
হাসি আর অনুরাগে।
এ দেশকে নিয়ে
আমার গর্ব
প্রত্যহ চিরদিন
দেশের জন্যে
সবকিছু দিয়ে
বাঁচবো রাত্রিদিন ॥





বিপ্লব

সানাউল হক

দুমদাম ছাদপেটা অসময়ে কেন রে
দুমদাম পদাতিক বেপরোয়া যেন রে।
হুসহুস এনজিন ব্রীজ বুঝি ভাঙলো
সাঁই সাঁই উড়ো প্লেন এক ঝাঁক নামলো।
ফোঁস ফোঁস কালো ফণা ছলনার ঘণ্টা
মায়াজালে মুড়ে দিলো মোড়লের মনটা।
চুরমার তোলপাড় ছারখার মোরশী
কোথা তোরা তাঁবেদার জো-হুজুর পড়শী।
মট মট কট কট দাঁত খোঁচা দৈত্যি
থর থর আদি ভয় হল ঠিক সত্যি।
ঠোকাঠুকি ঠেলাঠেলি আগে কারা পালাবে
মোটা পেট ফুটো নাও কে এখন চালাবে।
হন্ হন্ বন্ বন্ লাঠিয়াল ঘুরছে
ঝক ঝক মশালের লাল শিখা উড়ছে।
এক দুই তিন চার ইয়া বড় ঝাঁকানি
কান ফুঁড়ে তালু খোঁড়ে তালগোল পাকানি।
ওরা কয় কোথা যাই পানা দাও আল্‌গা
এরা কয় হাওয়া চাই খুলে দাও জানালা।



বাক্ বাক্ কুম্

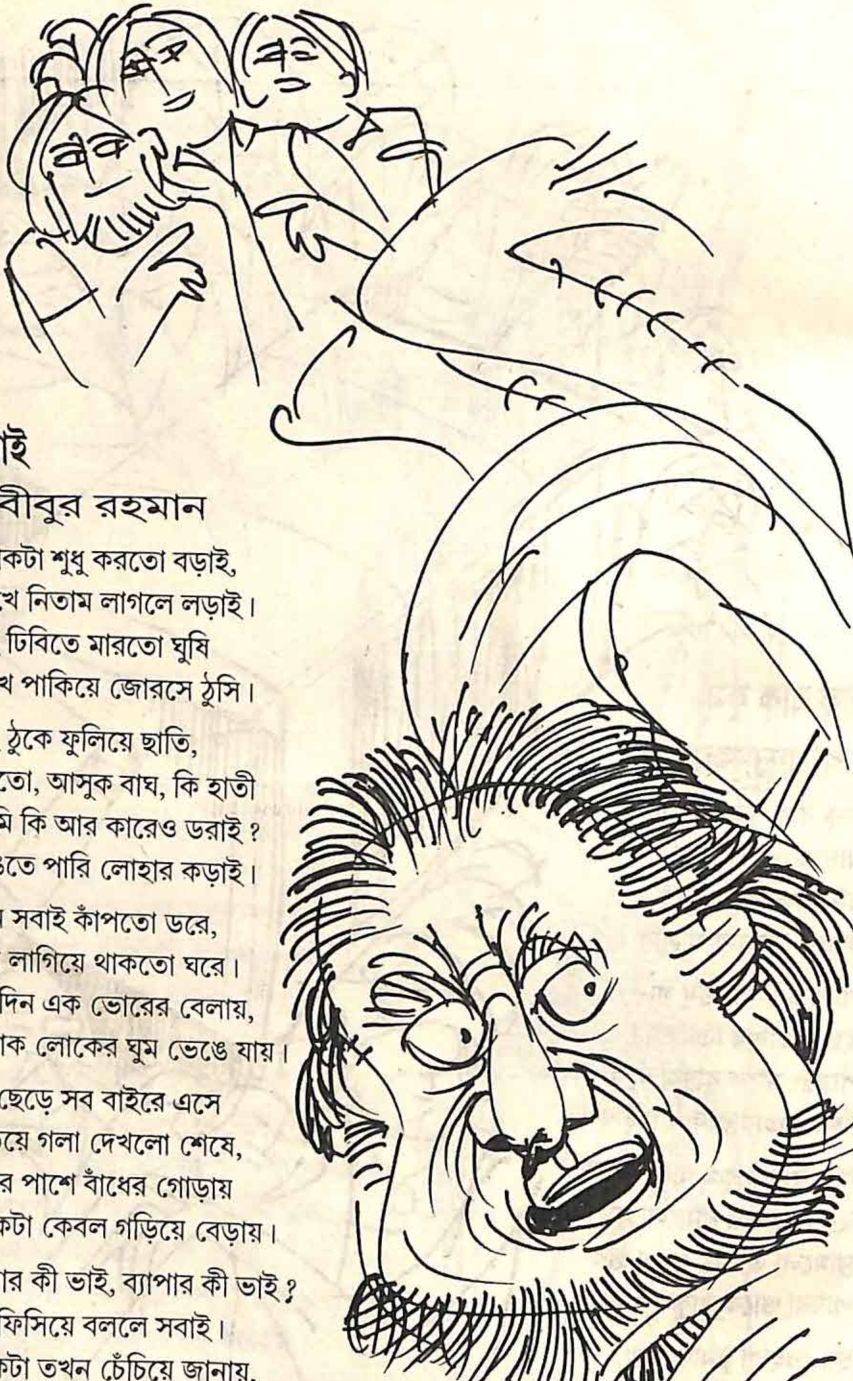
রোকনুজ্জামান খান

বাক্ বাক্ কুম্ পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল কি ?
চড়বে সোনার পাল্‌কি ?

পাল্‌কি চলে ভিন্ গাঁ—
ছয় বেহারার তিন পা।
পায়রা ডাকে বাকুম্ বাক্
তিন বেহারার মাথায় টাক।

বাক্ বাকুম্ কুম্ বাক্ বাকুম
ছয় বেহারার নামলো ঘুম্।
থামলো তাদের হুকুম হাঁক
পায়রা ডাকে বাকুম্ বাক্।

ছয় বেহারা হুমড়ি খায়
পায়রা উড়ে যায় কোথায় ?



বড়াই

হাবীবুর রহমান

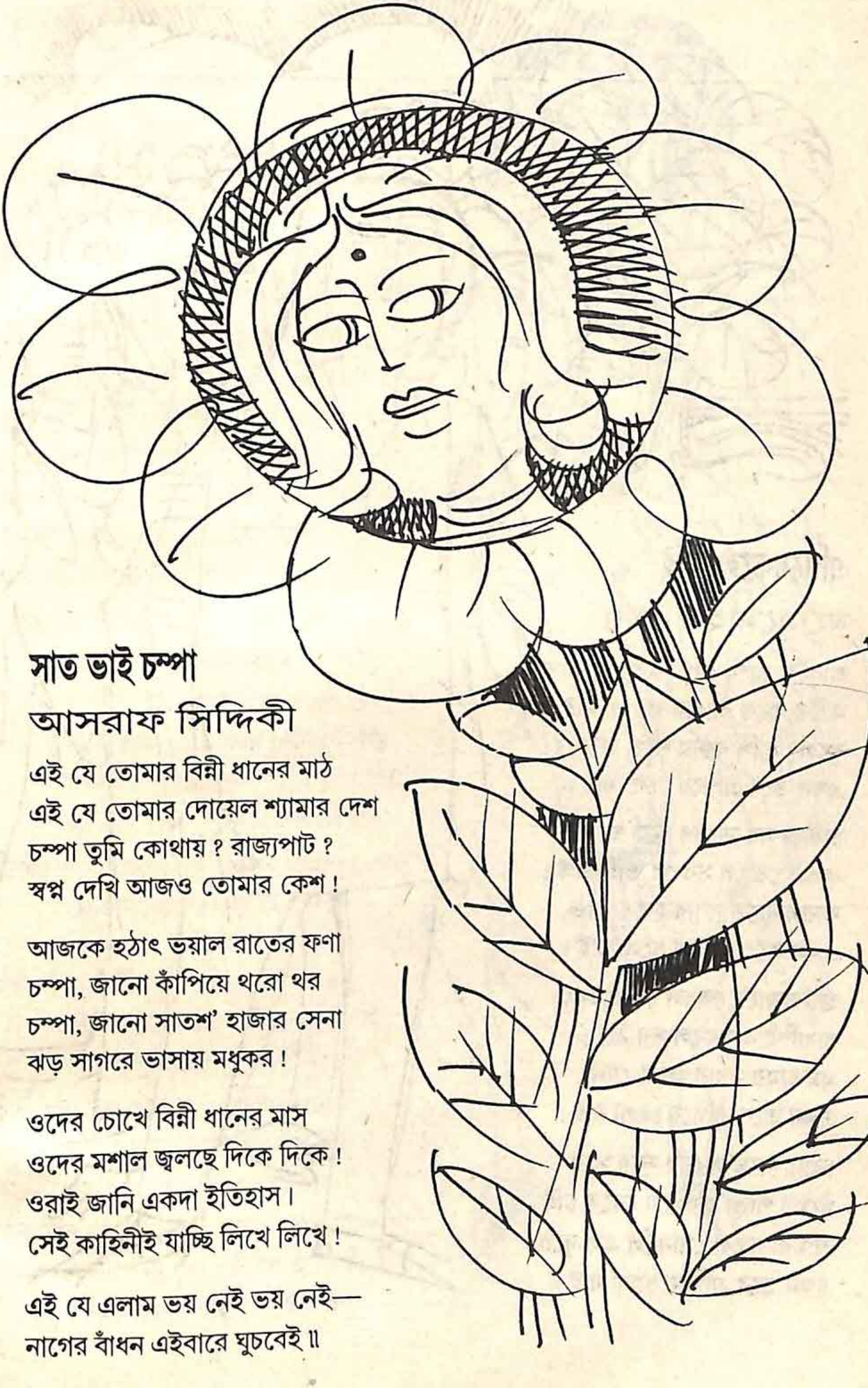
লোকটা শুধু করতো বড়াই,
দেখে নিতাম লাগলে লড়াই।
উই ঢিবিতে মারতো ঘুষি
চোখ পাকিয়ে জোরসে ঠুসি।

বাহু ঠুকে ফুলিয়ে ছাতি,
বলতো, আসুক বাঘ, কি হাতী
আমি কি আর কারেও ডরাই?
ভাঙতে পারি লোহার কড়াই।

শুনে সবাই কাঁপতো ডরে,
খিল লাগিয়ে থাকতো ঘরে।
একদিন এক ভোরের বেলায়,
বেবাক লোকের ঘুম ভেঙে যায়।

ঘর ছেড়ে সব বাইরে এসে
বাড়িয়ে গলা দেখলো শেষে,
ঢিবির পাশে বাঁধের গোড়ায়
লোকটা কেবল গড়িয়ে বেড়ায়।

ব্যাপার কী ভাই, ব্যাপার কী ভাই?
ফিস্‌ফিসিয়ে বললে সবাই।
লোকটা তখন চেঁচিয়ে জানায়,
উই ধরেছে নাকের ডগায়।



সাত ভাই চম্পা

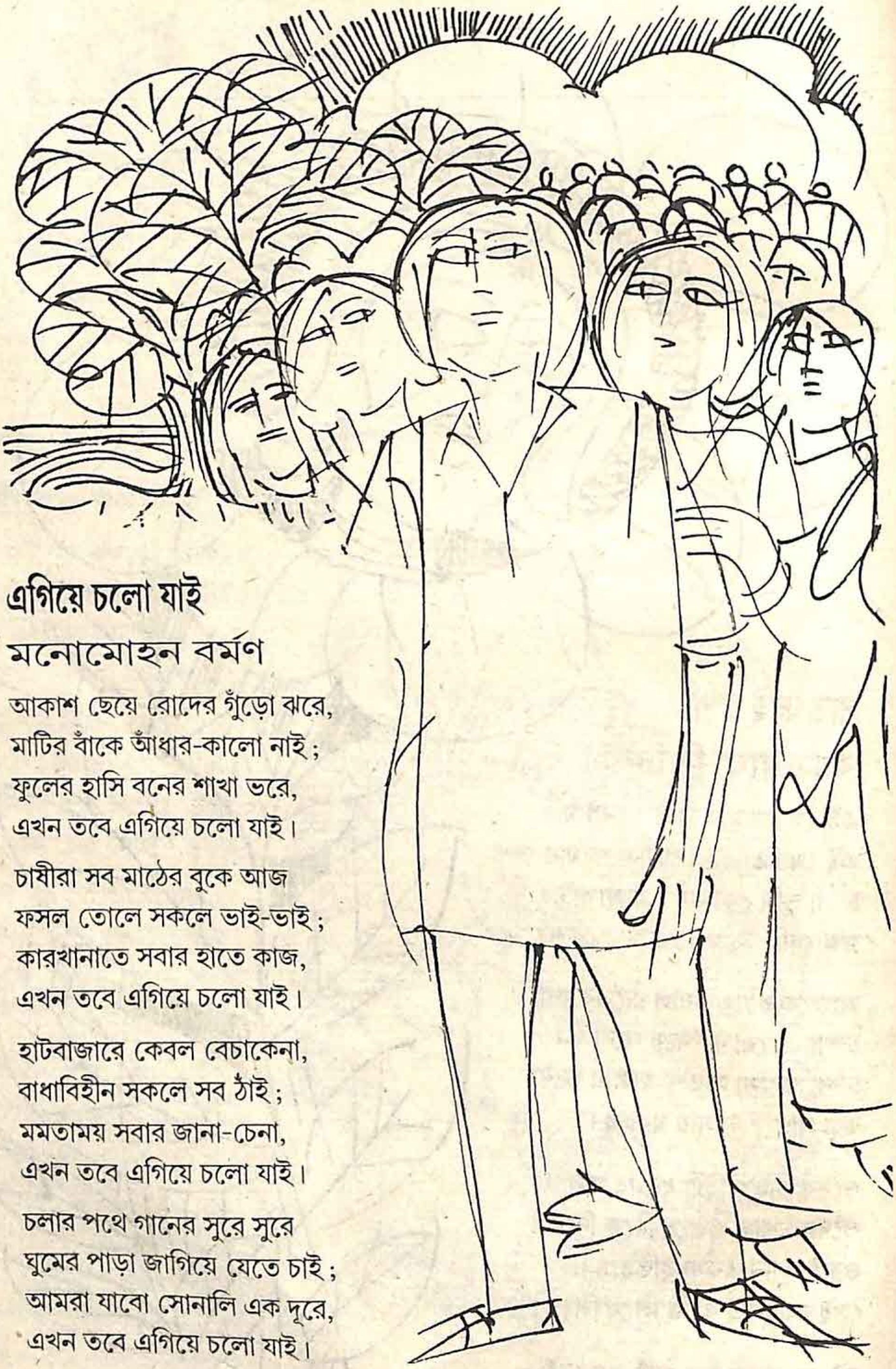
আসরাফ সিদ্দিকী

এই যে তোমার বিন্নী ধানের মাঠ
এই যে তোমার দোয়েল শ্যামার দেশ
চম্পা তুমি কোথায় ? রাজ্যপাট ?
স্বপ্ন দেখি আজও তোমার কেশ !

আজকে হঠাৎ ভয়াল রাতের ফণা
চম্পা, জানো কাঁপিয়ে থরো থর
চম্পা, জানো সাতশ' হাজার সেনা
ঝড় সাগরে ভাসায় মধুকর !

ওদের চোখে বিন্নী ধানের মাস
ওদের মশাল জ্বলছে দিকে দিকে !
ওরাই জানি একদা ইতিহাস।
সেই কাহিনীই যাচ্ছি লিখে লিখে !

এই যে এলাম ভয় নেই ভয় নেই—
নাগের বাঁধন এইবারে ঘুচবেই ॥



এগিয়ে চলো যাই

মনোমোহন বর্মণ

আকাশ ছেয়ে রোদের গুঁড়ো ঝরে,
মাটির বাঁকে আঁধার-কালো নাই ;
ফুলের হাসি বনের শাখা ভরে,
এখন তবে এগিয়ে চলো যাই।

চাষীরা সব মাঠের বুকে আজ
ফসল তোলে সকলে ভাই-ভাই ;
কারখানাতে সবার হাতে কাজ,
এখন তবে এগিয়ে চলো যাই।

হাটবাজারে কেবল বেচাকেনা,
বাধাবিহীন সকলে সব ঠাঁই ;
মমতাময় সবার জানা-চেনা,
এখন তবে এগিয়ে চলো যাই।

চলার পথে গানের সুরে সুরে
ঘুমের পাড়া জাগিয়ে যেতে চাই ;
আমরা যাবো সোনালি এক দূরে,
এখন তবে এগিয়ে চলো যাই।

চিহি বাহাদুর

ফয়েজ আহমদ

হাসতে থাকে মিহি ঘোড়ার মত চিঁহি
হাসির চোটে গাছের ডালে বসে,
দেখলে ভাবি পেট ভরা তার রসে।
প্রশ্ন কর গিয়েঃ হাসার কারণ কি হে?
বলবে হেসেঃ হাসছি কোথায় ওরে।
কাঁদার সময় এমনি দেখায় মোরে?

আকাশ ভরা মেঘে তাই দেখে সে রেগে
হাত গুটিয়ে ভীষণ পাকায় মুঠি
গরুর মত ড্যাব্ ড্যাবা চোখ দু'টি।
বললে কেহ ডেকেঃ রাগলে কি হে দেখে?
বলবে রেগেঃ না তো মিথ্যে যত—
বসে আছি শান্ত ছেলের মত।

রামছাগলের ঘাড়ে দেখবে যখন তারে,
তখন যদি প্রশ্ন কর এসেঃ
ছাগল চড়ে চলছো কোন্ এক দেশে?
কান দুলিয়ে তার আর বেঁকিয়ে ঘাড়
বলবেঃ না তো' বলিস কি রে তোরা?
এটা যে মোর আরব দেশের ঘোড়া!

সন্ধ্যে দুপুর ভোরে তিন রাস্তার মোড়ে
ঘোড়ামুখোর গানের ছোটে খৈ—
গাধার মত করবে সে হৈ চৈ।
বললেঃ হে শ্রীমান, গাইছ কেন গান?
বলবেঃ কোথায় গাইছি আমি ভাই,
ছ'মাস হল মুখে যে রা' নাই!

ধিন্ ধিনা ধিন্ করে সদর রাস্তা ধরে
চলতে থাকে হয়তো কারুর পিছু।
সবাই ভাবে কাজ রয়েছে কিছু।
কিন্তু যদি বলোঃ অমনি কেন চলো?
বলবেঃ না তো! ভীষণ আড়ি দিয়ে
ন'দিন যাবৎ রইছি যে দাঁড়িয়ে।





রাজকাহিনী

শামসুর রাহমান

ধন্য রাজা ধন্য
দেশ জোড়া তার সৈন্য!
পথে-ঘাটে ভেড়ার পাল!
চাষীর গরু, মাঝির হাল,
ঘটি-বাটি, গামছা, হাঁড়ি,
সাতমহলা আছে বাড়ি
আছে হাতি, আছে ঘোড়া!
কেবল পোড়া মুখে পোরার
দু'মুঠো নেই অন্ন
ধন্য রাজা ধন্য!

ঢ্যাম কুড় কুড় বাজনা বাজে,
পথে-ঘাটে সান্ত্রী সাজে।
শোন সবাই হুকুমনামা
ধরতে হবে রাজার ধামা।
বাঁ দিকে ভাই চলতে মানা,
সাজতে হবে বোবা-কানা।
মস্তরাজা হেলে দুলে
যখন তখন চড়ান শূলে
মুখটি খোলার জন্য
ধন্য রাজা ধন্য!



রাজায় রাজায়

আবদার রশীদ



হোঁদল রাজা বললে ডেকে—
"বুদ্ধু রাজা, আজকে থেকে
করবো না আর যুদ্ধ বাজী
তুই যদি ভাই থাকিস রাজী।"

বুদ্ধু বলে—"বেশ তো হোঁদল
আজ থেকে আর নয় কো কোঁদল!
লাভটা কি বল্ লড়াই ক'রে
লোক মেরে আর নিজেই মরে?"

হোঁদল বলে—"তার চেয়ে ভাই
সাগরপাড়ে চল্ না বেড়াই!
বালুর ঢিবি সাজিয়ে নিয়ে
খেলবো দু'জন ঘর বানিয়ে!"

বুদ্ধু বলে—"হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই,
সাগরপাড়ে চল্ তবে যাই—
বালুর ঢিবির ঘর বানাবো,
দুইজনে বেশ বাদাম খাবো!"

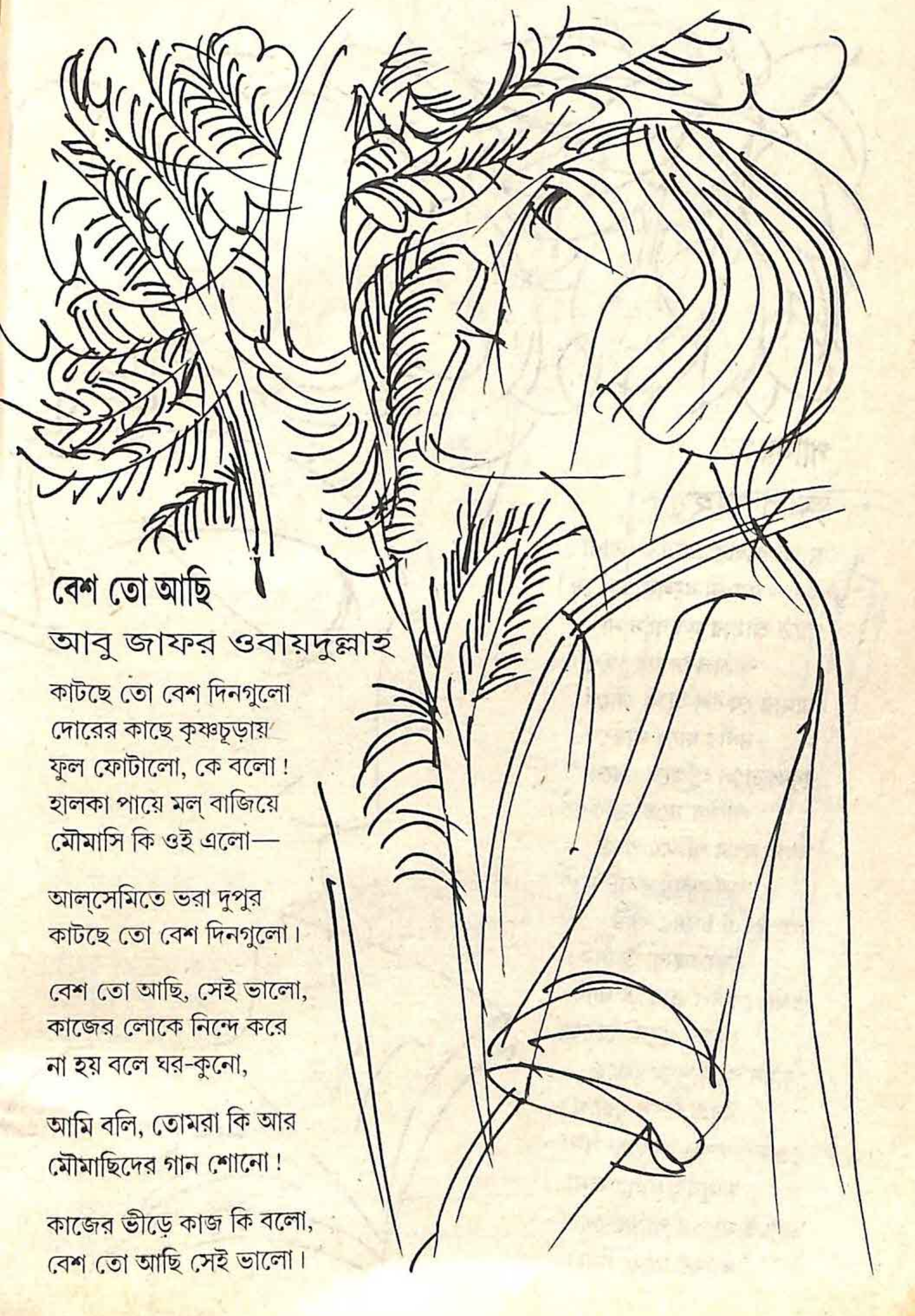
হোঁদল বলে—"বালুর ফাঁকে
মস্ত যদি কাঁকড়া থাকে?
হঠাৎ এসে কামড়ে দিলে
তখন যদি গজায় পিলে?"

বুদ্ধু বলে—"কিংবা ধরো
ঢেউ এলো এক মস্ত বড়ো !
তখন যদি ঢেউয়ের সাথে
পটল তুলি দুইজনাতে ?"

হোঁদল বলে—"তার চেয়ে ভাই
চল্ না খানিক যুদ্ধ লাগাই !"
বুদ্ধু বলে—"চল্ তবে তাই
যুদ্ধ করেই সময় কাটাই !"

ছুটলো কামান, গোলাগুলী
লাগ্‌লো ভীষণ যুদ্ধ—
নিপাত গেল হোঁদল রাজা
নিপাত রাজা বুদ্ধু !!





বেশ তো আছি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

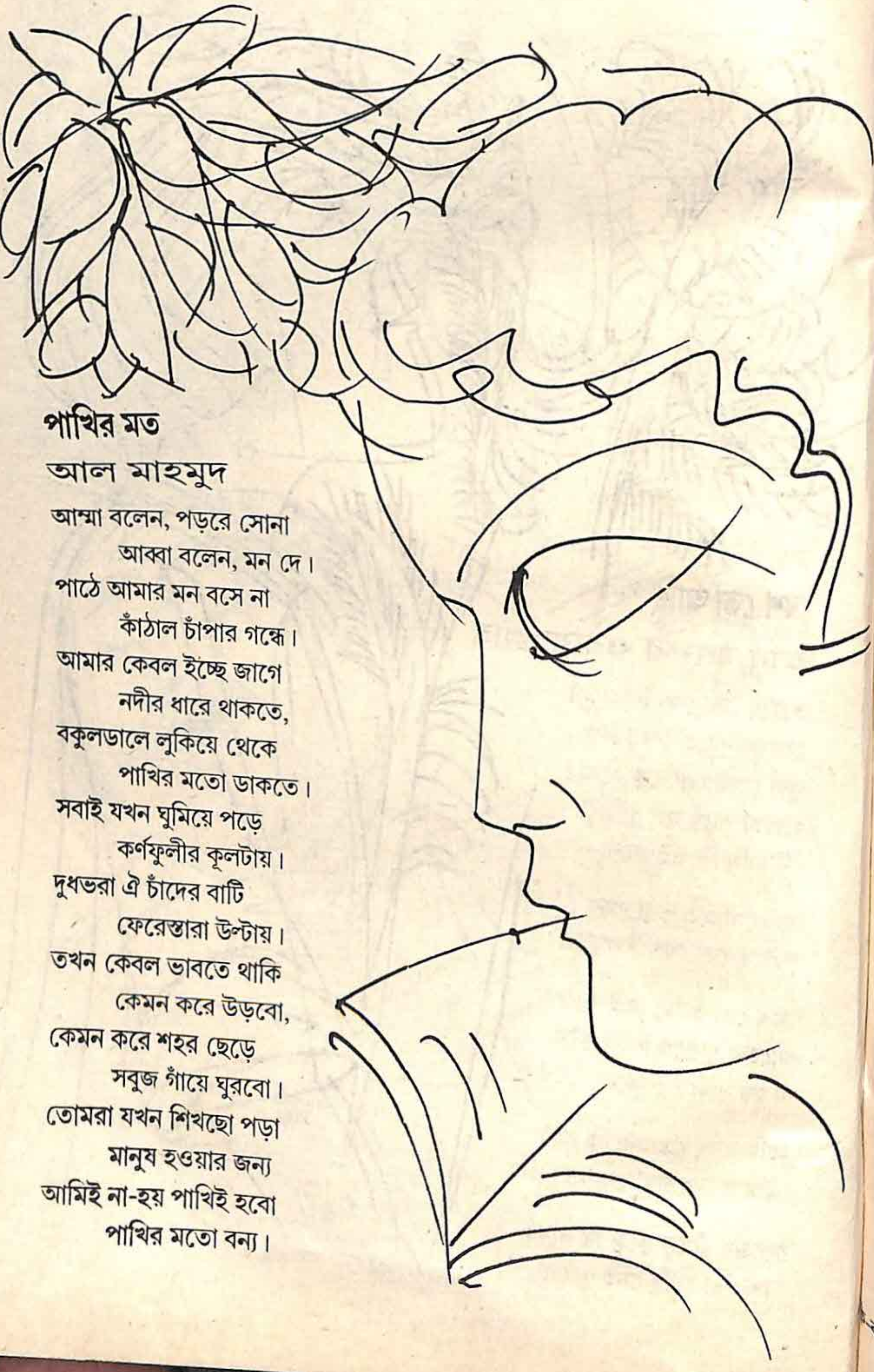
কাটছে তো বেশ দিনগুলো
দোরের কাছে কৃষ্ণচূড়ায়
ফুল ফোটালো, কে বলো!
হালকা পায়ে মল্ বাজিয়ে
মৌমাসি কি ওই এলো—

আল্‌সেমিতে ভরা দুপুর
কাটছে তো বেশ দিনগুলো।

বেশ তো আছি, সেই ভালো,
কাজের লোকে নিন্দে করে
না হয় বলে ঘর-কুনো,

আমি বলি, তোমরা কি আর
মৌমাছিদের গান শোনো!

কাজের ভীড়ে কাজ কি বলো,
বেশ তো আছি সেই ভালো।



পাখির মত

আল মাহমুদ

আম্মা বলেন, পড়রে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে।
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠাল চাঁপার গন্ধে।
আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর ধারে থাকতে,
বকুলডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে।
সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলীর কূলটায়।
দুধভরা ঐ চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উল্টায়।
তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন করে উড়বো,
কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরবো।
তোমরা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য
আমিই না-হয় পাখিই হবো
পাখির মতো বন্য।



নাচ

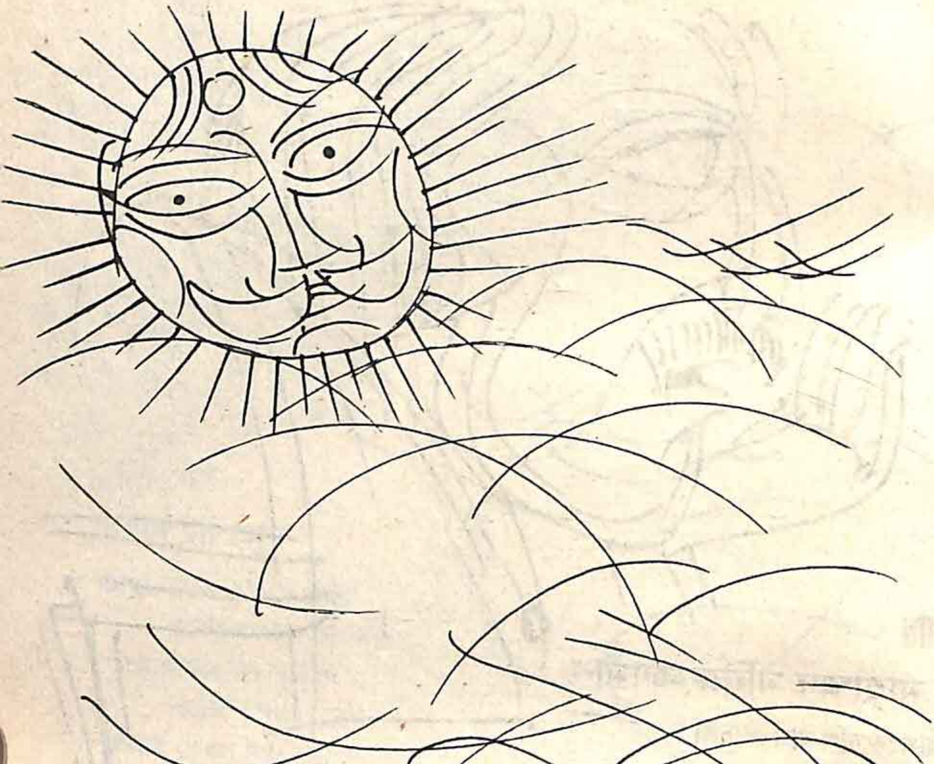
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

ঘাস বিচেলি ঘাস বিচেলি
ঘাস বিচেলি ঘাস
কারো ভাদর কারো ফাগুন
কারো পউস মাস।

কেউবা হাঁকেন মওকা বুঝে
ঘোরেন ফেরেন সুযোগ খুঁজে
মোসাহেবের সুড়সুড়িতে
হৃদয়ে উল্লাস।

কেউবা চরেন দলের ভেড়া
মতিগতি বুদ্ধি তেড়া
পরস্পরের গুঁতোগুঁতি
চলে বারোমাস।

কেউবা কলের পুতুল সেজে
পরের বুলি বলেন নিজে
দম ফুরোলেই এক পলকে
থামে ছুঁচোর নাচ।



সমুদ্র স্বপ্ন

দিলওয়ার



সূর্যের কলরব আছে
ভোর হলে শোনা যায়
মনে মনে গোনা যায়
দেখা যায় রশ্মিরা নাচে।

সাগরেও হৈ চৈ আছে
ঢেউগুলো বলে যায়—
ঝিনুকেরা তলে যায়
দস্যুরা খুঁজে পায় পাছে।

ডুবুরী যে, গভীরেই যায়
মুক্তায় তারে যেন পায়।



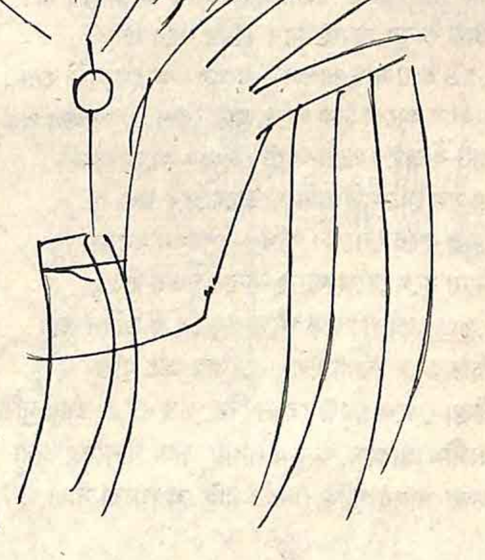
রাজার দেশে

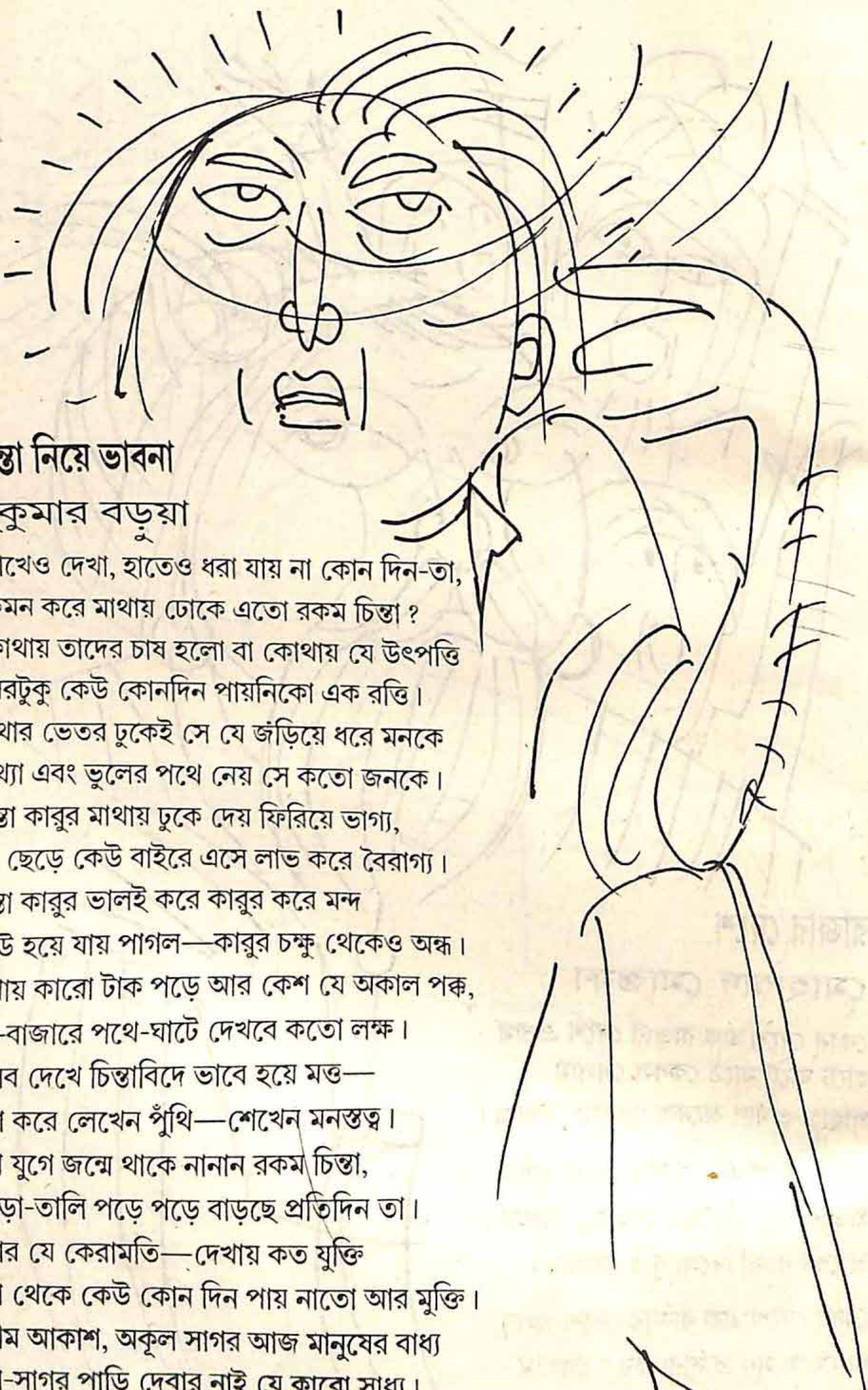
মোহাম্মদ মোস্তফা

কোন্ দেশে এক রাজার দেশে এলাম
হাটে ঘাটে মাঠে কেবল সেলাম
পাহাড়-প্রমাণ অনেক সেলাম পেলাম।

কোন্ দেশে এক রাজার দেশে এলাম
প্রজারা সব চেঁচায়ঃ গেলাম, গেলাম!
ভাবেন রাজা দিচ্ছে বুঝি সেলাম।

কোন্ দেশে এক রাজার দেশে এলাম
না খেয়ে সব প্রজারা কয়ঃ খেলাম
সেই না সোনার দেশকে হাজার সেলাম!





চিন্তা নিয়ে ভাবনা

সুকুমার বড়ুয়া

চোখেও দেখা, হাতেও ধরা যায় না কোন দিন-তা,
কেমন করে মাথায় ঢোকে এতো রকম চিন্তা ?
কোথায় তাদের চাষ হলো বা কোথায় যে উৎপত্তি
খবরটুকু কেউ কোনদিন পায়নিকো এক রত্তি।
মাথার ভেতর ঢুকেই সে যে জড়িয়ে ধরে মনকে
মিথ্যা এবং ভুলের পথে নেয় সে কতো জনকে।
চিন্তা কারুর মাথায় ঢুকে দেয় ফিরিয়ে ভাগ্য,
ঘর ছেড়ে কেউ বাইরে এসে লাভ করে বৈরাগ্য।
চিন্তা কারুর ভালই করে কারুর করে মন্দ
কেউ হয়ে যায় পাগল—কারুর চক্ষু থেকেও অন্ধ।
মাথায় কারো টাক পড়ে আর কেশ যে অকাল পক্ক,
হাট-বাজারে পথে-ঘাটে দেখবে কতো লক্ষ।
এ সব দেখে চিন্তাবিদে ভাবে হয়ে মত্ত—
চিন্তা করে লেখেন পুঁথি—শেখেন মনস্তত্ব।
নানা যুগে জন্মে থাকে নানান রকম চিন্তা,
জোড়া-তালি পড়ে পড়ে বাড়ছে প্রতিদিন তা।
চিন্তার যে কেরামতি—দেখায় কত যুক্তি
চিন্তা থেকে কেউ কোন দিন পায় নাতো আর মুক্তি।
অসীম আকাশ, অকূল সাগর আজ মানুষের বাধ্য
চিন্তা-সাগর পাড়ি দেবার নাই যে কারো সাধ্য।



আমার ছড়া

রফিকুল হক

গ্রামের নাম হিজুলী
ঝড়ের রাতে বিজুলী
রাত থম্‌থম্‌ সরোবর
বলতো ও মা হিজুলী
আমার জন্যে কি থুলি ?

আমার একটা নদী ছিল
নদীটার নাম ধরলা
বদর বদর, ভাদর মাসে
কি কাম তুমি করলা !
ভাগ্যে যদি ছিল তাই—
এখন আমার নদী নাই।

আমার একটা গাছ ছিল
গাছটার নাম 'অশথ'
বিশাল গাছের শাখায় শাখায়
হাজার পাখির বসত।
পাখির বাসা নড়ে চড়ে
কাল বোশেখী ঝড়ে
মাঠের ধারে বুড়ো অশথ
হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

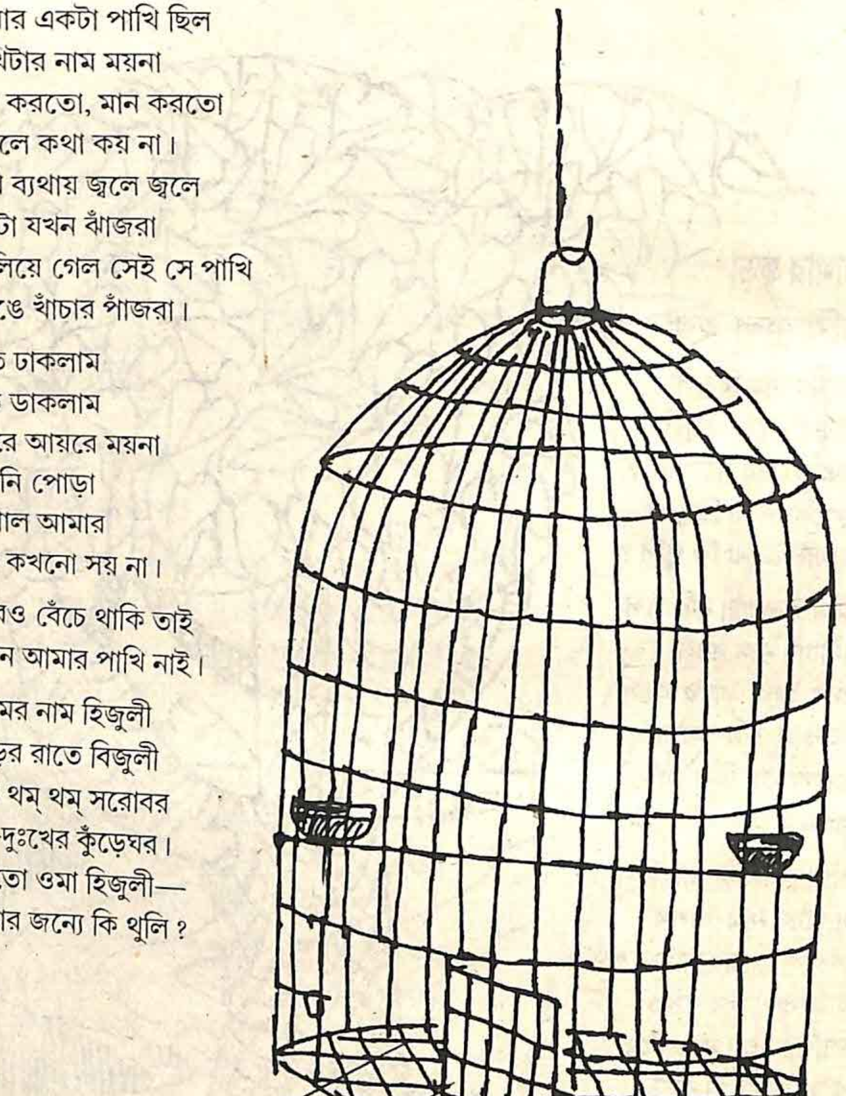
সে মাঠ ছিল আমার
সাত পুরুষের খামার
পুষ মাসে তুষ উড়তো হাওয়ায়
কদর ছিল ধামার
ধামা ধরতে বেহাল এখন
দাদার কিংবা মামার !

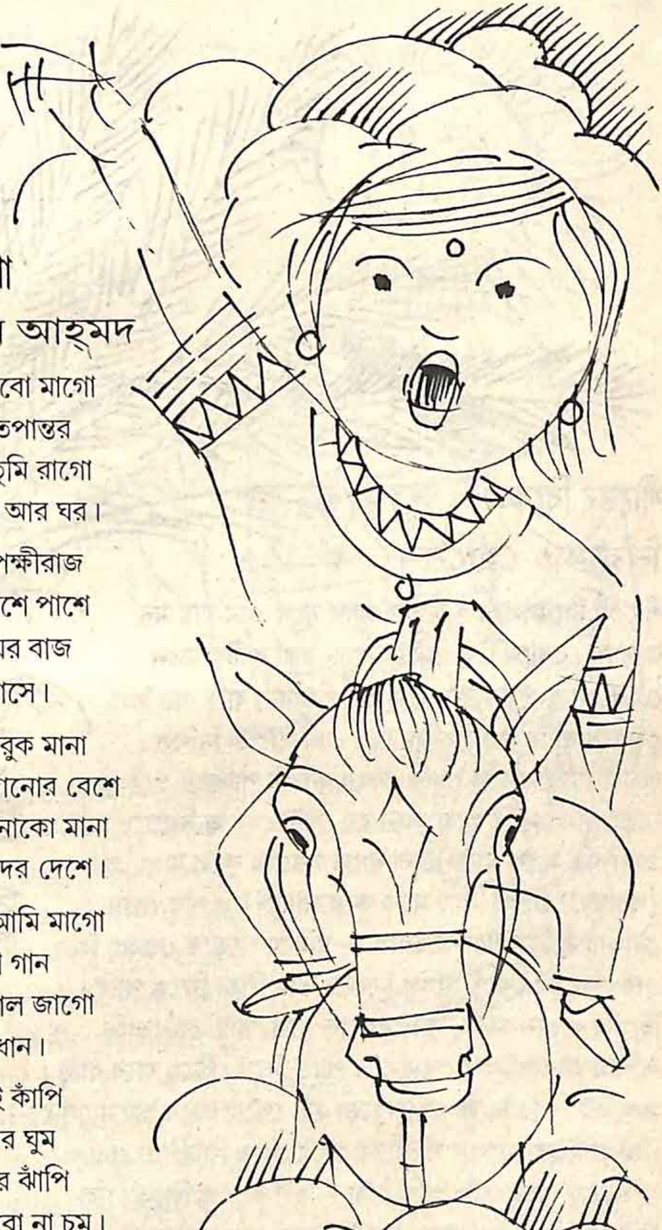
আমার একটা পাখি ছিল
পাখিটার নাম ময়না
গান করতো, মান করতো
রাগলে কথা কয় না।
দুঃখ ব্যথায় জ্বলে জ্বলে
বুকটা যখন ঝাঁজরা
পালিয়ে গেল সেই সে পাখি
ভেঙে খাঁচার পাঁজরা।

ক্ষত ঢাকলাম
কত ডাকলাম
ফিরে আয়রে ময়না
এমনি পোড়া
কপাল আমার
সুখ কখনো সয় না।

মরেও বেঁচে থাকি তাই
এখন আমার পাখি নাই।

গ্রামের নাম হিজুলী
ঝড়ের রাতে বিজুলী
রাত থম্ থম্ সরোবর
সুখ-দুঃখের কুঁড়েঘর।
বল্‌তো ওমা হিজুলী—
আমার জন্যে কি থুলি ?





যাবোই যাবো মাগো

এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ

এবার আমি যাবোই যাবো মাগো
পেরিয়ে সাত সাগর তেপান্তর
আমার উপর যতোই তুমি রাগো
এমন দিনে থাকবো না আর ঘর।

আকাশ নীলে আমার পক্ষীরাজ
ছুটবে বেগে ঝড়ের পাশে পাশে
সামনে পিছে ঘন মেঘের বাজ
জয়ধ্বনি দেবে মা উল্লাসে।

পেছন হতে যে যাই করুক মানা
দেখাক না ভয় দত্যি-দানোর বেশে
আজকে আমি শুনবো নাকো মানা
যাবোই যাবো ঘুমপরীদের দেশে।

সেথায় গিয়ে গাইবো আমি মাগো
তুফান সুরে ঘুমভাঙানী গান
বলবো হেঁকে দস্যু দামাল জাগো
বুলবুলিরা নিচ্ছে লুটে ধান।

নতুন সুরে উঠবে সবাই কাঁপি
ঘুমপরীরা ভুলবে রাতের ঘুম
ছিনিয়ে নিয়ে ঘুমঢুলুনির ঝাঁপি
বলবো হেঁকে আর নেবো না চুম।

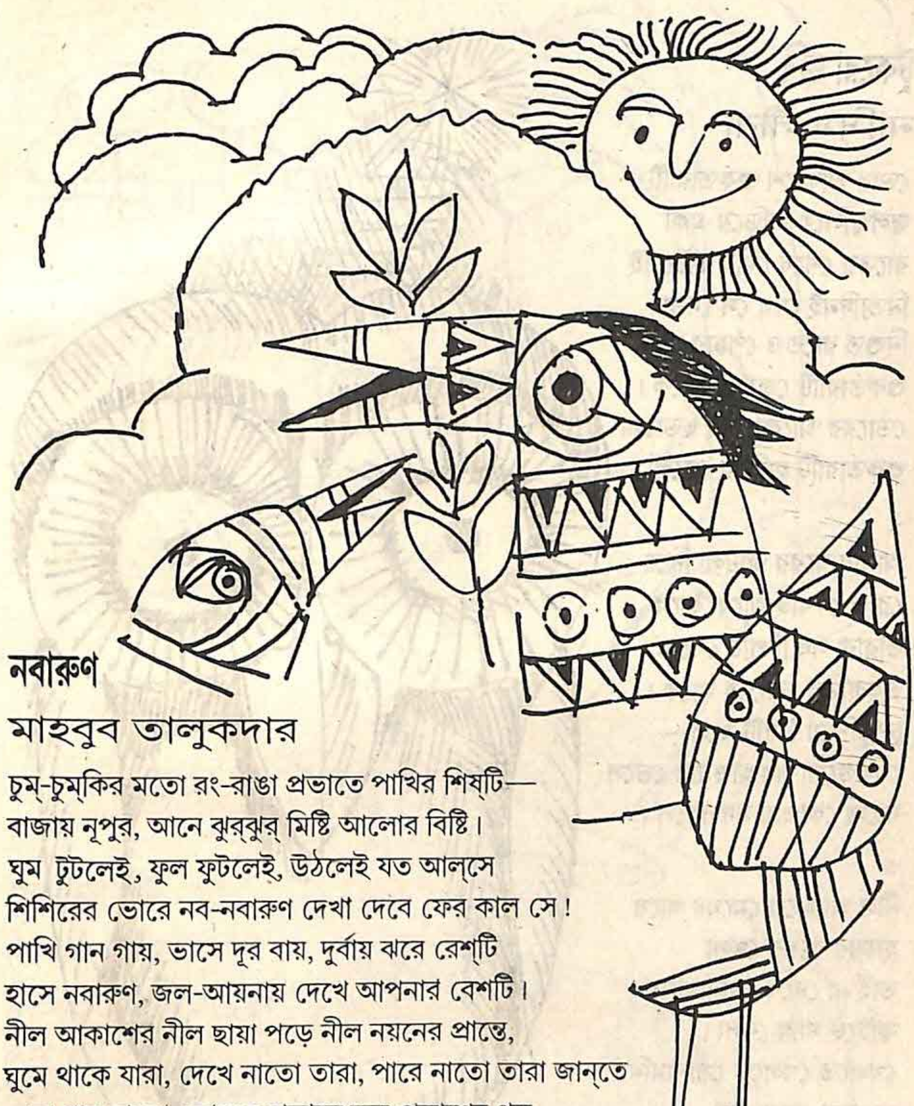
শুনবো না আর ঘুমপাড়ানী ছড়া
গাইবো এবার ঘুমভাঙানী গান
বুলবুলিদের বাঁধবো কষে দড়া
আর দেবো না সোনার আমন ধান।



শীতের বিকেল

নিয়ামত হোসেন

শীতের বিকেলে এক আশ্চর্য মধুর সুখে ভরে যায় মন
আকাশ যেখানে ঠিক বিরাট উপুড়-করা বাটির মতন
ঢেকে আছে পুরো গ্রাম ধানখেত পুষ্করিনী বাড়ি-ঘর বিল
যেখানে ছবির মত সবকিছু স্থির যেন সারাটা নিখিল।
দূরের মাঠের থেকে গোরু ফেরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে ধুলো
নাড়া জ্বালে মাঠে কারা, মনে হয় কেউ যেন জ্বালিয়েছে চুলো।
প্রজাপতি মাঝে মাঝে ডানা নাড়ে সরষের ফুলে বাসা.তার
খেয়াঘাটে নৌকা নিয়ে মাঝি করে সারাদিন এপার ওপার।
নৌকার খুঁটিতে বসে মাছরাঙা—ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারা কি ?
মাষকলায়ের খেতে ছাগল ঢুকেছে তার পিঠে ফিঙে পাখি।
হিমেল বাতাস ছাড়ে, সূর্য যেন বড় ব্যস্ত, তাই তাড়াতাড়ি
পশ্চিম আকাশটুকু কোনোমতে পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যাবে বাড়ি।
সকলেই ফিরে যাচ্ছে ছেলেবুড়ো হাট থেকে ফিরে আসে লোকে
শিমুলগাছের ডালে লক্ষ্মীপ্যাঁচা চেয়ে দেখে পিটপিটে চোখে।
খেজুরের গাছে গাছে হাঁড়ি বাঁধা—ছিল বসে শালিকের দল
কিছুক্ষণ আগে ছিল চারপাশে শিশুদের কল-কোলাহল।
সকলেই ঘরে ফেরে, চোখের নিমেষে যেন সন্ধ্যা হয়ে আসে
মিটিমিটি আলো দেখি ছেঁড়া ফুটো অন্ধকার মলিন আকাশে।
কুয়াশা দখল নেয় মাঠে ঘাটে জনপদে বড় চুপিচুপি
সুবিশাল অন্ধকার জ্বলে ওঠে দু'চারটে ম্রিয়মান কুপি।



নবারুণ

মাহবুব তালুকদার

চুম্-চুম্‌কির মতো রং-রাঙা প্রভাতে পাখির শিষ্‌টি—
বাজায় নূপুর, আনে ঝুর্‌ঝুর্ মিষ্টি আলোর বিষ্টি।
ঘুম টুটলেই, ফুল ফুটলেই, উঠলেই যত আল্‌সে
শিশিরের ভোরে নব-নবারুণ দেখা দেবে ফের কাল সে!
পাখি গান গায়, ভাসে দূর বায়, দুর্বায় ঝরে রেশ্‌টি
হাসে নবারুণ, জল-আয়নায় দেখে আপনার বেশটি।
নীল আকাশের নীল ছায়া পড়ে নীল নয়নের প্রান্তে,
ঘুমে থাকে যারা, দেখে নাতো তারা, পারে নাতো তারা জান্‌তে
তারা পায় নাতো ভোরের বাতাসে ফুল-পলাশের গন্ধ
তারা গাথে নাতো পাতায় পাতায় আগামী আশার ছন্দ।
যারা শুধু মেলে প্রভাতের কোলে কৃষ্ণ-কাজল আঁখিটি।
নবারুণ শুধু তাদের হাতেই বেঁধে দেবে রাঙা-রাখিটি।
এই নবারুণ ঢালে রং-খুন, রাঙে আকাশের সীমানা
এই নবারুণ ফুলের ফাগুন হাসালেই আর কি মানা!
এই নবারুণ ডানা যদি মেলে পাখ্-পাখালির সভাতে ;
মেলুক মেলুক,—রাঙা টুকটুক নতুন দিনের প্রভাতে।

টুকরো ছবি

নাসিম লীনা

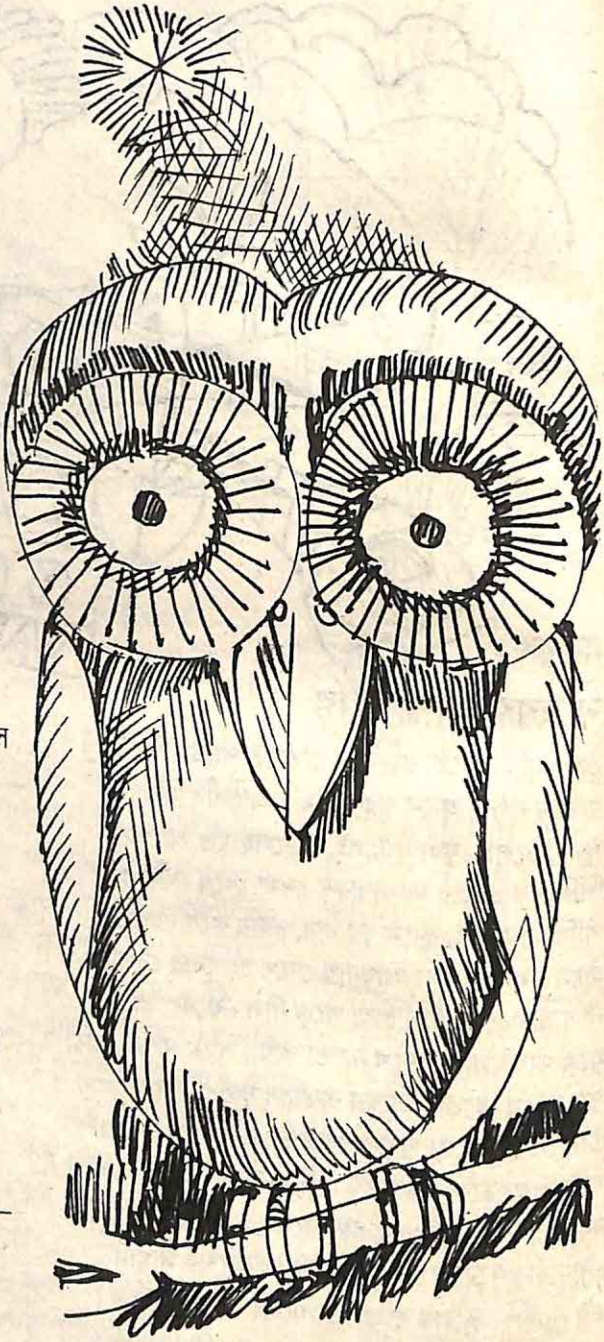
ভোর আকাশে শুকতারাটি
জ্বলজ্বলিয়ে দাঁড়িয়ে একা
রাতের শেষে ঘোর কাটলেই
নিত্যদিনই দেয় সে দেখা।
নিশুত রাতেও পেঁচার ডাকে
শুকতারাটি জেগেই থাকে।
ভোরের আলো যেই ছড়ালো
শুকতারাটি হারিয়ে গেলো।

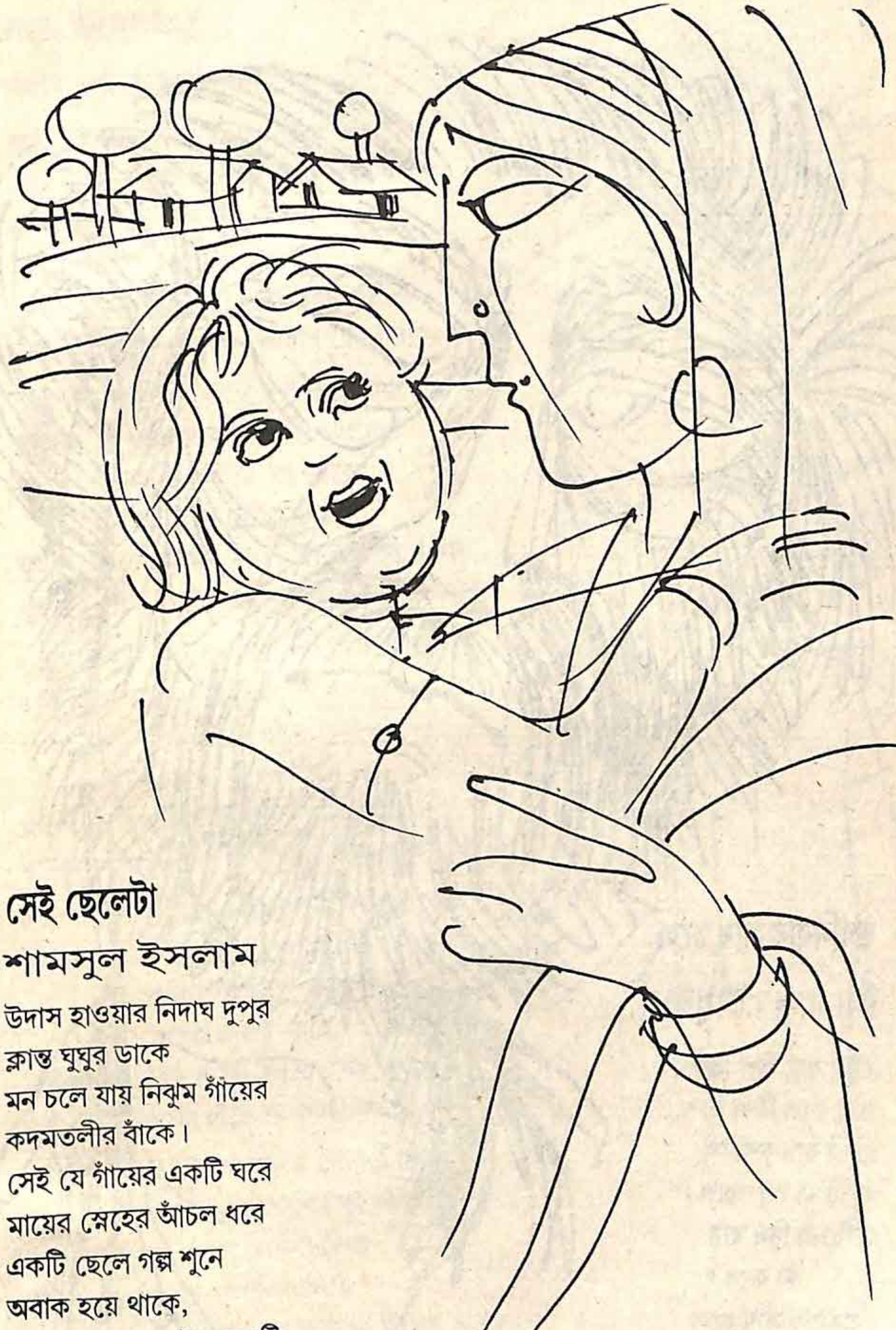
২

আমার ঘরের জানলা দিয়ে
রোজ দেখছি ঝাঁকে ঝাঁকে
তারারা সব টিপটি সেজে
ভররাত্তির জেগেই থাকে।
চুপচুপিয়ে চাঁদটি বলে—
মেঘগুলো সব হাওয়ায় ভেসে
যাচ্ছে কোথায় সদলবলে?

৩

নীল আকাশে মেঘের গায়ে
হাজার রঙের খেলা
তাই না দেখে সোনামনির
কাটছে সারা বেলা।
খেলতে খেলতে সোনামনির
নামলো চোখে ঘুম
ঘুমপরীরা সোনার চোখে
দিলেন হাজার চুম।
ঘুমটা ভেঙে, জেগেই বলে—
ঘুমপরীরা কই?
মেঘের বুকে ঘুমপরীরা
হারিয়ে গেছে ঐ।

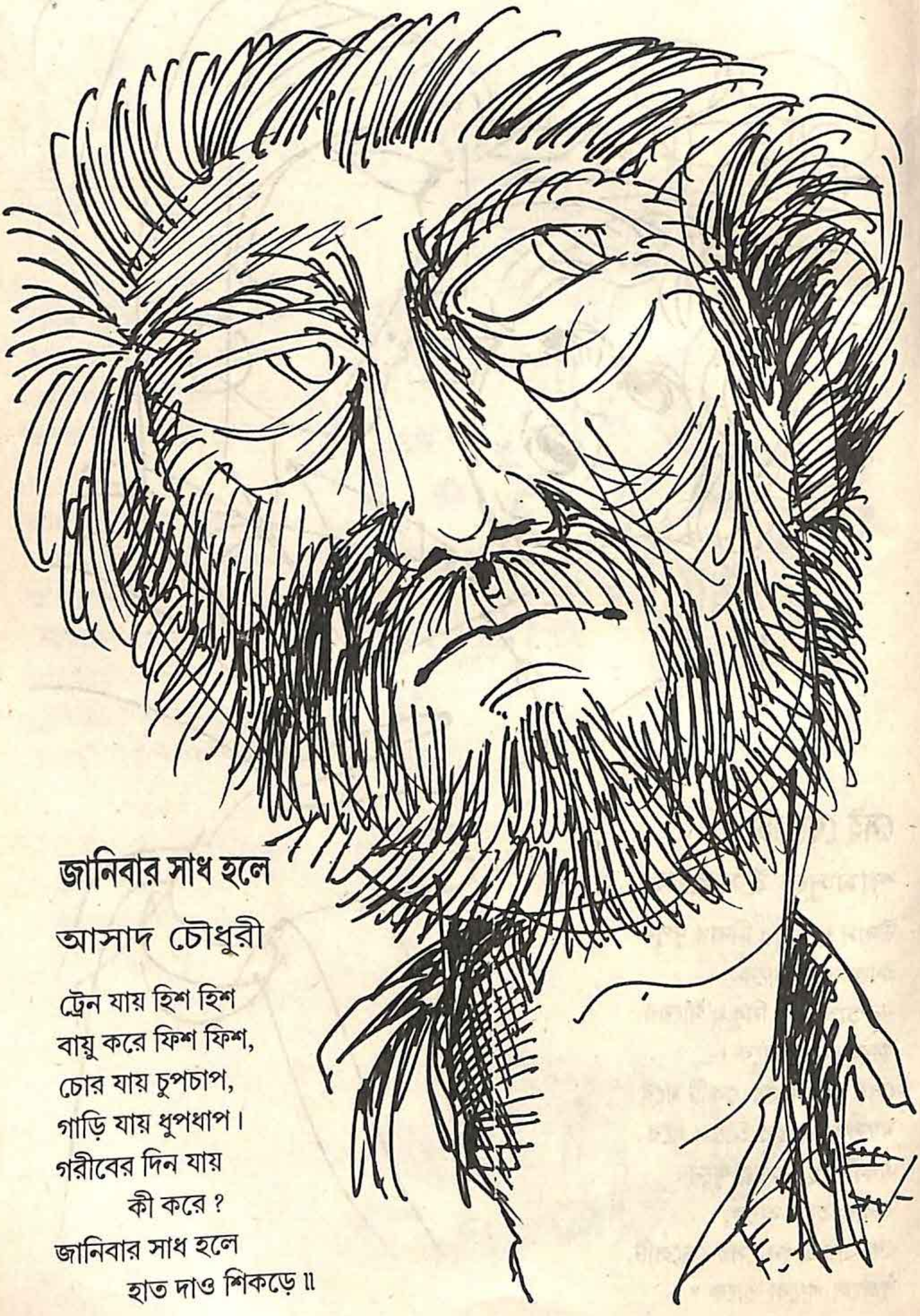




সেই ছেলেটা

শামসুল ইসলাম

উদাস হাওয়ার নিদাঘ দুপুর
ক্লান্ত ঘুঘুর ডাকে
মন চলে যায় নিঝুম গাঁয়ের
কদমতলীর বাঁকে।
সেই যে গাঁয়ের একটি ঘরে
মায়ের স্নেহের আঁচল ধরে
একটি ছেলে গল্প শুনে
অবাক হয়ে থাকে,
কোথায় এখন সেই ছেলেটি,
খুঁজলে পাবো তাকে ?



জানিবার সাধ হলে

আসাদ চৌধুরী

ট্রেন যায় হিশ হিশ
বায়ু করে ফিশ ফিশ,
চোর যায় চুপচাপ,
গাড়ি যায় ধুপধাপ।
গরীবের দিন যায়
কী করে?
জানিবার সাধ হলে
হাত দাও শিকড়ে॥

নতুন দিনের আলো

আবু কায়সার

রাত পোহালে শহর জাগে, সকল মহল্লায়
মধুর সুরে মোয়াজ্জিনের আজান শোনা যায়
উধাও হলো ঘুমের পরী
আঁচলে তার জ্বলছে জরি
একে একে নিভছে বাতি সমস্ত রাস্তায়—
আলোর ধারে বারেবারে আঁধার কেটে যায়।

ধীরে ধীরে উঠছে জেগে স্বপ্ন-শহর ঢাকা
পড়ছে খুলে যাদুকরের মায়াবী আংরাখা
উড়োজাহাজ উঠলো ডেকে
রেলের গাড়ি থেকে থেকে
ফুঁস্‌তে থাকে, যেমন মানুষ পেলেই গিলে খায়;
রেলের পেটেই মানুষগুলো ফেরে আপন গাঁয়!

পুব আকাশে উঠলো জ্বলে সূর্য মনোলোভা
চকচকে এক সোনার টাকা, কী অপরূপ শোভা
নিওনগুলি ধীরে ধীরে
যাচ্ছে নিভে, আসে ফিরে
মানুষ, পাখি মোটর গাড়ির শব্দ এবং ভীড়
খানিক পরেই উঠবে জেগে বুড়ীগঙ্গার তীর।

শহর বটে তবু হেথায় ইলেকট্রিকের পোলে
মিঠে গলায় ঠুংরি গেয়ে দোয়েল-শ্যামা দোলে
গাঁয়ের মতোই গাছে গাছে
কাঠঠোক্‌রা কথক-নাচে
নদীর ঘাটে মাঝিরা সব মন পবনের নায়
দুলে দুলে ছইয়ের নীচে সারিন্দা বাজায়।

রাত পোহালে মোরগ বলেঃ সোনার খোকাখুকু
তোমরা সবাই জাগো; চোখের ঘুমেল পরশটুকু
মোছো, এবার জান্‌লা দিয়ে
শতেক শুভ-আশিস নিয়ে
দ্যাখো, তোমায় খুঁজে বেড়ায় নতুন দিনের আলো
কলের বাতি নিভিয়ে দিয়ে মনের বাতি জ্বালো।





সেই কবিতাটি লেখা হয় নাই

মহাদেব সাহা

সেই কবিতাটি লেখা হয় নাই
লিখবেন কোনো কবি
সেই কবিতাটি কবিতা তো নয়
মুজিবের মুখচ্ছবি।
সেই কবিতাটি লেখা হবে ঠিক
কালি ও কাগজে নয়
হৃদয়ে হৃদয়ে লেখা হবে সেই
অমর পঙক্তিচয়।
সেই কবিতাটি পড়বে দাঁড়িয়ে
মানুষের সাথে পাখি
সেই কবিতাটি শাপলা গোলাপ
দীঘিরও পদ্ম নাকি ?
সেই কবিতাটি লেখা হয় নাই
লিখবেন এক কবি,
হয়তো তা কোনো কবিতাই নয়
একটি মুখের ছবি !
সেই কবিতাটি পড়া হবে ঠিক
বাংলার ঘরে ঘরে।
সেই কবিতাটি দু'ফোঁটা অশ্রু
মানুষের অন্তরে !

বিষ্টি

নির্মলেন্দু গুণ

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
বাতাস জুড়ে বিষ্টি,
গাছের পাতা কাঁপছে আহা
দেখতে কি যে মিষ্টি।
কলাপাতার বিষ্টি বাজে
ঝুমুর নাচে নর্তকী,
বিষ্টি ছাড়া গাছের পাতা
এমন তালে নড়ত কি ?
চিলেকোঠায় ভেজা শালিখ
আপন মনে সাজ করে,
চঞ্চু দিয়ে গায়ের ভেজা
পালকগুলি ভাঁজ করে।
হাঁসেরা সব সদলবলে
উদাস করা দিষ্টিতে
উঠানটাকে পুকুর ভেবে
সাঁতার কাটে বিষ্টিতে।
আকাশ এতো কাঁদছে কেন
কেউ কি তাকে গাল দিলো ?
ছিচকাঁদুনে মেঘের সাথে
গাছগুলি কি তাল দিলো ?
সকাল গেল দুপুর গেল—
বিকেল হয়ে এল কী ?
আচ্ছা মাগো তুমিই বলো
মেঘেরা আজ পেলো কি ?
তুমি তোমার সখের শাড়ি
সাজিয়ে রাখো আনলাতে,
আমি কেবল দু'চোখ মেলে
তাকিয়ে থাকি জানালাতে।
আকাশ দেখি বিষ্টি দেখি
দেখি আমার চোখের জল
নিচে দূরের আকাশ পথে
যাচ্ছে ভেসে মেঘের দল





ছুটি

আখতার হুসেন



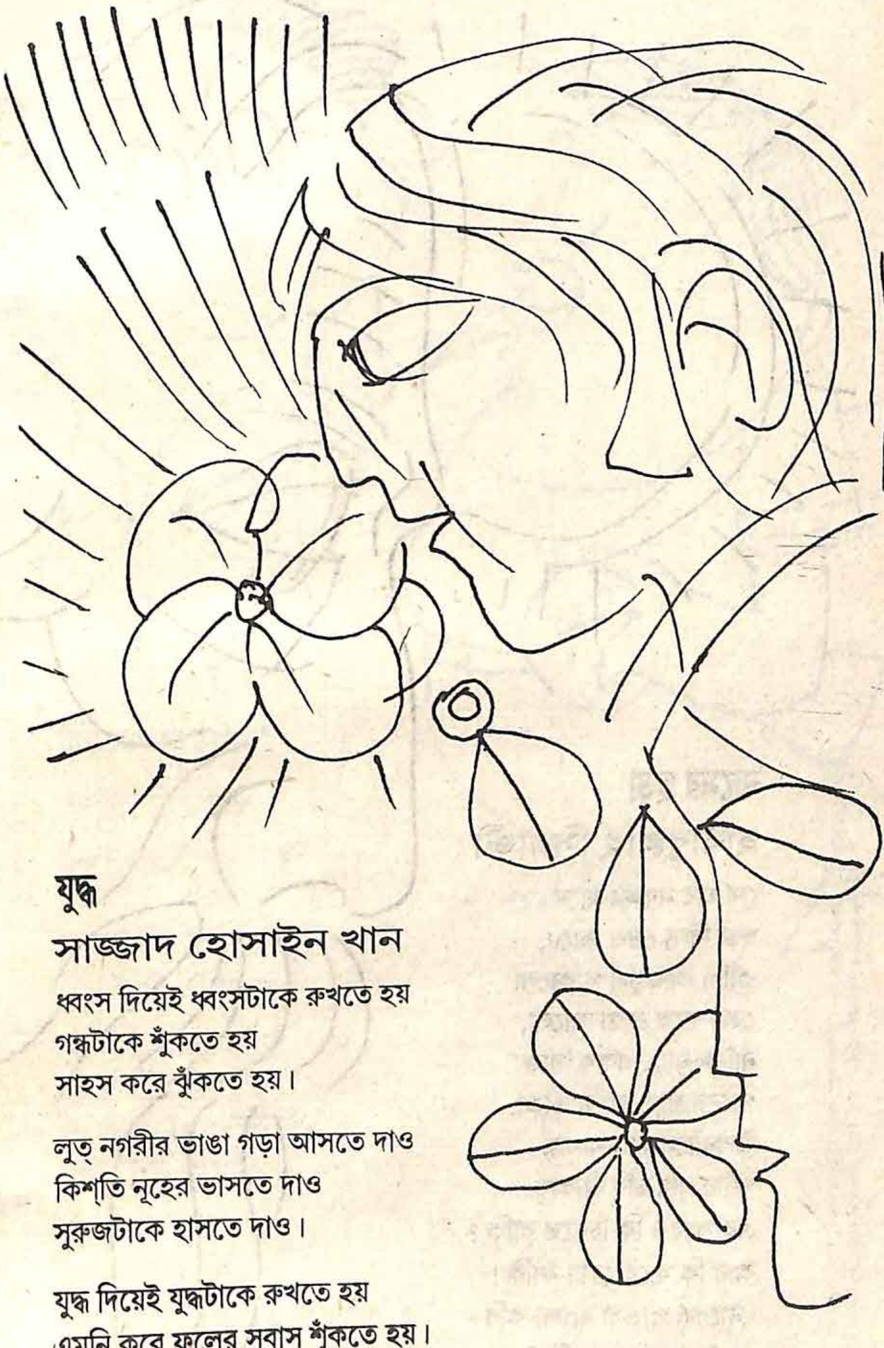
ছুটি ! ছুটি ! ছুটি !
আজকের মত হোল
পাঠশালা ছুটি,
বই-খাতা রেখে দিয়ে
তাই হুটোপুটি।

আকাশের মেঘ হয়ে
ভেসে চলি কেউ
লাল, নীল, পরী হই
চঞ্চল ঢেউ।

প্রজাপতি সেজে উড়ে
ফুলবনে যাই
পাখি হয়ে সুরে সুরে
শুধু গান গাই।

ফুরফুরে ডানা মেলে
উড়ে যাই দূরে,
নিমেষেই আসি সারা
পৃথিবীটা ঘুরে।

সূর্যের মতো কেউ
হেসে কুটিকুটি,
আজকের মতো হোল
পাঠশালা ছুটি !



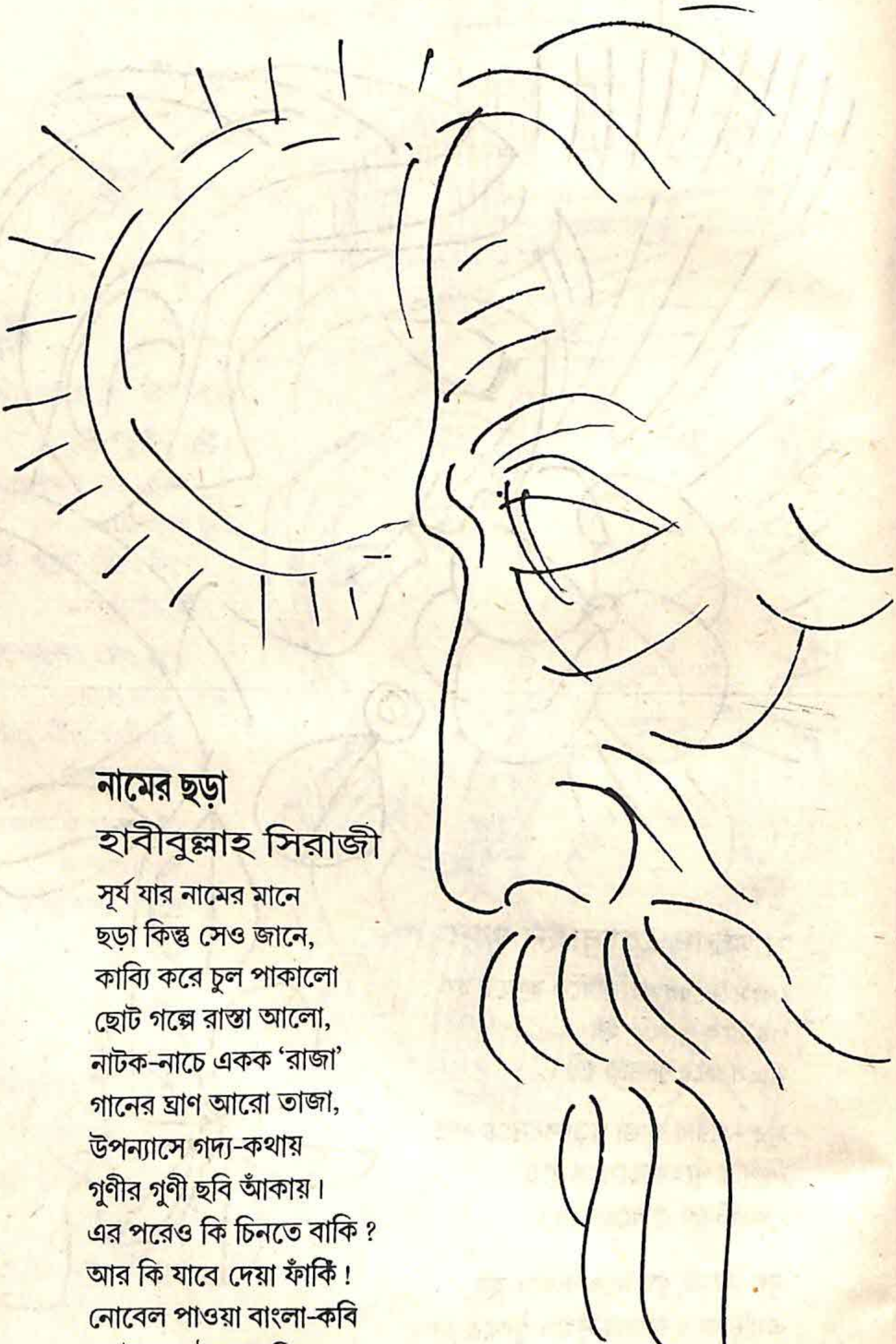
যুদ্ধ

সাজ্জাদ হোসাইন খান

ধ্বংস দিয়েই ধ্বংসটাকে রুখতে হয়
গন্ধটাকে শুঁকতে হয়
সাহস করে ঝুঁকতে হয়।

লুত্ নগরীর ভাঙা গড়া আসতে দাও
কিশ্‌তি নূহের ভাসতে দাও
সুরুজটাকে হাসতে দাও।

যুদ্ধ দিয়েই যুদ্ধটাকে রুখতে হয়
এমনি করে ফুলের সুবাস শুঁকতে হয়।



নামের ছড়া

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

সূর্য যার নামের মানে
ছড়া কিন্তু সেও জানে,
কাব্যি করে চুল পাকালো
ছোট গল্পে রাস্তা আলো,
নাটক-নাচে একক 'রাজা'
গানের ঘ্রাণ আরো তাজা,
উপন্যাসে গদ্য-কথায়
গুণীর গুণী ছবি আঁকায়।
এর পরেও কি চিনতে বাকি ?
আর কি যাবে দেয়া ফাঁকি !
নোবেল পাওয়া বাংলা-কবি
একই নাম ঠাকুর রবি।



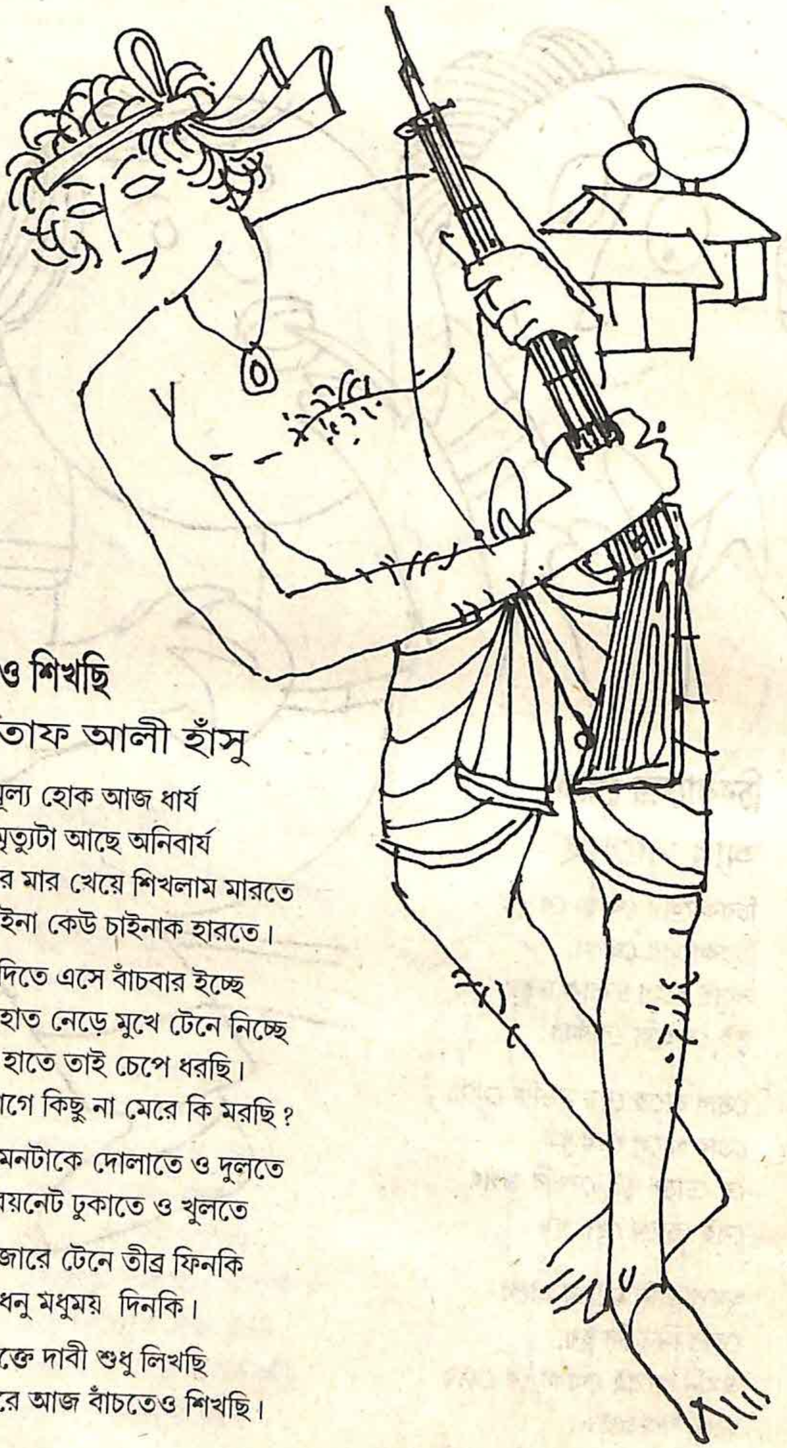
চিরকালের খোকা

আবু সালেহ

চিরকালের খোকা রে তুই
চিরকালের খোকা,
সবাই হলো চালাক চতুর
তুই যে হলি বোকা।

তোর হাতে দেয় মুড়কি মোয়া
তোর গালে দেয় চুম,
যে চোখে তুই দেখবি জগৎ
সেই চোখে দেয় ঘুম।

ঘুমপাড়ানি মাসির সাথে
তোর মিতালি হয়,
এমনি করেই খোকা রে তোর
হচ্ছে পরাজয়।



বাঁচতেও শিখছি

আলতাফ আলী হাঁসু

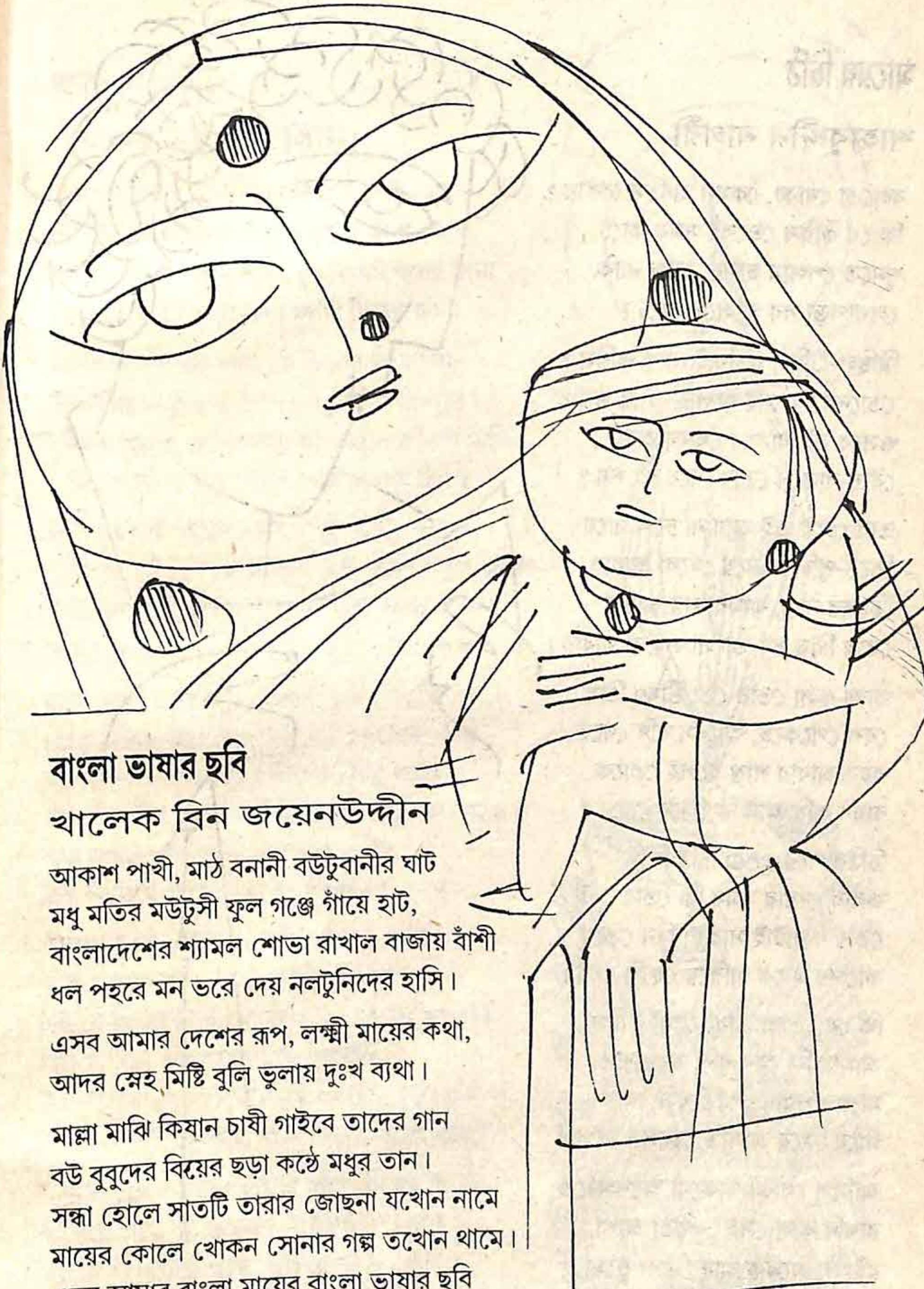
রক্তের মূল্য হোক আজ ধার্য
ধরলাম মৃত্যুটা আছে অনিবার্য
বারে বারে মার খেয়ে শিখলাম মারতে
মরতে চাইনা কেউ চাইনাক হারতে।

জীবনটা দিতে এসে বাঁচবার ইচ্ছে
কামানটা হাত নেড়ে মুখে টেনে নিচ্ছে
অস্ত্র শক্ত হাতে তাই চেপে ধরছি।
মরবার আগে কিছু না মেরে কি মরছি?

শিখিনিক মনটাকে দোলাতে ও দুলতে
শিখেছি বেয়নেট ঢুকাতে ও খুলতে

খুললেই জোরে টেনে তীব্র ফিনকি
রক্তের রঙধনু মধুময় দিনকি।

এতকাল রক্তে দাবী শুধু লিখছি
শত্রুকে মেরে আজ বাঁচতেও শিখছি।



বাংলা ভাষার ছবি

খালেক বিন জয়েনউদ্দীন

আকাশ পাখী, মাঠ বনানী বউটুবানীর ঘাট
মধু মতির মউটুসী ফুল গঞ্জে গাঁয়ে হাট,
বাংলাদেশের শ্যামল শোভা রাখাল বাজায় বাঁশী
ধল পহরে মন ভরে দেয় নলটুনিদের হাসি।

এসব আমার দেশের রূপ, লক্ষ্মী মায়ের কথা,
আদর স্নেহ মিষ্টি বুলি ভুলায় দুঃখ ব্যথা।

মাল্লা মাঝি কিষান চাষী গাইবে তাদের গান
বউ বুবুদের বিয়ের ছড়া কণ্ঠে মধুর তান।
সন্ধ্যা হোলে সাতটি তারার জোছনা যখোন নামে
মায়ের কোলে খোকন সোনার গল্প তখোন থামে।
এসব আমার বাংলা মায়ের বাংলা ভাষার ছবি
এমন মায়ের এমন ভাষায় আমরা সবাই কবি।

মায়ের চিঠি

শাহাবুদ্দীন নাগরী



বল্‌তো খোকা, কেমন আছিস ঢাকায় ?
কি যে করিস ভেবেই সময় কাটে,
শুনতে পেলাম ছাত্ররা আজ নাকি
লেখাপড়া সব তুলেছে লাটে ?

মিছিল-টিছিল তোরাই নাকি করিস ?
তোদের কি নেই বুলেট-গুলীর ভয় ?
ওসবে তুই যাসনে খোকা আর
রৌদ্র-বাতাস তোর গায়ে কি সয় ?

তার চেয়ে তুই আয় না চলে গাঁয়ে
পিঠে-পুলি বানিয়ে দেবো আবার,
তিলের নাড়ু, কামরাঙার আচার
তোর প্রিয় সব ভালো ভালো খাবার।

পাকা কলা তোর তো ভীষণ প্রিয়
বেশ পেকেছে, আসিস যদি খেতে,
শহর আবার শান্ত হলেই তোকে
বারণ করি আর কি ফিরে যেতে ?

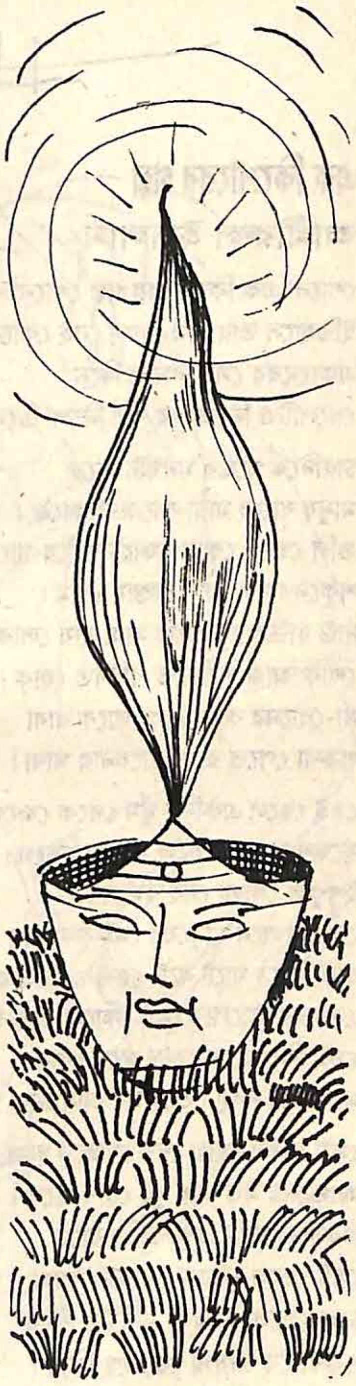
চিঠির পরে এত্তো চিঠি লিখি
জবাব দেবার সময় কি তোর নেই ?
তোর কথাটাই সারাটা দিন ভেবে
কাজের মাঝে হারিয়ে ফেলি খেই।

কি যে তোরা ভাষা-ভাষা করিস
আমরা কি আর বুঝি অতোশত,
মায়ের পরাণ বুঝতি যদি খোকা
গাঁয়ে ফিরে আস্‌তি ছেলের মতো।

আসিস্‌ খোকা থাকবো অপেক্ষাতে
রাখবি কথা সেই টুকুতো আশা,
রইলো অনেক আদর এবং চুমো
আকাশ ছোঁয়া প্রাণের ভালোবাসা।

আলোর পিদিম

লুৎফর রহমান রিটন



এক যে ছিলো ঝাঁকড়া চুলের শান্তশিষ্ট ছেলে
নীল আকাশে সবুজ বনে উড়তো ডানা মেলে
বলতে পারো পরী সে নয় কোথায় পেলো ডানা
কিন্তু ছেলের ডানার কথা সবার ছিলো জানা।

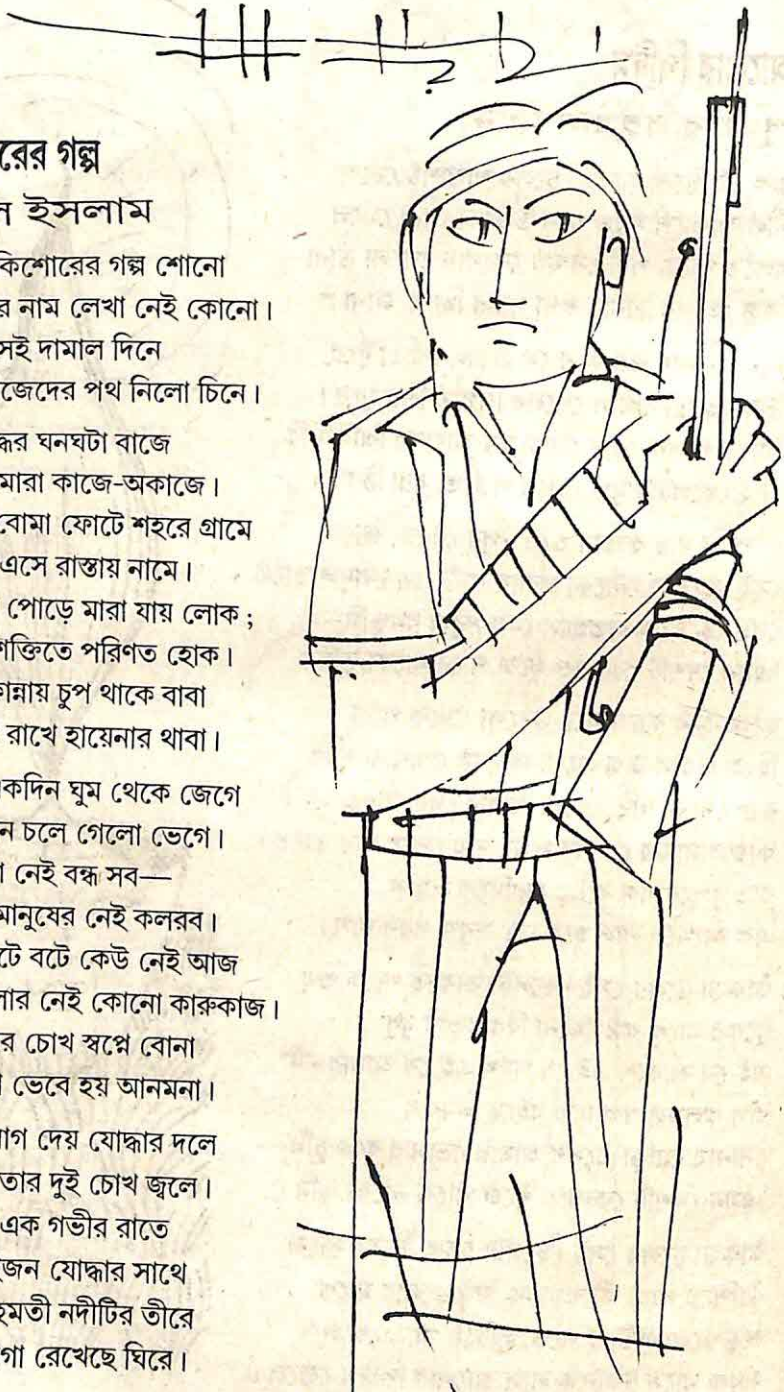
মনের ডানায় ভর করে সে উড়াল দিতো দূরে
উদাস হতো রাখাল ছেলের স্নিগ্ধ বাঁশির সুরে।
পাখির পালক রোদ লেগে হয় আলোর ঝিকিমিকি
সেই ছেলেটার মুগ্ধ চোখে পড়তো ধরা ঠিকই।

রূপোলি মাছ ঝলসে ওঠে দুপুর রোদে, জালে
সেই ছেলেটা নৌকো চালায় ঢেউ-এর দোদুল তালে
সেই ছেলেকে হাতছানি দেয় সবুজ বনভূমি—
'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।'

হঠাৎ করে করুণ সুরে উঠলো ডেকে পাখি
হিংস্র ভয়াল জন্তু এলো জড়িয়ে পোশাক খাকি
রক্ত খেঁকো দত্যি এলো আঁধার ঘেরা রাতে
কাজল মাটির দেশের মানুষ ভয় পেয়ে যায় তাতে।
রাত দুপুরে শব্দ বুটের চারদিকে সন্ত্রাস
এক নিমেষে লাল হয়ে যায় সবুজ বরণ ঘাস।

ঝাঁকড়া চুলের সেই ছেলেটা ভাবতে থাকে শুধু
বুকের মাঝে কষ্ট যেনো বিরাণভূমি ধুধু
এই যে আকাশ এই যে পাখি এই যে আমার নদী
রূপ ঝলমল স্বপ্ন হয়ে বইছে নিরবধি
সোনায় মোড়া এদেশ আমার তোমার বুকে চুমি—
'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবো নাকো তুমি।'

ঝাঁকড়া চুলের সেই ছেলেটা হঠাৎ বীরের সাজে
ঝাঁপিয়ে পড়ে কী ভয়ানক জন্তুগুলোর মাঝে
জন্তুগুলো লুটিয়ে পড়ে, লুটিয়ে পড়ে ছেলে
সবুজ ঘাসে টুকটুকে লাল আলোর পিদিম জ্বেলে।



এক কিশোরের গল্প

আমীরুল ইসলাম

শোনো এক কিশোরের গল্প শোনো
ইতিহাসে তার নাম লেখা নেই কোনো।
একাত্তরের সেই দামাল দিনে
ছেলেটিও নিজেদের পথ নিলো চিনে।

চারদিকে যুদ্ধের ঘনঘটা বাজে
মানুষ যাচ্ছে মারা কাজে-অকাজে।
গুলি ছোটে বোমা ফোটে শহরে গ্রামে
শকুনের দল এসে রাস্তায় নামে।
দাউ দাউ ঘর পোড়ে মারা যায় লোক ;
শোক আজ শক্তিতে পরিণত হোক।
মা-বোনের কান্নায় চুপ থাকে বাবা
শত্রুরা পেতে রাখে হায়েনার থাবা।

সেই ছেলে একদিন ঘুম থেকে জেগে
যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলো ভেগে।
ইশকুল খোলা নেই বন্ধ সব—
কোনোখানে মানুষের নেই কলরব।
হাটে মাঠে ঘাটে বটে কেউ নেই আজ
ভোরের আলোর নেই কোনো কারুকাজ।
সেই কিশোরের চোখ স্বপ্নে বোনা
মা-বাবার কথা ভেবে হয় আনমনা।

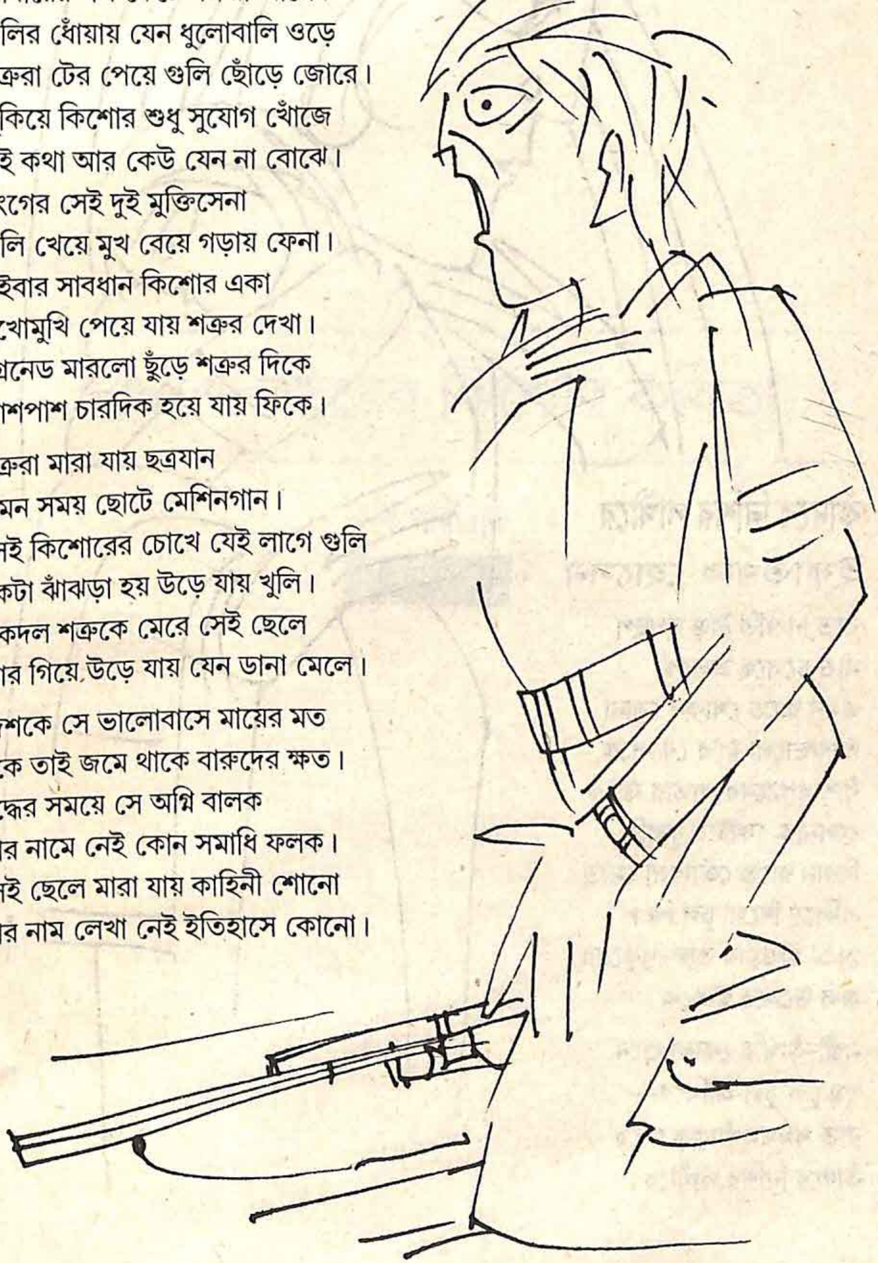
সেই ছেলে যোগ দেয় যোদ্ধার দলে
আগুনের মত তার দুই চোখ জ্বলে।
একদিন কোন এক গভীর রাতে
সেই ছেলে দুইজন যোদ্ধার সাথে
চলে গেলো রহমতী নদীটির তীরে
শত্রুরা যে জায়গা রেখেছে ঘিরে।

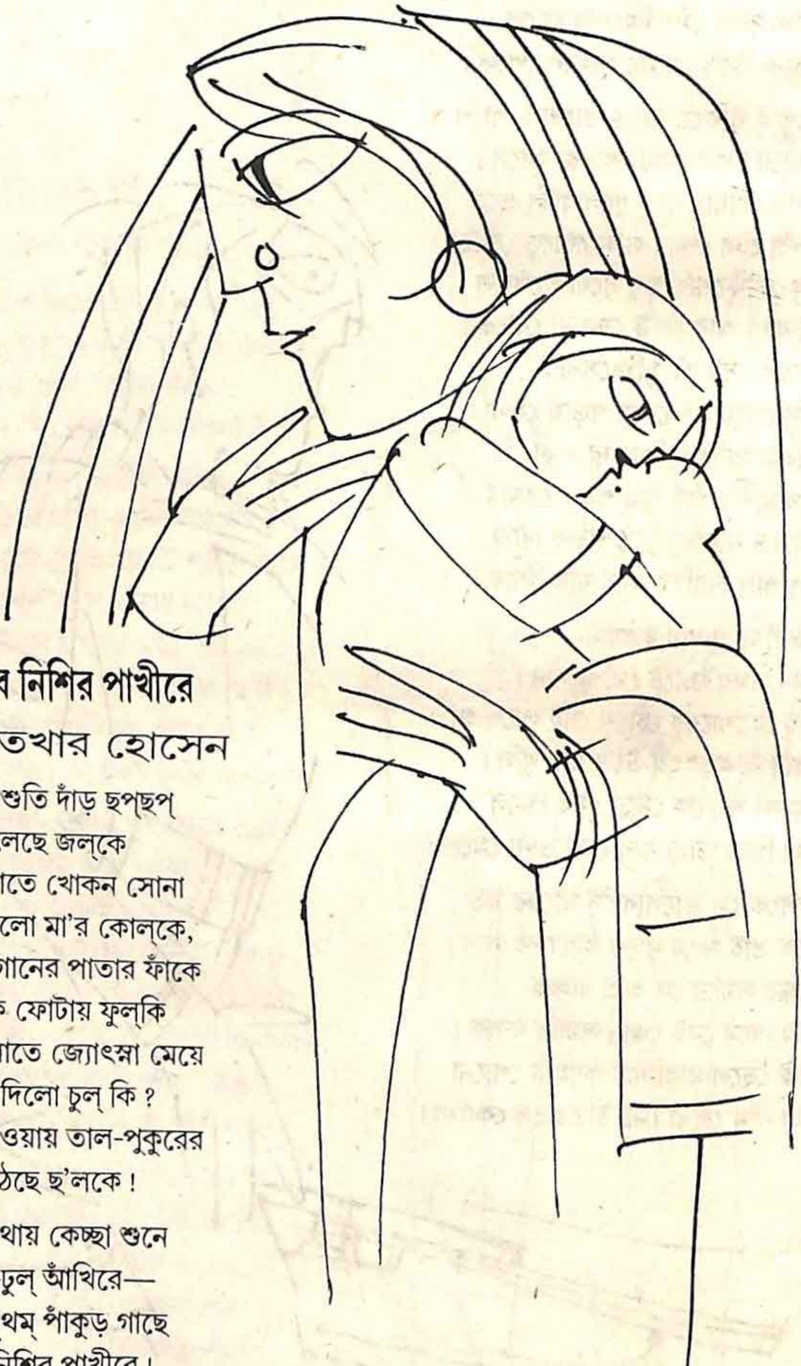
দামাল দুরন্ত সেই কিশোর ছেলে
শত্রুকে ছিঁড়ে খেতো সামনে পেলে।

কিশোর লুকিয়ে থাকে তাদেরই পাশে
আঁধারের পথ কেটে শত্রুরা আসে।
গুলির ধোঁয়ায় যেন ধুলোবালি ওড়ে
শত্রুরা টের পেয়ে গুলি ছোঁড়ে জোরে।
লুকিয়ে কিশোর শুধু সুযোগ খোঁজে
এই কথা আর কেউ যেন না বোঝে।
সংগের সেই দুই মুক্তিসেনা
গুলি খেয়ে মুখ বেয়ে গড়ায় ফেনা।
এইবার সাবধান কিশোর একা
মুখোমুখি পেয়ে যায় শত্রুর দেখা।
গ্রেনেড মারলো ছুঁড়ে শত্রুর দিকে
আশপাশ চারদিক হয়ে যায় ফিকে।

শত্রুরা মারা যায় ছত্রযান
এমন সময় ছোটে মেশিনগান।
সেই কিশোরের চোখে যেই লাগে গুলি
বুকটা ঝাঁঝড়া হয় উড়ে যায় খুলি।
একদল শত্রুকে মেরে সেই ছেলে
আর গিয়ে উড়ে যায় যেন ডানা মেলে।

দেশকে সে ভালোবাসে মায়ের মত
বুকে তাই জমে থাকে বারুদের ক্ষত।
যুদ্ধের সময়ে সে অগ্নি বালক
তার নামে নেই কোন সমাধি ফলক।
সেই ছেলে মারা যায় কাহিনী শোনো
তার নাম লেখা নেই ইতিহাসে কোনো।





কাঁদবে নিশির পাখীরে

ইফাতখার হোসেন

রাত নিশুতি দাঁড় ছপ্ছপ্
নাও চলেছে জল্কে
এমন রাতে খোকন সোনা
আঁকড়ালো মা'র কোল্কে,
বাঁশ বাগানের পাতার ফাঁকে
জোনাক ফোটায় ফুল্কি
বিরান রাতে জ্যোৎস্না মেয়ে
এলিয়ে দিলো চুল্ কি ?
ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাল-পুকুরের
জল উঠেছে ছ'লকে !

নক্সী-কাঁথায় কেচ্ছা শুনে
ঘুম ঢুল্-ঢুল্ আঁখিরে—
রাত থম্থম্ পাঁকুড় গাছে
কাঁদবে নিশির পাখীরে।

পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা

কবি-পরিচিতি

কৃত্তিবাস ওঝা। জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ (সম্ভবত ১৩৮৬-৯৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে)। বাল্মিকী রামায়ণের মূল কাহিনী অনুসরণ করে তিনি বাংলা ভাষায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। কিন্তু এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে লেখা ভারানুবাদ বলা চলে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজও বাংলার ঘরে ঘরে আদৃত, সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সমান জনপ্রিয়। ফুলিয়ার কৃত্তিবাস কবিকে মাইকেল মধুসূদন বলেছেন—এ বঙ্গের অলংকার।

মালাধর বসু। প্রাক্-চৈতন্য যুগের অন্যতম কবি। জন্মস্থান ঃ বর্ধমানের কুলীন গ্রাম। পিতার নাম ভগীরথ, মায়ের নাম ইন্দুমতী। তিনি ভাগবতের প্রথম অনুবাদক। চৈতন্যদেবের জন্মের কয়েক বছর আগে ভাগবতের দুই স্কন্ধের (১০ম-১১শ) সরল অনুবাদ করে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন। রচনা কাল ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রীঃ অব্দ। ঐ সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দিন বরবক শাহ। সম্ভবত তিনিই কবিকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দেন।

বিজয় গুপ্ত। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ঃ ফুল্লশ্রী (বর্তমান গৈলা গ্রাম, বরিশাল) পিতার নাম সনাতন মায়ের নাম রুক্মিণী। কবি মনসা-মঙ্গল (পদ্মপুরাণ) রচনা করেন। খুব সম্ভব হুশেন শাহর সিংহাসন লাভের পর ১৪৯৪ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্য রচিত হয়।

বৃন্দাবন দাস। অনুমান ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই চৈতন্যভক্ত কবির জন্ম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে 'নারায়ণীর নন্দন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি জীবনীকাব্য চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্য লীলার ব্যাস' বলে সম্মানিত কবি দেনুর গ্রামে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

জ্ঞানদাস। জন্ম : ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দ। জন্মস্থান ঃ কাঁদড়া, বর্ধমান। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। জ্ঞানদাস ও জ্ঞান—দুই ভণিতায় প্রায় ৪০০ পদ পাওয়া গেছে।

দ্বিজমাধব। জন্ম ঃ ষোড়শ শতাব্দী। জন্মস্থান হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম। পরে চট্টগ্রামের অধিবাসী। চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম সার্থক কবি দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য। তাঁর কাব্যের নাম সারদামঙ্গল বা মঙ্গলচণ্ডীর গীত। রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রীঃ অব্দ।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দী। জন্মস্থান দামুন্যা। পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং মাতা দৈবকী। মুকুন্দরাম মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের কবি-শ্রেষ্ঠ। তিনি চণ্ডীমঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। তাঁর কাব্য অভয়ামঙ্গল নামে পরিচিত

কাশীরাম দাস। আবির্ভাব কাল ঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সিঙ্গিগ্রাম। পিতার নাম ঃ কমলাকান্ত। তাঁদের উপাধি ছিল 'দেব'। মহাভারত-অনুবাদকদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। কাশীদাসী মহাভারত এক মৌলিক সৃষ্টি।

দৌলত কাজী। কবির বিস্তারিত জীবনকথা জানা যায় না। জন্মস্থান সুলতানপুর, চট্টগ্রাম। আরাকানের রাজা সুধর্মার রাজসভায় তিনি সম্মানের আসন লাভ করেন। 'লোর চন্দ্রানী' বা 'সতী ময়না' কাজী রচিত আখ্যান কাব্য। তবে তিনি ঐ কাব্যের দুই-তৃতীয়াংশ রচনা করেন।

সৈয়দ আলাওল। জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর শেষে। জন্মস্থান ঃ চট্টগ্রাম। আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আশ্রয়ে তিনি পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। পরে দৌলত কাজীর অসমাপ্ত 'লোর চন্দ্রানী' বা 'সতী ময়না' কাব্য সম্পূর্ণ করেন (১৬৫৯)। ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে কবির মৃত্যু হয়।

ঘনরাম চক্রবর্তী। জন্ম ১৬৬৯ খ্রীঃ অব্দ। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রাম। তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা সীতাদেবী। ধর্মমঙ্গল ছাড়াও ঘনরাম রচিত কাব্যের নাম শ্রীধর্ম সঙ্গীত ও অনাদি মঙ্গল। রচনাকাল ঃ ১৭১১ খ্রীঃ অব্দ।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য। জন্ম ১৬৭৭ খ্রীঃ অব্দ। জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রাম। রামেশ্বর রচিত শিবায়ন কাব্য—শিবসংকীর্তন। এ ছাড়া সত্যপীরের ব্রতকথা, শীতলামঙ্গল ও সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। ১৭৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্র রায়। জন্ম ১৭০৫-১১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে। মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দ। জন্মস্থান পেঁড়ো, ভুরশুট পরগণা, হাওড়া-হুগলী জেলা। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। রচিত কাব্য—অন্নদামঙ্গল, অন্নপূর্ণা মঙ্গল বা মানসিংহ এবং কালিকা মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর উপাধি পান।

রামপ্রসাদ সেন। জন্ম আনুমানিক ১৭২০-২১ খ্রীঃ অব্দ। জন্মস্থান হালিশহর। সাধক কবি শাক্ত পদাবলী রচনা করেন। পিতার নাম রামরাম সেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন। রামপ্রসাদী গান ভাবে ও সুরে বাংলার এক অমূল্য সম্পদ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। জন্মের সন-তারিখ জানা যায় না। পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা। সাধক কবি। রামপ্রসাদের মতই তিনি শাক্ত পদাবলী রচনা করেন। কমলাকান্তর ভণিতায় প্রায় তিন শ' পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় শকে তিনি দেহত্যাগ করেন।

লালন (শাহ) ফকির। আনুমানিক ১৭৭৪। মৃত্যু ১৮৯০। জন্মস্থান সম্ভবত হরিশপুর, ঝিণাইদহ, যশোহর (আবদুল ওয়ালির প্রবন্ধ)। দরবেশ শ্রেণীর ফকির। 'সাঁই' বলে লালন পরিচিত ছিলেন। তিনি কেবল বাউল সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বভাবকবি, সঙ্গীতকার। প্রায় দশ হাজার গান একশ বছর ধরে রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। জন্ম ১৮১২, মৃত্যু ১৮৫৯। জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত। সেকালের সাময়িক পত্র 'সংবাদ প্রভাকরের' বিখ্যাত সম্পাদক। উনিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণের এই কবি স্বদেশপ্রেমের কবিতার জন্য বিশেষ স্মরণীয়। তাঁর লেখা গ্রন্থ ঃ প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দু বিকাশ উল্লেখযোগ্য।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার। জন্ম ১৮১৭, মৃত্যু ঃ ১৮৫৮। জন্মস্থান বিল্বগ্রাম, নদীয়া। পুরানো কাব্যরীতির শেষ কবি। কবির দুটি কাব্য রসতরঙ্গিনী (১৮৩৪) এবং বাসবদত্তা (১৮৩৬)। কয়েকটি শিশুপাঠ্য কবিতাও তিনি রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। জন্ম ১৮২৪, মৃত্যু ১৮৭৩। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, যশোহর। পিতা ঃ রাজনারায়ণ দত্ত। মধুসূদন উনিশ শতকের নবযুগের কবি, তাঁকে বাংলা কবিতার আধুনিক ধারার ভগীরথ বলা চলে। তিনি নতুন ছন্দোরীতি 'অমিত্রাক্ষর' প্রবর্তন করেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ ঃ মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমা সম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী। এ ছাড়া তাঁর কয়েকটি নাটক-প্রহসন বাংলা নাট্যসাহিত্যের সম্পদ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮২৭, মৃত্যু ১৮৮৭। জন্ম কাকুলিয়া, বর্ধমান। স্বদেশপ্রেমিক কবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, কাঞ্চিকাবেরী ও নীতি কুসুমাঞ্জলি। সম্পাদনা ঃ রসসাগর।

দীনবন্ধু মিত্র। জন্ম ১৮৩০, মৃত্যু ১৮৭৩। জন্মস্থান ঃ চৌবেড়িয়া, নদীয়া। কাব্য-কবিতা কিছু লিখলেও তাঁর খ্যাতি নাটকের জন্য। নীলচাষীদের ওপর ইংরেজ নীলব্যবসায়ীদের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি নীলদর্পণ নাটক রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী। জন্ম ১৮৩৫, মৃত্যু ১৮৯৪। জন্মস্থান ঃ কোলকাতা, নিমতলা পল্লী। আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম কবি। কাব্যগ্রন্থ সঙ্গীত শতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, সারদামঙ্গল প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৩৮, মৃত্যু ১৮৯৪। জন্মস্থান কাঁঠালপাড়া। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'সাহিত্য সম্রাট' ও

'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' আখ্যায় চিহ্নিত। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আনন্দমঠের অন্তর্গত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি কিছু কবিতাও রচনা করেন। কাব্য ঃ ললিতা ও মানস।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। জন্ম ১৮৩৮, মৃত্যু ১৮৭৮। জন্মস্থান ঃ জগন্নাথপুর, যশোহর। কবির শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ মহিলা কাব্য। অন্যান্য ঃ বর্ষবর্তন, সবিতাসুদর্শন ইত্যাদি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৩৮, মৃত্যু ১৯০৩। জন্মস্থান গুলিটা, হুগলি। রচিত গ্রন্থ ঃ বৃত্রসংসার, দশমহাবিদ্যা, আশাকানন, ছায়াময়ী, কবিতাবলী ইত্যাদি।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৩৯, মৃত্যু ১৯০০। জন্মস্থান, কোন্নগর, হুগলি। কবির ছাত্রপাঠ্য কবিতাগুলি কয়েকখণ্ড 'পদ্যপাঠে' সংকলিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ১৮৪০, মৃত্যু ১৯২৬। জন্মস্থান ঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ স্বপ্নপ্রয়াণ। মেঘদূতের উত্তরমেঘের অংশবিশেষ 'যক্ষের আলয়' নামে অনুবাদ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ১৮৪২, মৃত্যু ১৯২৩। জন্মস্থান জোড়াসাঁকো, ঠাকুরবাড়ি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। রচিত গ্রন্থ ঃ সুশীলা, বীরসিংহ ও বোম্বাই চিত্র।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ। জন্ম ১৮৪৩, মৃত্যু ১৯১১। জন্মস্থান ভরাকর, বিক্রমপুর (ঢাকা)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ প্রভাত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা ইত্যাদি।

মনোমোহন বসু। জন্ম ১৮৪৫, মৃত্যু ১৯১২। জন্মস্থান ছোট জাগুলিয়া, ২৪ পরগণা। কবি ও নাট্যকার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ দুলীন। তিনি পাঠ্যপুস্তক 'পদ্যমালা' প্রকাশ করেন। যাত্রাপালা, পাঁচালী, বাউল প্রভৃতি লোকগীতি রচনায় দক্ষ ছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেন। জন্ম ১৮৪৭, মৃত্যু ১৯০৯। জন্মস্থান নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম। 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রথম কাব্যগ্রন্থ, বাংলার ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। উল্লেখযোগ্য তিনটি কাব্য ঃ কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও প্রভাস।

শিবনাথ শাস্ত্রী। জন্ম ১৮৪৭, মৃত্যু ১৯১৯। জন্মস্থান চাংড়িপোতা, ২৪ পরগণা। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামে বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম নেতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পুষ্পমালা, হিমাদ্রিকুসুম ও নির্বাসিতের বিলাপ। শিশু পত্রিকা 'মুকুল' সম্পাদনা করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ১৮৪৮, মৃত্যু ১৯২৫। জন্মস্থান ঠাকুরবাড়ি, জোড়াসাঁকো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। ইতিহাস, কল্পনা ও স্বাদেশিকতা মিশিয়ে নাটক রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য ঃ পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী, স্বপ্নময়ী ও হঠাৎ নবাব।

রাজকৃষ্ণ রায়। জন্ম ১৮৪৯, মৃত্যু ১৮৯৪। কবি ও নাট্যকার। তাঁর প্রসিদ্ধ আখ্যানকাব্য—নিভৃত নিবাস, প্রকাশকাল—১৮৭৮।

গোবিন্দচন্দ্র দাস। জন্ম ১৮৫৫, মৃত্যু ১৯১৮। জন্মস্থান ও পিতৃভূমি ভাওয়াল, ঢাকা। স্বদেশপ্রেম তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। রচিত গ্রন্থ ঃ কুঙ্কুম, কস্তুরী, প্রেম ও ফুল, বৈজয়ন্তী, চন্দন ও ফুলরেণু। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'স্বদেশ'।

স্বর্ণকুমারী দেবী। জন্ম ১৮৫৫, মৃত্যু ১৯৩২। জন্মস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রহসন, গান—সাহিত্যের সব বিভাগেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্পর্শ রেখে গেছেন। উপন্যাস ঃ দীপনির্বাণ, মালতী ও স্নেহলতা। সেকালের উল্লেখযোগ্য শিশু পত্রিকা 'বালক' সম্পাদনা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেন। জন্ম ১৮৫৮, মৃত্যু ১৯২০। পৈতৃক নিবাস ঃ বলাগড়, হুগলি। জন্মস্থান গাজীপুর, বিহার। কবি সনেট রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ ঃ অশোকগুচ্ছ, অপূর্ব, নৈবেদ্য, শেফালিগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ ইত্যাদি।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। জন্ম ১৮৫৮, মৃত্যু ১৯২৪। আদিনিবাস পানিহাটি, ২৪ পরগণা। স্বামী নরেশচন্দ্র দত্ত। কবি ও চিত্রশিল্পী

গিরীন্দ্রমোহিনী 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ ঃ অশ্রুকণা, সিন্ধুগাথা, শিখা, অর্ঘ ইত্যাদি।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। জন্ম ১৮৫৯, মৃত্যু ১৯৩৯। জন্মস্থান ঃ নারিট, হাওড়া। 'সখা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনা ঃ ছেলেখেলা, টুকটুকে রামায়ণ, ছবির ছড়া, পুষ্পাঞ্জলি, বাঙলার ছবি ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমার বড়াল। জন্ম ১৮৬০, মৃত্যু ১৯১৯। পিতৃভূমি ঃ চোরাবাগান, কলকাতা। শ্রেষ্ঠ কাব্য ঃ এষা। অন্যান্য ঃ প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, শঙ্খ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯৪১। জন্মস্থান ঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। 'বিশ্বকবি' ও 'কবিগুরু' বলে তাঁর নাম সর্বত্র শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাঁর চেষ্টায় বিশ্বসভায় সম্মানের আসন পেয়েছে। ১৯১৩ সালে তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ সালে। শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর স্মরণীয় রচনা ঃ শিশু, শিশু ভোলানাথ, ডাকঘর, মুকুট, গল্পসল্প, খাপছাড়া, সে, ছড়া, ছড়ার ছবি।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার। জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯৪২। জন্মস্থান ঃ কলকাতা। অন্ধ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্রের সম্পাদনা করেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ ঃ থেরিগাথা, ফুলশর, যজ্ঞভস্ম, হেঁয়ালি ইত্যাদি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯১৫। জন্মস্থান ঃ মসূয়া, ময়মনসিংহ। বাংলা শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর বিখ্যাত 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ছড়া, কবিতা, গল্প, বৈজ্ঞানিক কাহিনী লিখে তিনি শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই ঃ টুনটুনির বই, গুপী গাইন বাঘা বাইন, সেকালের কথা ছেলেদের রামায়ণ। চিত্রশিল্প ও মুদ্রণশিল্পেও তাঁর অবদান কম নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯১৩। পৈতৃক নিবাস ঃ কৃষ্ণনগর। কবি ও নাট্যকার। হাসির গান রচনায় দক্ষ ছিলেন। অসাধারণ সুরকার ও সঙ্গীত-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের গান জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করে। রচিত কাব্যগ্রন্থ ঃ মন্দ্র, আলেখ্য, আষাঢ়ে, ত্রিবেণী। নাট্যগ্রন্থ ঃ চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, মেবার পতন ইত্যাদি।

মানকুমারী বসু। জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯৪৩। পিতৃভূমি ঃ সাগরদাঁড়ি, যশোহর। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী পদক (১৯৩০) ও জগত্তারিণী পদক (১৯৪১) লাভ করেন। কাব্যগ্রন্থ ঃ কাব্যকুসুমাঞ্জলি, বীরকুমার বধ ও কনকাঞ্জলি।

কামিনী রায়। জন্ম ১৮৬৪, মৃত্যু ১৯৩৩। পৈতৃক নিবাস ঃ বাসণ্ডা, বরিশাল। ঐতিহাসিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। প্রথম যুগের মহিলা গ্র্যাজুয়েট। রচিত কাব্যগ্রন্থ ঃ আলো ও ছায়া, নির্মাল্য, দীপ ও ধূপ ইত্যাদি।

রজনীকান্ত সেন। জন্ম ১৮৬৫, মৃত্যু ১৯১০। জন্মস্থান ঃ ভাঙাবাড়ি, পাবনা। সঙ্গীত-রচয়িতা কান্তকবির গান আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। রচিত গ্রন্থ ঃ বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, অভয়া ইত্যাদি।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার। জন্ম ১৮৬৬, মৃত্যু ১৯৩৭। জন্মস্থান ঃ ন্যাতড়া, ২৪ পরগণা। বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর বর্ণ পরিচয়ের ছড়া আজও সমান জনপ্রিয়। ছোটদের জন্য তাঁর বই হাসিখুশি, ছড়া ও ছবি, ছবি ও গল্প, ছোটদের চিড়িয়াখানা, ছোটদের মহাভারত, ছোটদের উপকথা, ধ্রুব, দ্রৌপদী, হাসির গল্প, হিজিবিজি, খেলার গান, কমলিনী প্রভৃতি।

প্রমথ চৌধুরী। ছদ্মনাম বীরবল। জন্ম ১৮৬৮, মৃত্যু ১৯৪৬। পিতৃভূমি হরিপুর, পাবনা। সমালোচক, কথাসাহিত্যিক ও কবি। 'সবুজ পত্র' নামে বিখ্যাত সাহিত্য মাসিকের সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ-সনেট পঞ্চাশৎ, নানাকথা, বীরবলের হালখাতা, নীললোহিত ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদ সেন। জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯৩৪। পৈতৃক নিবাস ঃ ঢাকা। কবি, সুরকার ও

সঙ্গীতজ্ঞ। রচিত গ্রন্থঃ কাকলি, গীতিগুচ্ছ ও কয়েকটি গান।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯৫১। জন্মস্থান জোড়াসাঁকো, কলকাতা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। শিল্পী ও সাহিত্যিক। রেখায় ও লেখায় তাঁর অসামান্য প্রতিভা বাংলা শিল্প-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারেও তিনি রেখে গেছেন বহু অমূল্য রত্ন। 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' তাঁর স্মৃতিকথা। ছোটদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি বইঃ ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা, শকুন্তলা, নালক ইত্যাদি।

প্রিয়ংবদা দেবী। জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯৩৫। জন্মস্থান কলকাতা। কবি সনেট রচনায় দক্ষ ছিলেন। বাংলার মহিলা কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। রচিত গ্রন্থ—রেণু, অংশু, পত্রলেখা ইত্যাদি।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। জন্ম ১৮৭২, মৃত্যু ১৯৪৯। মৈমনসিংহ জেলার সন্তোষের জমিদার ছিলেন। সাহিত্যসেবাই ছিল জীবনের ব্রত। ইনি একজন নাট্যকারও ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থঃ পদ্মা, গৈরিক ইত্যাদি।

সরলা দেবী। জন্ম ১৮৭৩, মৃত্যু ১৯৫০। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। কিছুদিন 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। মহিলা ঔপন্যাসিক।

শশাঙ্কমোহন সেন। জন্ম ১৮৭৩, মৃত্যু ১৯২৮। জন্মস্থান ধলঘাট, চট্টগ্রাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বিশিষ্ট সমালোচক। রচিত কাব্যগ্রন্থঃ শৈলসংগীত, সিন্ধুসংগীত, সাবিত্রী, বিমানিকা।

রমণীমোহন ঘোষ। জন্ম ১৮৭৭, মৃত্যু ১৯২৭। পৈতৃক নিবাস ঢাকা। কাব্যগ্রন্থঃ মুকুর, দীপশিখা, মঞ্জরী প্রভৃতি।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। জন্ম ১৮৭৭, মৃত্যু ১৯৫৭। জন্মস্থান উলাইল, ঢাকা। বাংলা শিশুসাহিত্যে অসামান্য অবদান। পূর্ববঙ্গের লুপ্তপ্রায় লোককথা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত সেই উপাদানে রচিত হয় তাঁর চিরকালের কাব্যধর্মী রূপকথা-উপকথা—ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, ঠানদিদির থলে। অন্যান্য গ্রন্থঃ চারু ও হারু, খোকাবাবুর খেলা, আমাল বই ইত্যাদি।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৭৭, মৃত্যু ১৯৫৫। কবিত্বের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী পদক দানে সম্মানিত। শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনঃ শতনরী। অন্যান্যঃ ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদুর্বা ইত্যাদি।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী। জন্ম ১৮৭৮, মৃত্যু ১৯৪৮। পৈতৃক নিবাস' জমসেরপুর, নদীয়া। তাঁর 'কাজলাদিদি' অতি জনপ্রিয় কবিতা। পল্লীজীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের কবি। কাব্যগ্রন্থ—রেখা-লেখা, নীহারিকা, জাগরণী, মহাভারতী, নাগকেশর ইত্যাদি।

চারণকবি মুকুন্দ দাস। জন্ম ১৮৭৮, মৃত্যু ১৯৩৪। জন্মস্থান বানারী, ঢাকা। পিতৃদত্ত নামঃ যজ্ঞেশ্বর দে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যাত্রাদল খুলে তিনি সারাদেশ মাতিয়ে তোলেন। বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা। ইংরাজ আমলে গান লেখার জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। 'চারণকবি' নামে খ্যাত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম ১৮৮২, মৃত্যু ১৯২২। জন্মস্থান নিমতা, ২৪ পরগণা। রবীন্দ্রযুগের বিশিষ্ট কবি। ছন্দ-বৈচিত্র্য তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। সে কারণে তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়। ছোটদের উপযোগী বহু কবিতা তিনি লিখেছেন। দুটি কাব্য সংগ্রহ—শিশু কবিতা ও কাব্যসঞ্চয়ন। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থঃ বেণু ও বীণা, তীর্থরেণু, কুহু ও কেকা, হসন্তিকা প্রভৃতি।

কুসুমকুমারী দাশ জন্ম ১৮৮২, মৃত্যু ১৯৪৮। মহিলা কবিদের অন্যতম। 'মুকুল' ও অন্যান্য পত্রিকায় শিশু-কিশোরদের জন্য অসংখ্য ছড়া-কবিতা প্রকাশিত হয়।

গুরুসদয় দত্ত। জন্ম ১৮৮২, মৃত্যু ১৯৪১। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক। জন্ম শ্রীহট্ট জেলায়। পিতা রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী। তিনি লোকনৃত্য 'রায়বেঁশে' পুনঃপ্রচলন করেন। শিশুদের জন্যে তাঁর লেখা বই—ভজার বাঁশী, পাগলামীর পুথি, চাঁদের বুড়ি। এ ছাড়াঃ ব্রতচারী সখা।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক। জন্ম ১৮৮৩, মৃত্যু ১৯৭০। জন্মস্থান অজয় নদীর তীরে কোগ্রাম, বর্ধমান।

পল্লীকবি নামে খ্যাত। আজীবন শিক্ষাব্রতী। রচিত কাব্যগ্রন্থ—উজানী, নূপুর, রজনীগন্ধা, বনতুলসী, শতদল, তূণীর, বীথি, একতারা, অজয়, স্বর্ণসন্ধ্যা।

নন্দলাল বসু। জন্ম ১৮৮৩, মৃত্যু ১৯৬৬। জন্মস্থান মুঙ্গের। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী। শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চা ও শিল্পশিক্ষাদানে আজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর দু'টি বিখ্যাত বই—রূপাবলী ও শিল্পচর্চা।

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত জন্ম ঃ ১৮৮৪, মৃত্যু (?) জন্মস্থান ফুল্লশ্রী, বরিশাল। প্রধানত শিশু ও কিশোরদের জন্য লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আমার দেশ, ফুলঝুরি, ঝলমল।

সুখলতা রাও। জন্ম ১৮৮৬, মৃত্যু ১৯৬৯। জন্মস্থান কলকাতা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। 'সন্দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য—লালিভুলির দেশে, পথের আলো, নতুন ছড়া, নিজে পড়ো, নিজে শেখো, খেলার পড়া, নানান দেশের রূপকথা ইত্যাদি।

সুকুমার রায়। জন্ম ১৮৮৭, মৃত্যু ১৯২৩। জন্মস্থান : কলকাতা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাংলা শিশুসাহিত্যে অবিস্মরণীয় নাম। উদ্ভটরসের ছড়া ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর আঁকা ছবিও চমৎকার। লেখায়-রেখায় স্বল্পকালীন জীবনে তিনি শিশুসাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন। তাঁর কয়েকখানি বই, যা ছোট-বড় সবাইকে সমান আনন্দ দেয়— আবোল তাবোল, খাইখাই, হ য ব র ল, পাগলাদাশু, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, শব্দকল্পদ্রুম, ঝালাপালা, চলচ্চিত্তচঞ্চরি প্রভৃতি।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৮৭, মৃত্যু ১৯৩১। জন্মস্থান ভবানীপুর। নিবাস ঃ উত্তরপাড়া, হুগলি। অধ্যাপক। রচনার বৈশিষ্ট্য-ভাবের গাঢ়তা, ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ ঃ নতুন খাতা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। জন্ম ১৮৮৭, মৃত্যু ১৯৫৪। জন্মস্থান হরিপুর, নদীয়া। গদ্য-পদ্য উভয় রচনাতে দক্ষ। শক্তিশালী কবি। রচিত কাব্যগ্রন্থ—অনুপূর্বা, মরুমায়া, মরীচিকা, মরুশিখা, সায়ম্, ত্রিযামা প্রভৃতি।

রাজশেখর বসু। জন্ম ১৮৮৮, মৃত্যু ১৯৬০। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়া। পিতা চন্দ্রশেখর বসু। সাহিত্য-জগতে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনা সৃষ্টি করে খ্যাত হন। তাঁর অভিধান 'চলন্তিকা' ও মহাভারতের গদ্যানুবাদ স্থায়ী সম্পদ। অন্যান্য রসরচনা ও গল্পগ্রন্থ গড্ডালিকা, 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন' উল্লেখযোগ্য

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৮৮, মৃত্যু ১৯২৯। শিশুসাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক। দীর্ঘকাল 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয় দুটি বই—কায়াহীনের কাহিনী ও জাপানী ফানুস।

মোহিতলাল মজুমদার। জন্ম ১৮৮৮, মৃত্যু ১৯৫২। পৈতৃক নিবাস বলাগড়, হুগলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। প্রতিভাবান কবি ও সমালোচক। কাব্যগ্রন্থ—রূপকথা, স্বপনপসারী, বিস্মরণী, স্মরগরল ও হেমন্তগোধূলি।

হেমেন্দ্রকুমার রায়। জন্ম ১৮৮৮, মৃত্যু ১৯৬৩। জন্মস্থান কলকাতা। 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। বড়দের বড় লেখক, ছোটদের সেরা লেখকদের অন্যতম। তাঁর লেখা 'যখের ধন' 'দেড়শ খোকার কাণ্ড' ইত্যাদি কিশোর উপন্যাস খুবই জনপ্রিয়। ছোটদের জন্যে অনেক ছড়া-কবিতাও লিখেছেন। এ ছাড়া তিনি গীতিকার রূপেও খ্যাতি অর্জন করেন।

নরেন্দ্র দেব। জন্ম ১৮৮৮, মৃত্যু ১৯৭১। জন্মস্থান কলকাতা। ছোটদের বিখ্যাত পত্রিকা 'পাঠশালা' সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। বড়দের জন্য লিখেছেন গল্প-উপন্যাস। 'ওমর খৈয়াম' ও 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিশোর সাহিত্য—'অনেক দিনের কথা' ও 'আনন্দধারা'।

কালিদাস রায়। জন্ম ১৮৮৯, মৃত্যু ১৯৭৫। জন্মস্থান কড়ুই, বর্ধমান। শিক্ষাব্রতী ও কবি। 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত। সাহিত্য-সমালোচক এবং হাস্যরসিক ছিলেন। তাঁর পল্লীকবিতাগুলি মাধুর্যে ও চিত্রময়তায় বিশিষ্ট। রচিত কাব্যগ্রন্থ ঃ পর্ণপুট, ঋতুমঙ্গল,

ব্রজবেণু, রসকদম্ব ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সাহিত্য—বঙ্গসাহিত্যে পরিচয়।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। কবি ও শিক্ষাবিদ। জন্ম ১৮৯৩, মৃত্যু ১৯৪৭। জন্মস্থান: গোপীনাথপুর, হুগলি। কাব্যগ্রন্থঃ অরুণিমা, বেদবাণী, কোজাগরী।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৯৬, মৃত্যু ১৯৮৭। জন্মস্থান' পাণ্ডুল, ভাগলপুর। 'এবার প্রিয়ংবদা' গ্রন্থের জন্য ১৯৭২ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। হাস্যরস সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। 'রাণুর প্রথম ভাগ' অসামান্য রচনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—স্বর্গাদপি গরিয়সী, নীলাঙ্গুরীয়, কাঞ্চনমূল্য। কিশোর পাঠকদের জন্য বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ—পোনুর চিঠি ও ছোটদের ভালো ভালো গল্প। রবীন্দ্র পুরস্কার ও শরৎপুরস্কার প্রাপ্ত।

কৃষ্ণধন দে। জন্ম ১৮৯৮। পিতৃভূমি আঝাপুর, বর্ধমান। বর্তমান যুগের একজন শক্তিশালী কবি। প্রথমে অধ্যাপক, পরে হাইকোর্টের অনুবাদক। কাব্যগ্রন্থঃ ব্যথার পরাগ।

কৃষ্ণদয়াল বসু। জন্ম ১৮৯৮, মৃত্যু (?)। একজন আদর্শ শিক্ষকরূপে আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। রচনার বৈশিষ্ট্যঃ ছন্দের পারিপাট্য ও ভাষার মাধুর্য। কাব্যগ্রন্থ—রুনুঝুনু।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৯৮, মৃত্যু ১৯৬৫। পৈতৃক নিবাসঃ লোকনাথপুর, নদীয়া। 'উপাসনা', 'অভ্যুদয়', 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তাঁর কাব্যচর্চার প্রেরণা দেশের মুক্তি আন্দোলন। রচিত কাব্যগ্রন্থ—পল্লীব্যথা, অনুরাধা, অতসী, মধুমালতী ইত্যাদি।

কাজী নজরুল ইসলাম। জন্ম ১৮৯৯, মৃত্যু ১৯৭৭। জন্মস্থান চুরুলিয়া, বর্ধমান। বাংলার বিদ্রোহী কবি, কবিতা রচনা করে বৃটিশ আমলে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কৃষক-শ্রমিক দলের প্রথম সভাপতি। তাঁর 'লাঙল' ও 'ধূমকেতু' পত্রিকা সে-সময় বিদ্রোহের স্ফুলিংগ ছড়াত। সুরকার ও গীতিকার রূপেও তাঁর দান অসামান্য। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলনচাঁপা, সিন্ধুহিল্লোল, ছায়ানট, বুলবুল।

জীবনানন্দ দাশ। জন্ম ১৮৯৯, মৃত্যু ১৯৫৪। জন্মস্থান বরিশাল। 'আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রতীকপুরুষ' কবি জীবনানন্দ। অধ্যাপনা করতেন। 'রূপসী বাংলার' স্রষ্টা, বাঙালীর প্রিয় কবি। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থঃ রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, ধূসর পাণ্ডুলিপি, সাতটি তারার তিমির। ১৯৫৫ সালে তিনি 'শ্রেষ্ঠ কবিতার' জন্য আকাদেমী পুরস্কার পান।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। জন্ম ১৮৯৯, মৃত্যু ১৯৭৯। জন্ম মণিহারী, বিহার। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক-সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর লেখনী সার্থক। বড়দের উপন্যাসঃ ডানা, রাত্রি, স্থাবর, জঙ্গম, মৃগয়া ইত্যাদি। ছোটদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ করবী, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, রঙ্গনা, তিন কাহিনী, অলঙ্কারপুরী। 'হাটে বাজারে' উপন্যাসের জন্য ১৯৬২ সালে তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়।

সজনীকান্ত দাশ। জন্ম ১৯০০, মৃত্যু ১৯৬২। পৈতৃক নিবাস রাইপুর, বীরভূম। 'শনিবারের চিঠি'র বিখ্যাত সম্পাদক। কবি ও সমালোচক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচিত কাব্যগ্রন্থঃ পঁচিশে বৈশাখ, রাজহংস, পথ চলতে, ঘাসের ফুল ইত্যাদি।

অমিয় চক্রবর্তী। জন্ম ১৯০১, মৃত্যু ১৯৮৬। জন্মস্থান কলকাতা। দীর্ঘদিন রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক। ১৯৬৪ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার পান। কাব্যগ্রন্থঃ খসড়া, একমুঠো, পারাপার, পালাবদল।

সুনির্মল বসু। জন্ম ১৯০২, মৃত্যু ১৯৫৭। জন্মস্থান গিরিডি, বিহার। বাংলা শিশুসাহিত্যে স্মরণীয় একটি নাম। অসংখ্য ছড়া-কবিতার মণিমুক্তা ছড়িয়ে রেখে গেছেন। ছন্দ-বৈচিত্র্যে ও শব্দচয়নের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল সেই সব রচনা। কিশোরদের পাক্ষিক 'কিশোর এশিয়ার' সম্পাদক ছিলেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য

তাঁর উল্লেখযোগ্য বই—ছন্দের টুংটাং, আনন্দনাড়ু, ছানাবড়া, হৈ-চৈ, হুলুস্থুল, কিপ্‌টে ঠাকুর্দা প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশী। জন্ম ১৯০২, মৃত্যু ১৯৮৬। জন্মস্থান জোয়াড়ি, রাজশাহী। ছদ্মনামঃ প্র.না.বি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমালোচক ও শিক্ষাব্রতী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহ, কেরী সাহেবের মুন্সী, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, মৌচাকে ঢিল প্রভৃতি।

অখিল নিয়োগী। জন্ম ১৯০২। যুগান্তর দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাততাড়ি বিভাগটি সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। ছদ্মনাম 'স্বপনবুড়ো' ছোটদের কাছে বিশেষ প্রিয় ও পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ স্বপনবুড়োর শৈশব, স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য, সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে, বেপরোয়া, বাবুইবাসা, বোর্ডিং প্রভৃতি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। জন্ম ১৯০৩, মৃত্যু ১৯৭৬। জন্মস্থান নোয়াখালি। কল্লোল যুগের অন্যতম লেখক। কবিখ্যাতিও ছিল। ১৯৫৭ সালে 'উত্তরায়ণ' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ কল্লোল যুগ, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। ছোটদের জন্যঃ ডাকাতের হাতে, দুই ভাই, ঘোরপ্যাঁচে, ঝড়ের যাত্রী ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্কর রায়। জন্ম ১৯০৪। জন্মস্থান উড়িষ্যার ঢেনকানল। বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। তাঁর বৈশিষ্ট্য—মননশীলতা। ছড়াকার হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা অসামান্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ পথে-প্রবাসে, সত্যাসত্য, জীয়নকাঠি প্রভৃতি। ছড়ার বইঃ উড়কি ধানের মুড়কি, রাঙাধানের খই, ছড়া-সমগ্র, ক্ষীরনদীর কূলে প্রভৃতি। সম্মানঃ দেশিকোত্তম।

প্রেমেন্দ্র মিত্র। জন্ম ১৯০৪, মৃত্যু ১৯৮৮। জন্মস্থান কাশী। কল্লোলযুগের শক্তিশালী কবি ও কথাসাহিত্যিক। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। কালি-কলম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। একসময় ছোটদের বিখ্যাত পত্রিকা 'রংমশাল' সম্পাদনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ ইত্যাদি। ছোটদের ছড়ার বইঃ চাঁদ তারা জোনাকিরা, ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়া। সম্মানঃ দেশিকোত্তম।

রাধারাণী দেবী। জন্ম ১৯০৪। জন্মস্থান কোচবিহার। মহিলা কবিদের নেতৃস্থানীয়া। একসময় 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামে কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, গল্প ও রূপকথা। রচিত গ্রন্থ—লীলাকমল, বিচিত্ররূপিণী, বনবিহগী, আঙিনার ফুল ইত্যাদি। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত।

তমাললতা বসু। জন্ম (?) রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি। শিশু-কিশোরদের উপযোগী কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেন। কবির একাধিক কবিতা একসময় পাঠ্যবইয়ে স্থান পেত। তাঁর 'ভালবাসি' একটি বহুপঠিত কবিতা।

হরেন ঘটক। জন্ম ১৯০৪। জন্মস্থান বিলোনিয়া, ত্রিপুরা। আদিনিবাসঃ ডোমসার, ফরিদপুর। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক। একসময় যুগান্তর ছোটদের পাততাড়ির পরিচালক (নতুনদা) ছিলেন। মাস্টারদা নামে সত্যযুগের ছোটদের বিভাগেরও পরিচালনা করেন। উল্লেখযোগ্য বইঃ মাছরাঙা, সাগরপারের ছড়া, টুনটুনির ছড়া ও ছবিতে অ-আ-ক-খ প্রভৃতি।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৯০৪, মৃত্যু ১৯৮৬। বিশিষ্ট কবি ও চিত্রশিল্পী। রাজনৈতিক আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ছোটদের জন্যে অসংখ্য ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। রচিত গ্রন্থঃ অচিরা, গৃহসন্ধানে, তিন্তিড়ি, ব্রতী প্রভৃতি।

শিবরাম চক্রবর্তী। জন্ম ১৯০৫, মৃত্যু ১৯৮০। জন্মস্থানঃ মালদহ। প্রথম জীবনে বড়দের জন্য বিশিষ্ট রচনা নিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ, পরে শিশুসাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। হাসির গল্পে ও মজাদার কথার খেলায় তিনি অদ্বিতীয় শিব্রাম। ছোটদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য বইঃ বাড়ি থেকে পালিয়ে, মন্টুর মাস্টার, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন প্রভৃতি। 'আত্মশক্তি' পত্রিকা সম্পাদনা করে ব্রিটিশ যুগে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কাব্যঃ মানুষ।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে কলকাতায় আহিরীটোলায় জন্ম হয়। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগণা, দত্তপুকুর। কর্ম এ·আই· রেলওয়ে পরে বেতার বার্তায় সহকারী প্রোগ্রাম পরিচালক হন। প্রধানত তিনি সাহিত্যসেবী ও নাট্য পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ ব্ল্যাক আউট, বিরুপাক্ষের ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৯০৬। আধুনিক কবিদের অন্যতম। অধ্যাপক। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। ছোটদের জন্যে রংমশাল, মৌচাক ও অন্যান্য পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন।

হুমায়ুন কবির। জন্ম ১৯০৬, প্রয়াত। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রচিত কাব্যগ্রন্থঃ স্বপ্নসাধ, সাথী।

ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৯০৬, প্রয়াত। ছোটদের ছড়া ও কবিতা রচনায় অসামান্য দক্ষতা ছিল। সেই সময়ের শিশু-কিশোরদের পত্র-পত্রিকায় ও বার্ষিকীতে তাঁর রচনা অপরিহার্য ছিল। তাঁর ও তাঁর মায়ের নামে শিশুসাহিত্য রচনার জন্য দেওয়া হয় ফটিক স্মৃতি ও ভুবনেশ্বরী পদক।

অজিত দত্ত। জন্ম ১৯০৭, প্রয়াত। জন্মস্থান ঢাকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আধুনিক কাব্যধারার প্রথম যুগের কবি। কাব্যগ্রন্থঃ কুসুমের মাস, পুনর্নবা, নষ্টচন্দ্র ইত্যাদি। ছোটদের জন্য বেশ কিছু ভালো কবিতা রচনা করেছেন।

সুনীলচন্দ্র সরকার। জন্ম ১৯০৭। বিশিষ্ট কবি। রচনার সংখ্যা অল্প। ছোটদের জন্যে তাঁর বিখ্যাত বইঃ কালোর বই।

লীলা মজুমদার। ১৯০৮ সালে কলকাতায় জন্ম। উপেন্দ্র কিশোরের কনিষ্ঠ ভাই প্রমদারঞ্জনের কন্যা। প্রথম প্রকাশিত বই বদ্যিনাথের বাড়ি। ছোটদের লেখার জন্য তিনি সিদ্ধহস্ত। সহজ ভাষায় সরস ভাবে লেখা তাঁর বিশেষত্ব। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী পুরস্কার লাভ করেছেন। সম্প্রতি তিনি দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন। ছোটদের জন্য প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইঃ দিন দুপুরে, পদিপিসির বর্মী বাক্স, হলদে পাখির পালক, বাতাস বাড়ি ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু। জন্ম ১৯০৮, মৃত্যু ১৯৭৪। জন্মস্থান কুমিল্লা। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক রূপে তাঁর অবদান রয়েছে। প্রধানত কবি। নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসাবেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ছোটদের সাহিত্যেও তাঁর দান কম নয়। তাঁর লেখা ছোটদের বইঃ রঙিন কাঁচ, এলোমেলো, হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা, তাসের প্রাসাদে, কালবোশেখীর ঝড়, ভূতের মত অদ্ভুত প্রভৃতি। ১৯৭৬ সালে তিনি 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র জন্য আকাদমী পুরস্কার ও ১৯৭৪ সালে 'স্বাগত বিদায়'-এর জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

প্রভাতকিরণ বসু। জন্ম ১৯০৮। আজীবন শিশুসাহিত্য রচনায় ব্রতী ছিলেন। ছদ্মনামঃ কাকাবাবু। ঐ নামে তিনি বসুমতীর 'ছোটদের পাতা' ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভাইবোন' (১৯৪৩) পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য বইঃ অসি ও মসি, রাজার ছেলে, হীরের টুকরো, জগাপিসী।

বিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী। জন্ম (?) কল্লোল যুগের বিস্মৃতপ্রায় কবি। সেকালের ছোটদের পত্রপত্রিকা ও বার্ষিকী গ্রন্থে নিয়মিত ছড়া-কবিতা লিখতেন। তাঁর উল্লেখযোয় কবিতা 'দোপাটি' বহুপঠিত ও জনপ্রিয়।

অরুণ মিত্র। জন্ম ১৯০৯। জন্মস্থানঃ যশোহর। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বর্তমান কালের একজন বিশিষ্ট কবি। কাব্যগ্রন্থঃ উৎসের দিকে, ঘনিষ্ঠ তাপ, শুধু রাতের শব্দ নয় প্রভৃতি। 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূরে' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমী পুরস্কার, 'শুধু রাতের শব্দ নয়' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। সম্পাদনাঃ অরণি।

কাদের নওয়াজ। জন্ম ১৯০৯। জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ। পৈত্রিক নিবাস মঙ্গলকোট, বর্ধমান। শিক্ষকতাই ছিল তাঁর পেশা। উদারনৈতিক কবি। 'নীলকুমুদী' ও 'মরাল' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

করুণাময় বসু। জন্ম ১৯০৯। সুকবি। পরবর্তী জীবনে শিশুসাহিত্যে প্রবেশ। 'সন্দেশ'ও অন্যান্য ছোটদের পত্রিকায় কবিতা লেখেন।

বিষ্ণু দে। জন্ম ১৯০৯, প্রয়াত। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম। কবি ও অধ্যাপকরূপে খ্যাতি ছিল। তাঁর বেশ কিছু কবিতা ছোটদের মনেও রেখাপাত করে। 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৬৫ সালে আকাদেমী পুরস্কার ও ১৯৭১ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ঃ সন্দীপের চর, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, উত্তরে থাকো মৌন প্রভৃতি।

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক। জন্ম ১৯০৯। জন্মস্থান কলকাতা। বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য বই ঃ রবিবারের দেশে, কবির লড়াই প্রভৃতি।

শৈল চক্রবর্তী। জন্ম ১৯০৯। জন্মস্থান আন্দুল মৌরী, হাওড়া। বিখ্যাত শিল্পী ও নিষ্ঠাবান শিশুসাহিত্যসেবী। 'গাড়ি-ঘোড়ার গল্প', 'মানুষ এল কোথা হতে' ও 'ছোটদের ক্র্যাফ্‌ট' এই তিনটি বইয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত। তাঁর অন্যান্য বই—কালো পাখি, বেলুন রাজার দেশে, চিন্তাশীল বাঘ, সবুজ আয়না, গল্পকথার দেশে, চিত্রে বুদ্ধজীবন-কথা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সম্পদ।

অশোকবিজয় রাহা। জন্ম ১৯১০। জন্মস্থান শ্রীহট্ট। প্রখ্যাত কবি ও অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ডিহাং নদীর বাঁকে, রুদ্রবসন্ত, ভানুমতীর মাঠ, উড়োচিঠির ঝাঁক।

বিমলচন্দ্র ঘোষ। জন্ম ১৯১০। প্রয়াত। জন্মস্থান কলকাতা। সমাজসচেতন কবি। তেজস্বিতা ও ওজস্বিনী ভাষা এই কবির বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ উদাত্ত ভারত, দ্বিপ্রহর প্রভৃতি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। জন্ম ১৯১০। মৃত্যু ১৯৮৮ জন্মস্থান ভাজনঘাট, নদীয়া। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক সহকারী ছিলেন। প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যের লেখক হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি আছে। ছোটদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য বইঃ হারানবাবুর ওভারকোট, বনটিয়া, অনেক রকম, ঝিলিমিলি।

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)। জন্ম ১৯১০, প্রয়াত। মৌমাছি ছদ্মনামে আনন্দবাজার পত্রিকার ছোটদের পাতার সম্পাদনা করেন। শিশুসংগঠন মণিমেলার প্রবর্তক। তরুণ ও উদীয়মান শিশুসাহিত্যিকদের প্রেরণার উৎস ছিলেন। রচিত শিশুসাহিত্য ঃ চেঙা-বেঙা, দেশ-বিদেশের রূপকথা, ঝড়ের পালক, জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড, মনীষীদের ছোটবেলা প্রভৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। জন্ম ১৯১১, মৃত্যু ১৯৭৭। কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম পথিকৃৎ। বিখ্যাত গণসঙ্গীত 'নবজীবনের গান-এর গীতিকার ও সুরকার। ছোটদের জন্য কবিতা লিখেছেন। কাব্যগ্রন্থ ঃ রাজধানী ও মধুবংশীর গলি।

হাসিরাশি দেবী। জন্ম ১৯১১। জন্মস্থান ২৪ পরগণা। চিত্রশিল্পী ও শিশু সাহিত্যিক। তাঁর শিশু সাহিত্য ঃ জাগো রাজকুমার, বকবাবাজি, কাঁকড়া মাসি ইত্যাদি।

ধীরেন বল। জন্ম ১৯১২। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। কিশোরদের জন্য বহু হাসির কবিতা রচনা করেছেন। গল্পও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই ঃ ঠেকে হাবুল শেখে, জমজমাট, তোলপাড়, আটখানা প্রভৃতি।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৯১২। জন্মস্থান বাঁকুড়া। প্রয়াত। ছোটদের জন্য অজস্র কবিতা লিখেছেন।

মৈত্রেয়ী দেবী। জন্ম ১৯১৪। জন্মস্থান ঃ কলকাতা। পিতা প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ও 'ন হন্যতে' সাড়া-জাগানো দু'টি বই। অন্যান্য ঃ উদিতা, চিত্তছায়া, কবি সার্বভৌম, বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত।

দিনেশ দাস। জন্ম ১৯১৫। মৃত্যু ১৯৮৫। জন্মস্থান কলকাতা। 'কাস্তে-কবি' নামে খ্যাত। শিক্ষকতা করতেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ ঃ ভুখ মিছিল, অহল্যা, শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি। 'রাম গেছে বনবাসে' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়াও নজরুল পুরস্কার।

সুশীল রায়। জন্ম ১৯১৫। প্রয়াত। জন্মস্থান রাজশাহী। বিশিষ্ট কবি। গদ্যসাহিত্যেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রন্থঃ সুচরিতাসু, পাঞ্চালি, শতদ্রু ইত্যাদি।

হরপ্রসাদ মিত্র। জন্ম ১৯১৭। জন্মস্থান দেওঘর। খ্যাতনামা অধ্যাপক। সুকবি। রচিত গ্রন্থঃ ভ্রমণ, পৌত্তলিক, চন্দ্রমল্লিকা, সাঁকো থেকে দেখা প্রভৃতি।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৯১৭, মৃত্যু ১৯৭৬। জন্মস্থান কলকাতা। বড়দের জন্যে গল্প, কবিতা ও নানা বিষয়ে লিখেছেন। ছোটদের জন্যও লিখেছেন অজস্র। সেকালের বিখ্যাত শিশুমাসিক 'রংমশাল' সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বইঃ ছাতুবাবুর ছাতা, ঘনশ্যামের ঘোড়া, হলদি ঝর্না, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, ছায়ামূর্তি প্রভৃতি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৯১৮, মৃত্যু ১৯৭০। জন্মস্থান বালিয়াডাঙ্গি, দিনাজপুর। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য। প্রথম জীবনে কবিতা লিখেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। অধ্যাপনায় সুখ্যাতি ছিল। ছোটদের সাহিত্যে তাঁর গল্পের চরিত্র 'টেনিদা' অত্যন্ত জনপ্রিয়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসঃ উপনিবেশ, শিলালিপি, পদসঞ্চার প্রভৃতি। কিশোর সাহিত্যঃ চারমূর্তি, তপন চরিত, ঝাউবাংলোর রহস্য, ঘণ্টাদার কাবলু কাকা প্রভৃতি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৯১৯। 'পদাতিক' কবি নামে খ্যাত। আকাদেমী পুরস্কারে (১৯৬৪) সম্মানিত। কাব্যগ্রন্থঃ যত দূরে যাই, ছেলে গেছে বনে, একটু পা চালিয়ে ভাই ইত্যাদি। 'মিউয়ের জন্য ছড়ানো ছিটনো' উল্লেখযোগ্য ছড়ার বই।

মণীন্দ্র রায়। জন্ম ১৯১৯। বিশিষ্ট কবি। জন্মস্থান শীতলাই, পাবনা। বেতার কেন্দ্রের শিশু বিভাগ পরিচালনা করেছেন। কাব্যগ্রন্থঃ ত্রিশঙ্কু, ইঙ্গিত, ছায়া-গহ্বর, ছড়ানো খুশি ইত্যাদি। আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৯২০, মৃত্যু ১৯৮৫। বিক্রমপুর। সমাজসচেতন বলিষ্ঠ ভাবধারার শক্তিশালী কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ রাণুর জন্যে, শ্রেষ্ঠ কবিতা, আর এক আরম্ভের জন্য ইত্যাদি। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৯২০। জন্মস্থান নলডাঙ্গা, যশোর। বিশিষ্ট কবি। সমাজসচেতন। কবির বেশ কিছু কবিতা কিশোর পাঠকদের মনেও রেখাপাত করে। কাব্যগ্রন্থঃ স্নায়ু, মনপবন, তেলেঙ্গানা, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় প্রভৃতি। নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত।

মনোজিৎ বসু। জন্ম ১৯২০, প্রয়াত। বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক। প্রধানত ছোটদের কবিতাই লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বইঃ অবনীন্দ্রনাথ, বীরাঙ্গনা, জয়জয়ন্তী, ইটুপাটুর কাহিনী, বাবলুর ঘাটশিলা যাত্রা প্রভৃতি। ছড়ার বইঃ ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯২১, মৃত্যু ১৯৬৪। বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও অধ্যাপক ছিলেন। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী রচনায় দক্ষতা ছিল। রচিত গ্রন্থঃ বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, ক্ষণদর্শন, ঘরে-বাইরে, সাহিত্য চিন্তা প্রভৃতি। ছোটদের জন্যঃ শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে, ছুটির দিনে মেঘের গল্প, মহাভারত।

গোবিন্দ চক্রবর্তী। জন্ম ১৯২২। জন্মস্থান রাণাঘাট। ছদ্মনামঃ নক্ষত্র রায়। সুকবি। দীর্ঘদিন বড় ও ছোট সবার জন্যে কবিতা ও ছড়া লিখছেন। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বেশী নয়। উল্লেখযোগ্যঃ উত্তরণ, অরণ্য মরাল।

গৌরকিশোর ঘোষ। জন্মঃ ১৯২৩, হাট গোপালপুর, ঝিনাইদহ। ১৯৪৮ থেকে ৫০ পর্যন্ত সত্যযুগ পত্রিকার ছোটদের মজলিশের পরিচালনা বেতালভট্ট ছদ্মনামে। ছোটদের জন্যে প্রকাশিত বইঃ মেঘনামতী, দুষ্টুর দুপুর। পুরস্কারঃ ম্যাগসেসাই ও বঙ্কিম পুরস্কার।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। জন্ম ১৯২৪। জন্মস্থান কলকাতা। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক। সমকালীন বাংলা কবিতার জগতে তিনি নেতৃস্থানীয়, তাঁর কবিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সবশ্রেণীর সব মানুষের কাছে তার আবেদন অনস্বীকার্য। বিখ্যাত কিশোর পত্রিকা 'আনন্দমেলা'র প্রাক্তন সম্পাদক। ১৯৭৪ সালে 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ নীল নির্জন, উলঙ্গ

রাজা, কলকাতার যীশু, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কবিতা সমগ্র প্রভৃতি। ছোটদের জন্য কবিতা সংকলন 'শাদা বাঘ' বাংলা শিশু সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। ছড়ার বই ঃ বিবির ছড়া।

জগন্নাথ চক্রবর্তী। জন্ম ১৯২৪, নরাইল, যশোর, বাংলাদেশ। পেশা অধ্যাপনা। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ কোলকাতা কোলকাতা কোলকাতা, জলস্রোতে ইত্যাদি।

নরেশ গুহ। জন্ম ১৯২৪। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সমকালীন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ছোটদের জন্য তাঁর কয়েকটি কবিতা অতি উৎকৃষ্ট। কাব্যগ্রন্থ ঃ দুরন্ত দুপুর।

প্রভাকর মাঝি। জন্ম ১৯২৪। জন্মস্থান ভূতসহর, বাঁকুড়া। শিক্ষকতা করেন। প্রধানত ছোটদের কবি। গ্রন্থ ঃ আকাশের নীল চোখ।

রাম বসু। জন্ম ১৯২৫। জন্মস্থান তারাগুনিয়া, ২৪ পরগণা। প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, শক্তিমান কবি। কাব্যগ্রন্থঃ যখন যন্ত্রণা, তোমাকে,দৃশ্যের দর্পণে, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি।

আশা দেবী। জন্ম ১৯২৫, প্রয়াত। শিক্ষাবিদ ও শিশুসাহিত্যিক। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ ঃ শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ। ছোটদের জন্য কবিতা, গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য বইঃ ঘুমতী নদীর ঢেউ, হাসির গল্প, রঙিন বেলুন, কুট্টিপিসি এণ্ড কোং, আসল টেনিদা, লাল তারা নীল তারা প্রভৃতি।

দিলীপ দে চৌধুরী। জন্ম ১৯২৫, মৃত্যু ১৯৮৬। নিষ্ঠাবান শিশুসাহিত্যসেবী। প্রথম যুগে মণিমেলা সংগঠনে 'মৌমাছি'র সহযোগী ছিলেন। পরে শিশু রঙ্গন-এ যুক্ত হন। সম্পাদনা করেছেন—'ঘরোয়া' ও 'জন্মভূমি' পত্রিকা। অধুনালুপ্ত 'রবিবার' শিশু সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন শিশু সাহিত্যিক শৈলেন ঘোষের সঙ্গে। ছড়া রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জীবনের একটি অধ্যায়ে চলচ্চিত্রশিল্পে পরিচালক ও সম্পাদকরূপে কাজ করেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য। জন্ম ১৯২৬, মৃত্যু ১৯৪৭। জন্মস্থান কলকাতা। অন্যতম বিপ্লবী কবি। অল্পবয়সে অসামান্য কবিতা লিখে বাঙালীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। 'কিশোর কবি' বলে খ্যাত। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ছোটদের পাতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কাব্যগ্রন্থ ঃ ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল। ছড়ার বই—মিঠেকড়া।

জ্যোতিভূষণ চাকী। জন্ম ১৯২৬। জন্মস্থান পূর্ব দিনাজপুর। একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। সমকালীন ছড়াসাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ছড়ার বই 'ছড়াপিদ্দিম জ্বলে' বাংলা শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ ছাড়া 'জাতকের শ্রেষ্ঠ গল্প।' সম্প্রতি প্রকাশিত বই।

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৯২৬। কবি, গল্পকার ও সমকালীন শিশুসাহিত্যের অন্যতম ছড়াকার। প্রকাশিত বই ঃ দোলনার গান।

সুশীলকুমার গুপ্ত। জন্ম ১৯২৬। কবি, প্রাবন্ধিক, প্রশাসক। উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য ঃ মণিমাণিক, কলকল্লোল, সোনালী রূপালী, রত্নগিরির রহস্য প্রভৃতি।

রাজলক্ষ্মী দেবী। জন্ম ১৯২৭। জন্মস্থান ময়মনসিংহ।কবি গল্প-উপন্যাস ও লিখেছেন। ছোটদের কবিতা রচনায় পারদর্শী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ হেমন্তের দিন, ভাব ভাব কদমের ফুল। ছোটদের ঃ ঘুম পাড়ানি।

সিদ্ধেশ্বর সেন। জন্ম ১৯২৮। প্রগতিশীল কবি। কাব্যগ্রন্থ ঃ সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা, ঘন ছন্দ মুক্তির নিবিড়।

অরবিন্দ গুহ। জন্ম ১৯২৮। জন্মস্থান বরিশাল। ছদ্মনাম ঃ ইন্দ্রমিত্র। সুকবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা। ছোটদের জন্যে অনেক কবিতা লিখেছেন। কাব্যগ্রন্থ ঃ দক্ষিণ নায়ক, নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, সাজঘর।

অমিতাভ চৌধুরী। জন্ম ১৯২৮। জন্মস্থান শিলচর। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক। বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। ছড়া রচনায় অসামান্য দক্ষতা। উল্লেখযোগ্য বই ঃ তেপান্তরের মাঠে, অচেনা শহর কলকাতা, যবনিকা কম্পমান প্রভৃতি। ছড়া ঃ ছন্নছাড়া, নামের ছড়া ও আমার ভারত।

কৃষ্ণ ধর। জন্ম ১৯২৮। জন্মস্থান কমলপুর, ময়মনসিংহ। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শব্দহীন শোভাযাত্রা, কালের রাখাল, তুমি ভিয়েতনাম, পদধ্বনি, পলাতক প্রভৃতি। ছোটদের জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়া-কবিতা লেখেন।

সুনন্দা দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯২৯। জন্মস্থান রাঁচী। 'শিশুসাথী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন। চিত্রশিল্পী। সঙ্গীতশিল্পী।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক। জন্ম ১৯৩০। জন্মস্থান কলকাতা। কবি ও সাংবাদিক। ছোটদের ছড়া ও কবিতা রচনায় তাঁর সুনাম আছে। কাব্যগ্রন্থ ঃ নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অশুভ সঙ্গীত, অথচ সনাতন, ঘুড়ি ও মেঘের লুকোচুরি।

সুনীল কুমার নন্দী। জন্ম ১৯৩০, যশোহর। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল, প্রকীর্ণ সবুজে নীলে, পিচ্ছিল গুহার জল, অনন্ত উদ্ভিদ রক্তে উল্লেখযোগ্য। 'অনুক্ত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩১। জন্মস্থান পুরী। প্রধানত কবি। গল্প-উপন্যাসও লেখেন। ছোটদের জন্য লিখেছেন গল্প, কবিতা ও ছড়া। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সোনার হরিণ, আহত ভ্রূবিলাস, শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রভৃতি।

গৌরী ধর্মপাল। জন্ম ১৯৩১। জন্মস্থান কলকাতা। অধ্যাপিকা। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। খুব ছোটদের জন্যে ভালো লেখেন। গল্প, ছড়া, রূপকথা—সবরকম। উল্লেখযোগ্য বই ঃ মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র, কাদম্বরী, ঘোড়া যায় ও চোদ্দ পিদিম।

পূর্ণেন্দু পত্রী। জন্ম ১৯৩১। জন্মস্থান বাগনান, হাওড়া। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, কবি ও সুলেখক। এ ছাড়া চিত্র-পরিচালক রূপে খ্যাতিমান। ছোটদের জন্য তাঁর রচনা—কলকাতার রাজকাহিনী, কী করে কলকাতা হলো, ছড়ায় মোড়া কলকাতা, রাম-রাবণের ছড়া ও আমার ছেলেবেলা। কাব্যগ্রন্থ 'আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা' উল্লেখযোগ্য।

কবিতা সিংহ। জন্ম ১৯৩১। সমকালের বিশিষ্ট কবি। আকাশবাণীর উচ্চপদে কর্মরতা। গল্প-উপন্যাস লিখেও সুনাম অর্জন করেছেন। ছোটদের গল্প ও কবিতা রচনায় দক্ষতা আছে। কাব্যগ্রন্থ ঃ সহজ সুন্দরী, কবিতা পরমেশ্বরী, পাপপুণ্য পেরিয়ে ইত্যাদি।

শঙ্খ ঘোষ। জন্ম ১৯৩২। বিশিষ্ট কবি ও নিবন্ধকার। অধ্যাপনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মূর্খ বড়, সামাজিক নয়, প্রহর জোড়া ত্রিতাল, নিহিত পাতালছায়া, শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রভৃতি। ছোটদের সেরা ছড়াকার। ১৯৭৭ সালে 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন। ছড়ার বই ঃ সব কিছুতে খেলনা হয়।

আলোক সরকার। জন্ম ১৯৩২। আধুনিক কবিদের অন্যতম। কাব্যগ্রন্থ ঃ আলোকিত সমুদ্দুর, ভিনদেশী ফুল, নিশীথ বৃক্ষ ইত্যাদি।

সলিল লাহিড়ী। বাংলাদেশের পাবনা জেলায় ১৯৩২ সালের জন্ম। পেশায় বাস্তুকার। সেই বিষয়ে খণ্ডে খণ্ডে বই লিখে [লাহিড়ীজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাণ্ডবুক] প্রখ্যাতও হয়েছেন। পুরস্কার পেয়েছেন শিশুসাহিত্য সম্মেলন থেকে [১৯৮৪]। ছোটদের জন্য প্রকাশিত বই ঃ পরিবেশ ভাবনা, পরিবেশ চেতনা, সমুদ্র অভিযানের সত্যি গল্প, কাশ্মীরের ঝঙ্কার, রোবট ২১০০, ছোটদের মজাদার গল্প ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ দে। জন্মস্থান কলকাতা। প্রয়াত। শিশুসাহিত্যিক। ছোটদের ছড়া ও কবিতা ছাড়া গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন। সম্পাদনা করেছেন একাধিক স্মৃতি কথা-সংকলন। প্রথম বাংলা ছড়া সংকলন 'ছবি ছড়ার দেশে' প্রকাশিত হয় তাঁরই সম্পাদনায় (প্রথম সংস্করণ)। রচিত শিশুসাহিত্য ঃ টাপুর টুপুর, গজমোতীর মালা, অপরূপ রূপকথা, আরব্য উপন্যাসের গল্প ইত্যাদি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯৩৩। জন্মস্থান কলকাতা। বিশিষ্ট কবি। খ্যাতনামা অধ্যাপক। কাব্যগ্রন্থ ঃ যৌবন বাউল, নিষিদ্ধ কোজাগরী, এবার চলো বিপ্রতীপে, জবাবদিহির টিলা ইত্যাদি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩৩। জন্মস্থান বহড়, ২৪ পরগণা। সমকালীন শক্তিশালী কবি।

ভালো ছড়াও লেখেন। কাব্যগ্রন্থ ঃ আমি চলে যাচ্ছি, মন্ত্রের মত আছি। প্রচ্ছন্ন স্বদেশ, এই আমি যে পাথরে ইত্যাদি। ছোটদের জন্য ঃ চলো বেড়িয়ে আসি, রূপকথার কলকাতায়, বিষ্টিতে নয় মিষ্টি কথায়। 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত।

আনন্দ বাগচী। জন্ম ১৯৩৩। জন্মস্থান স্বাগতা গ্রাম। সুকবি। কবিতা ছাড়াও গল্প উপন্যাস রম্যরচনা লিখেও সুনাম অর্জন করেছেন। কিশোর সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য রচনা আছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ সকাল পুরুষ, সগত সন্ধ্যা প্রভৃতি। কিশোর সাহিত্য ঃ কানামাছি, বনের খাঁচায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩৪। জন্মস্থান ফরিদপুর। প্রতিষ্ঠিত কবি, জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ঃ সেই সময়। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কিশোর সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য অবদান আছে, যেমন—সবুজ দ্বীপের রাজা, ভুঙ্গা, জলদস্যু, সত্যি রাজপুত্তুর ইত্যাদি। বঙ্কিম পুরস্কার ও আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত।

রঞ্জন ভাদুড়ী। জন্ম ১৯৩৪। জন্মস্থান ফরিদপুর। কবি ও সাংবাদিক। ছোটদের জন্য ছড়া-কবিতা লিখে সুখ্যাত।

শিবশম্ভু পাল। জন্ম ১৯৩৪। জন্মস্থান কলকাতা। কাব্যগ্রন্থ ঃ ঘরে দূরে দিগন্ত রেখায়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯৩৫। প্রতিষ্ঠিত কবি। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ সমুদ্র থেকে আকাশ, মৃত শিশুদের জন্য টফি, মধ্যরাত ছুঁতে আরো সাত মাইল। কিশোর সাহিত্য ঃ ডালমুট মামা।

প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী। জন্ম ১৯৩৫। জন্মস্থান কলকাতা। প্রকাশিত কিশোর সাহিত্য ঃ গল্প নয় সত্যি, আলো জ্বালল যারা, ঘুম ভাঙার গান।

সাধনা মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩৫। জন্মস্থান এলাহাবাদ। কবি, সাংবাদিক। কিশোরদের উপযোগী ছড়া, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ ইত্যাদি নিয়মিত লিখে থাকেন। কাব্যগ্রন্থ 'ছুঁই মুই লজ্জাবতী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিশোর সাহিত্য ঃ জানা-অজানা, দুঃসাহসিক অভিযান ইত্যাদি।

সরল দে। জন্ম ১৯৩৫। জন্মস্থান সালকিয়া, হাওড়া। শিশুসাহিত্যিক। সুপরিচিত ছড়াকার। সম্পাদনা করেছেন খুব ছোটদের পাক্ষিক 'ঝুমঝুমি' ও সাহিত্যপত্র পর্ণপুট। পুরস্কার ঃ সুনির্মল স্মৃতি পুরস্কার, অমৃত-কমল পদক ও শিশুসাহিত্যিক সংসদের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক পুরস্কার। প্রকাশিত বই ঃ ইস্টিশানের মিষ্টি গান, আঁকন বাঁকন, ভয়তাড়ুয়া, ভোর আকাশের তারা, বনমুলুকের উলুক ঝুলুক, ল্যাজকাহিনী, বাঘুকে নিয়ে গপ্পো, এক জাহাজ গল্প, যন্তর মন্তর ইত্যাদি।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী। জন্ম ১৯৩৫। জন্মস্থান রেঙ্গুন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ অরণ্য দিন বদলাচ্ছে, একলা পুরুষ, ঝাপসা ফুল গাছপালায়।

সামসুল হক। জন্ম ১৯৩৬। জন্মস্থান: কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা। কবি ও ছড়াকার। কাব্যগ্রন্থ ঃ নিজের বিপক্ষে, মোমবাতির তলায় শাদা ঘোড়া ইত্যাদি। ছড়া ঃ ইস্টিকুটুম, ভাতে পড়ল মাছি (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে)।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩৬। জন্মস্থান কলকাতা। কবি, অধ্যাপক। কাব্যগ্রন্থ ঃ নীলাম্বরী, বৃষ্টির শব্দ ও অন্যান্য কবিতা। ছোটদের কবিতার বই ঃ রূপোলি পাহাড়। সম্পাদনা ঃ লিমেরিক সংগ্রহ। এ ছাড়া—সুন্দরবনের আতঙ্ক, বাঘ ও বাঘিনী।

তারাপদ রায়। জন্ম ১৯৩৬। জন্মস্থান টাঙ্গাইল। প্রতিষ্ঠিত কবি। রসরচনা লিখে জনপ্রিয়। প্রকাশিত বই ঃ কাণ্ডজ্ঞান, দারিদ্র্যরেখা, নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক ইত্যাদি। ছোটদের ঃ একটি কুকুরের উপাখ্যান, ডোডো-তাতাই পালা কাহিনী।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩৬ শিশু-কিশোরদের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখে থাকেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ অতলান্ত, বুদ্ধির্যস্য, এসো, হাত ধরো ইত্যাদি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯৩৬। কবি ও শিল্প সমালোচক। ছোটদের জন্য ছড়া-কবিতাও

লেখেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ নিজস্ব ঘুঁড়ির প্রতি। অন্ধপ্রাণ জাগো ইত্যাদি।

রত্নেশ্বর হাজরা। জন্মসাল ১৯৩৭। জন্মস্থান ঃ বরিশাল। কিশোর পাঠকদের জন্য রচিত তাঁর ছড়া ও কবিতা ভিন্ন স্বাদের। কাব্যগ্রন্থ ঃ আমি নির্বাসিত, জলবায়ু, গতকাল আজ এবং আমি।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯৩৭। জন্মস্থান গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর। কবি, শিল্পী ও শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত বইঃ পাখি জানে, নৈঃশব্দের প্রতিধ্বনি (কাব্য)। ছড়া ঃ ফুলঝুরি। ছোটদের গল্প ঃ ভিনদেশী উপকথা, তিনকন্যা।

অশোককুমার মিত্র। জন্ম ১৯৩৭। জন্মস্থান কলকাতা। প্রধানত ছড়াকার। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় গল্পবার্ষিকী 'ঝালাপালা'। দু'টি উল্লেখযোগ্য বইঃ লিয়রের রচনাবলী ও পিনোশিয়োর এ্যাডভেঞ্চার।

নবনীতা দেবসেন। জন্ম ১৯৩৮। জন্মস্থান কলকাতা। গল্প, রম্যরচনা ইত্যাদি লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। রূপকথা রচনায় দক্ষতা অসামান্য। নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর কন্যা। প্রকাশিত বইঃ হে পূর্ণ তব চরণের কাছে, স্বাগত দেবদূত উল্লেখযোগ্য।

আশিস সান্যাল। জন্ম ১৯৩৮। জন্মস্থান মৈমনসিংহ। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ শেষ অন্ধকার, প্রথম আলো, মৃত্যুদিন জন্মদিন, জলপাই অরণ্যে প্রতিদিন ইত্যাদি।

নির্মলেন্দু গৌতম। শিশু সাহিত্যিক। 'তেপান্তর' পত্রিকার সম্পাদক। শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছেন। ছোটদের নাট্যসংস্থা 'তেপান্তর'-এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। একাধিক নাটক রচনা করেছেন। প্রকাশিত বইঃ খেলাঘরের রাজ্যে, রস থেকে রসগোল্লা, দেবেশ্বরের সঙ্গে, ফার্স্ট প্রাইজ, গল্পের মতো ইত্যাদি।

শৈলশেখর মিত্র। জন্ম কলকাতা, ১৯৩৮। বেসরকারী সংস্থায় দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত। ছোটদের জন্যে ছড়া কবিতা গল্প উপন্যাস দীর্ঘদিন ধরে লিখছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ লিয়রের ছড়া (অশোক কুমার মিত্রের সঙ্গে)

অনন্ত দাশ ঃ জন্ম ১৯৩৯, গণ্ডার, মেমারী, বর্ধমান। পেশা ঃ পার্সোন্যাল এ্যাসিসটেন্ট, ফোর্ট উইলিয়াম। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ গতসূর্যের আলো, আমার নিজস্ব কোন দুঃখ নেই, সময় আমার কণ্ঠে, রক্তপায়ে হেঁটে যাই।

পলাশ মিত্র। জন্ম ১৯৩৯। জন্মস্থান ঃ কলকাতা। সুকবি। পেশা ঃ অধ্যাপনা। সম্পাদনা করেছেন—জীবনানন্দ।

দেবী রায়। জন্ম ১৯৪০, হাওড়া। পেশা ঃ সরকারী চাকুরী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ কলকাতা ও আমি, এই সেই তোমার দেশ ইত্যাদি।

শান্তনু দাস। জন্ম ১৯৪২। জন্মস্থান ঃ রসনা, ঢাকা। কবি। 'গঙ্গোত্রী'-র সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময়, বর্ণের আড়ালে একা ইত্যাদি। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কালের কবিতা ও কাফের।

রাখাল বিশ্বাস। জন্ম ১৯৪২। জন্মস্থান যশোহর। কবি। ছোটদের ছড়া-কবিতাও লিখে থাকেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ সেই ভালবাসা, জ্যোৎস্নার ভিতরে এসো।

সুচেতা মিত্র। জন্ম ১৯৪৩। জন্মস্থান কলকাতা। প্রয়াত। অল্প বয়সে কবি খ্যাতি অর্জন করেন। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা। ছোটদের জন্য লিখেছেন ছড়া ও কবিতা। তাঁর অকালমৃত্যুতে বাংলা কবিতা ও শিশু সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

সন্তোষ দত্ত। জন্ম ১৯৪৫। জন্মস্থান কলকাতা। কবি ও সাংবাদিক। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, ছড়া-কবিতা ও কাব্যনাট্য প্রকাশিত হয়েছে।

রূপক চট্টরাজ। জন্ম ১৯৪৯, মলুটী, সাঁওতাল পরগণা। ছোটদের জন্যে গল্প কবিতা ছড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন।

শ্যামলকান্তি দাশ। জন্ম ১৯৫১। জন্মস্থান মেদিনীপুর। প্রতিষ্ঠিত কবি। পেশায় সাংবাদিক। ছোটদের ছড়া ও কবিতা লিখে সুখ্যাত। একাধিক কবিতাপত্র সম্পাদনা করেছেন। বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত। প্রকাশিত বইঃ কাগজ কুচি, প্রেমের কবিতা।

সম্পাদিত ঃ ভূতভূতুড়ে গল্প-ছড়া, খুদের ছবি দুঁদের ছড়া ইত্যাদি।

প্রণব মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৫১। জন্মস্থান শিবপুর, হাওড়া। শিশুসাহিত্যিক। অধ্যাপনা করেন। উল্লেখযোগ্য বই ঃ হাওয়া মাটি হল্লা।

রতনতনু ঘাটী। জন্ম ১৯৫২। জন্মস্থান মেদিনীপুর। পেশায় সাংবাদিক। তরুণ কবি ও ছড়াকার। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছোটদের জন্যে লিখে থাকেন।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। জন্ম ১৯৫৩। জন্মস্থান হাওড়া। শিশুসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রধানত ছড়াকার। উল্লেখযোগ্য ছড়ার বই ঃ মজার ছড়া, নাম তাঁর সুকুমার ইত্যাদি। শিশু সাহিত্য পরিষদের পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন সুকুমার শতবর্ষে সুকুমার পদক।

প্রমোদ বসু। জন্ম ১৯৫৩, কলকাতা। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'শব্দের ভিক্ষুক', 'বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা', 'একটা গাছ', 'আত্ম প্রতিকৃতি'।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন। জন্ম ১৯৫৪। শিশুসাহিত্যিক। ছোটদের পত্রপত্রিকায় নিয়মিত ছড়া ও কবিতা লেখেন। ফ্রী লান্স্ সাংবাদিক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ছন্দা।

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৫৫। ছোটদের ছড়া-কবিতা লেখেন। তাঁর সম্পাদনায় একাধিক ছড়া সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ স্বভাবের পাথর। ছড়া ঃ এলাটিং।

মৃদুল দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯৫৫। জন্মস্থান হুগলি। কবি ও সাংবাদিক। কাব্যগ্রন্থ ঃ জলপাই কাঠের এসরাজ। এ ভাবে কাঁদে না, গোপনে হিংসার কথা বলি।

অভিরূপ সরকার। জন্ম ১৯৫৫। জন্মস্থান কলকাতা। পিতা কবি অরুণকুমার সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্টের রীডার। তরুণ সম্ভাবনাময় কবি। ছোটদের ছড়া ও কবিতা লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রকাশিত কবিতার বই ঃ আমপাতার মুকুট।

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৫৬। জন্মস্থান যশোর। প্রধানত কবি। ছোটদের জন্যে কিছু ভাল কবিতা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

অপূর্বকুমার কুণ্ডু। তরুণ শিশু সাহিত্যিক। বিভিন্ন শিশু ও কিশোর পত্রিকায় নিয়মিত ছড়া, কবিতা ও গল্প লিখে সুনাম অর্জন করেছেন।

সুদেব বকসী। জন্ম ১৯৫৯। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছোটদের ছড়া, কবিতা ও গল্প লিখে অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুসাহিত্যে তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। ছড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবল আগ্রহ। প্রকাশিত দুটি বই ঃ যা ভূত দুয়ো দুয়ো ও রোজনামতা।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী। জন্ম ১৯৬০। নিবাস আগরতলা, ত্রিপুরা। ছোটদের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'ঝিনুক' সম্পাদনা করেন। প্রকাশিত ছোটদের কবিতার বই ঃ কানামাটি, কাকতাড়ুয়া।

মৃণালকান্তি দাশ। জন্ম ১৯৬০। জন্মস্থান মেদিনীপুর। কবি, পেশায় সাংবাদিক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ পাথর পাতা নদী।

শমীন্দ্র ভৌমিক। জন্ম ১৯৬১। শিল্পী কৈশোরেই ছোটদের ছড়া ও কবিতা নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। তাঁর রচনায় বাংলা ছড়ায় পালাবদলের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। প্রকাশিত ছড়ার বই ঃ তোর সঙ্গে আড়ি।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৬৪। জন্মস্থান সালকিয়া, হাওড়া। কৈশোরে পা রেখেই সাহিত্যচর্চার শুরু। সেই সময়েই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আনন্দহাট'। বর্তমানে একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'ইতিবাচক'-এর সম্পাদক। ছড়া, কবিতা ও নিবন্ধ লিখে থাকেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ফ্রী লান্‌স সাংবাদিকতাও করেন। সুকুমার শতবর্ষে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একশ পিদিম জ্বলে' নামে ছড়া সংকলন উচ্চ প্রশংসিত। প্রকাশিত বই ঃ রোজনামতা, গল্প যখন ভাবায়।

বাংলাদেশ

কবি-পরিচিতি

ফজলুল করিম। জন্ম ১৮৮২। জন্মস্থান কাকিনা, রংপুর। সাহিত্য বিশারদে ভূষিত। রচিত গ্রন্থঃ লায়লা মজনু, পথ ও পাথেয়, চিন্তার চাষ প্রভৃতি।

গোলাম মোস্তাফা। জন্ম ১৮৯৭, মৃত্যু ১৯৬৪। জন্মস্থান মনোহরপুর, যশোহর। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—খোশরোজ, রক্তরাগ, হাস্‌নাহেনা, সাহারা, কাব্যকাহিনী, বনি আদম, বুলবুলিস্তান প্রভৃতি। এ ছাড়া হজরত মহম্মদের জীবনী অবলম্বনে রচিত বিশ্বনবী।

জসীমউদ্দীন। জন্ম ১৯০৩, তাম্বুলখানা, ফরিদপুর। মৃত্যু ১৯৭৬। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ রাখালী, বালুচর, নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট প্রভৃতি। শিশুসাহিত্য—কবিতাঃ হাসু, এক পয়সার বাঁশী।

বন্দে আলী মিঞা। জন্ম ১৯০৮, রাধানগর, পাবনা। মৃত্যু ১৯৭৯। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ ময়নামতীর চর, পদ্মানদীর চর, মধুমতীর চর। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত, ১৯৬২।

প্রজেশকুমার রায়। জন্ম ১৯০৯, সিলেট। মৃত্যু ১৯৬২। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ দীপান্বিতা, এক যে ছিল, একটি ফুলের গুচ্ছ প্রভৃতি।

সুফিয়া কামাল। জন্ম ১৯১১, শায়েস্তাবাগ, বরিশাল। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ কেয়ার কাঁটা, সাঁঝের মায়া, মায়াকাজল, উদাত্ত পৃথিবী, অভিযাত্রিক। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা আকাদেমী ১৯৬২।

হোসনে আরা। জন্ম ১৯১৬, পিয়ারা, হাড়োয়া, চব্বিশ পরগণা। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ মিছিল। ছড়াঃ ফুলঝুরি, খেয়াল খুশি, হল্লা, টুংটাং রং। পুরস্কারঃ শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী, ১৯৬১।

আহসান হাবীব। জন্ম ১৯১৭, শঙ্করপাশা, বরিশাল। মৃত্যু ১৯৮৬। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ছুটির দিন দুপুরে, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

ফাররুখ আহমদ। জন্ম ১৯১৮, যশোর। মৃত্যু ১৯৭৪। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ সাত সাগরের মাঝি, মুহূর্তের কবিতা। শিশুসাহিত্যঃ পাখির বাসা, হরফের ছড়া, ছড়ার আসর। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী, ১৯৬০।

সৈয়দ আলী আহসান। জন্ম ১৯২২, আলোকদিয়া, যশোর। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ অনেক আকাশ, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, উচ্চারণ। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী।

সানাউল হক। জন্ম ১৯২৪, চাউরা, কুমিল্লা। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ নদী ও মানুষের কবিতা, সূর্য অন্যতর, শ্রেষ্ঠ কবিতা। ছড়াঃ ছেলেবুড়োর ছড়া, ছড়া ঘরে ঘরে। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪ ও ইউনেস্কো, ১৯৬৯।

রোকনুজ্জামান খান। জন্ম ১৯২৫, পাংশা, ফরিদপুর। উল্লেখযোগ্য ছড়ার বইঃ হাট্টিমা-টিম। পুরস্কারঃ শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

হাবীবুর রহমান। জন্ম ১৯২৬, বর্ধমান। মৃত্যু ১৯৭৬। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ উপান্ত। শিশুসাহিত্যঃ আগডুম বাগডুম, হীরা মতি পান্না প্রভৃতি। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪।

আশরাফ সিদ্দিকী। জন্ম ১৯২৭, নাগবাড়ি, টাঙ্গাইল। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, সাত ভাই চম্পা, বিষকন্যা, উত্তর আকাশের তারা প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্যঃ কাগজের নৌকো, সিংহের মামা ভোম্বলদাস, বাণিজ্যেতে যাবো আমি, রূপকাহিনী। পুরস্কারঃ শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী (১৯৬৪), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫) ও ইউনেস্কো পুরস্কার।

মনোমোহন বর্মণ। জন্ম ১৯২৭, ঢাকা। প্রকাশিত ছড়ার বইঃ সোনালী ভোরের রোদ।

ফয়েজ আহমদ। জন্ম ১৯২৯, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা। প্রকাশিত শিশুসাহিত্যঃ জোনাকি, পুতলী, রিমঝিম। পুরস্কারঃ শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

শামসুর রাহমান। জন্ম ১৯২৯, মাহুতটুলি, ঢাকা। কাব্যগ্রন্থঃ প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির থেকে প্রভৃতি। শিশুসাহিত্যঃ এলাটিং বেলাটিং, ধান ভান্‌লে কুড়ো দেবো, খুকির হাতে উল্লেখযোগ্য।

আবদার রশীদ। জন্ম ১৯৩০, জলপাইগুড়ি, ভারত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ হাসতে মানা, ঝরণা ধারা, টইটম্বুর।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। জন্ম ১৯৩৪, বরিশাল। কাব্যগ্রন্থঃ সাতনরীর হার, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা প্রভৃতি। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯।

আল মাহমুদ। জন্ম ১৯৩৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। কাব্যগ্রন্থঃ লোকলোকান্তর, কালের কলস, বখতিয়ারের ঘোড়া প্রভৃতি। শিশুসাহিত্যঃ পাখির কাছে ফুলের কাছে। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী (১৯৬৮), জয়বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৪), জীবনানন্দ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৪)।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। জন্ম ১৯৩৬, খড়কি, যশোর। কিশোর সাহিত্যঃ ইচ্ছেমতী, কবি আলাওল। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী, ১৯৭২।

দিলওয়ার। জন্ম ১৯৩৭, ভার্থখোলা, সিলেট। কাব্যগ্রন্থঃ জিজ্ঞাসা, উদ্ভিন্ন উল্লাস, বাংলা তোমার আমার প্রভৃতি।

মোহাম্মদ মোস্তফা। জন্ম ১৯৩৮, ফেণী। প্রকাশিত শিশুসাহিত্যঃ ছোট্ট পাখি চন্দনা, পদ্মদীঘি জল টলমল।

সুকুমার বড়ুয়া। জন্ম ১৯৩৮, বিনাজুরি, রাউজান, চট্টগ্রাম। প্রকাশিত ছড়ার বইঃ পাগলা ঘোড়া, ভিজে বিড়াল, এলোপাতাড়ি, নানারঙের দিন প্রভৃতি। পুরস্কারঃ শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

রফিকুল হক। জন্ম ১৯৩৯, কামাল কাচনা, রংপুর। প্রকাশিত ছড়ার বইঃ বর্গী এল দেশে, পান্তা ভাতে ঘি।

এখলাসউদ্দিন আহ্‌মদ। জন্ম ১৯৪০, চব্বিশ পরগণা, ভারত। উল্লেখযোগ্য ছড়ার বইঃ ইকড়ি মিকড়ি, হাসির ছড়া মজার পড়া, কাটুম কুটুম, ছোট্ট রঙিন পাখি। বাজাও ঝাঁঝর বাদ্যি।

নিয়ামত হোসেন। জন্ম ১৯৪১, হুগলী, ভারত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ জলছবি।

মাহবুব তালুকদার। জন্মঃ ১৯৪১, ময়মনসিংহ। কাব্যগ্রন্থঃ জন্মের দক্ষিণা, আত্মসমর্পণ। শিশুসাহিত্যঃ অন্তর মন্তর, সে এক সোনার ছেলে।

নাসিম লীনা। জন্ম ১৯৪২, যশোর। প্রকাশিত ছড়ার বইঃ ঝিঙে তলায় ফিঙে নাচে।

শামসুল ইসলাম। জন্ম ১৯৪২, ফেণী, নোয়াখালি। উল্লেখযোগ্য ছড়ার বইঃ বাকবাকম, ইষ্টিশিষ্টি।

আসাদ চৌধুরী। জন্ম ১৯৪৩, উলানিয়া, বরিশাল। কাব্যগ্রন্থঃ তবক দেওয়া পান, বিত্ত নাই বেসাত নাই, মধ্য মাঠ থেকে প্রভৃতি।

আবু কায়সার। জন্ম ১৯৪৩, টাঙ্গাইল। প্রকাশিত শিশুসাহিত্যঃ কাকতাড়ুয়া, দোয়েলের দেশ।

মহাদেব সাহা। জন্ম ১৯৪৪, ধানঘড়া, পাবনা। কাব্যগ্রন্থঃ এই গৃহ এই সন্ন্যাস, চাই বিষ অমরতা, লাজুক লিরিক উল্লেখযোগ্য। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

নির্মলেন্দু গুণ। জন্ম ১৯৪৫, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ। প্রকাশিত শিশুসাহিত্যঃ কালো মেঘের ভেলা। পুরস্কারঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

আখতার হুসেন। জন্মঃ ১৯৪৫, আমনুরা, রাজসাহী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ হালচাল, উল্টোপাল্টা, হৈ হৈ রৈ রৈ।

সাজ্জাদ হোসাইন খান। জন্ম ১৯৪৮, ভৈরব। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাজার কথা প্রজার কথা।

হাবিবুল্লাহ সিরাজী। জন্ম ১৯৪৮, ফরিদপুর। কাব্যগ্রন্থ ঃ দাও বৃক্ষ দাও দিন, নোনাজলে বুনো সংসার প্রভৃতি। ছড়ার বই ঃ ইল্লিবিল্লি।

আবু সালেহ। জন্ম ১৯৫০, ফরিদপুর। প্রকাশিত ছড়ার বইঃ গ্রামের নাম চৌগাছি। তাড়িং মাড়িং। আলতাফ

আলতাফ আলী হাঁসু। জন্ম ১৯৫০, পটিতাপাড়া, বগুড়া। কবি।

খালেক বিন জয়েনউদ্দিন। জন্ম ১৯৫৪, চিত্রাপাড়া, গোপালগঞ্জ। প্রকাশিত ছড়ার বই ঃ ধান সুপারি পান সুপারি, আতা গাছে তোতা পাখি, আপিল চাপিল, ঘন্টিনালা।

শাহাবুদ্দীন নাগরী। জন্ম ১৯৫৫, শিবনগর, কানসাট, চাঁপাইন বারগঞ্জ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নীল পাহাড়ের ছড়া, মৌলি তোমার ছড়া। রকম রকম ছড়া।

লুৎফর রহমান রিটন। জন্ম ১৯৬২, গোপীবাগ, ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ধুত্তুরি, ঢাকা আমার ঢাকা, হিজিবিজি।

আমীরুল ইসলাম। জন্ম ১৯৬৪, ঢাকা। ছড়ার বই ঃ খামখেয়ালি।

ইফাতকার হোসেন। বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে এক পরিচিত নাম। নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন।

